# বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস

যুধিষ্ঠির জানা ( মালীবুড়ো )

বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী, মেদিনীপুরে বৌদ্ধধর্ম,
বাংলা সাহিত্যের পরিচয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্‌ কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন ॥
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ॥
বিন্দু পাল

ফটো তুলেছেন ॥
সুনীল জানা, ১০, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা
ট্রেড কর্নার স্টুডিও, কলিকাতা
রবি প্রামাণিক, তমলুক ও
গ্রন্থকার স্বয়ং

ছেপেছেন ॥
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই করেছেন ॥
নিউ ইণ্ডিয়া বুক বাইণ্ডিং হাউস
৬০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ॥
১৩৪৭ বৈশাখ

**দাম ঃ দশ টাকা মাত্র**

## ॥ নিবেদন ॥

তমলুক তথা তাম্রলিপ্তের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য জীবনের পুরো দশটি বছর কাটিয়েছি। দশবছর পরে আজ এই ইতিহাস লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে, কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। যেটুকু সংগ্রহ করেছি তা' বিরাট গৌরবদীপ্ত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের পক্ষে নগণ্য। তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথি-পত্রে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ বর্ণনা পাই, সে তুলনায় তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হয়েছে। তমলুকই সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর এ সত্য সর্ববাদিসম্মত হলেও তবু মনে প্রশ্ন জাগে আজকের ছোট তমলুক সহরটুকুই কি সেই প্রাচীন বিরাট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত ?

এই পুস্তকে যে সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাচাই করে তবেই স্থান দেওয়া হয়েছে, তাই বলে কোন লোককথা, প্রবাদ বা কিংবদন্তীকে অবহেলা করা হয়নি। ভাবাবেশ বা উচ্ছ্বাস যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছি। তমলুকের রাজবংশ সম্পর্কে নতুনভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিভিন্ন রূপে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে তবেই লিখেছি। জিষ্ণুহরির মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, আই-সিং, দাতন প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে বহুদিন ধরে অনুসন্ধান করে তবেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে সাহসী হয়েছি। বিরুলিয়ার জানা বংশের কোষ্ঠিনামায় অনেক নতুন তথ্যের ইঙ্গিত আছে, সেইসব তথ্য যাচাই করে দেখা ও বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আবিষ্কার অমূল্য সন্দেহ নাই, তবে এ সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলী আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে ভাল হয়। দাশগুপ্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র ও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত বস্তুর ক্রমিক সংখ্যা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, বিভিন্ন কারণে তা দেওয়া সম্ভব হলো না।

তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক মাননীয় রামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য করেছেন। বস্তুত এঁর উৎসাহ না পেলে এবং কলিকাতা পুস্তকালয়ের কর্ণধার মাননীয় শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অকাতরে অর্থব্যয় না করলে এত শীঘ্র এরূপ একটি ব্যয়বহুল পুস্তক প্রকাশ কোন মতেই সম্ভব হোত না। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহ আমায় অনেক প্রেরণা যোগিয়েছে। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানা পুঁথির আলোকচিত্রগুলি বিনামূল্যে তুলে দিয়েছেন। তাঁকে আমার অন্তরের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি। উড়িষ্যাযাত্রী অজিত ও চিত্ত ভাই-এর নাম বহুদিন মনে থাকবে।

আমার নিজের সংগ্রহ থেকেই অধিকাংশ পুরাবস্তুর আলোকচিত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হোল। অন্য দু'একজনের সংগৃহীত যে দু'একটি আলোকচিত্র এতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা সংগ্রাহকদের অনুমতি নিয়ে তবেই প্রকাশ করা হোল।

চেষ্টা করেছিলাম অনেক কিন্তু তবুও এই পুস্তককে নির্ভুলভাবে ছাপা গেল না। মারাত্মক ভুল না হলেও কতকগুলি বানান ভুল থেকে গেল। এজন্য আমরা সত্যি দুঃখিত ও লজ্জিত। সহৃদয় সুধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক সম্পর্কে যদি কিছু উপদেশ, মতামত, তথ্য আমায় জানান এবং যে সব ভুল তাঁদের চোখে পড়বে তা জ্ঞাত করান, তা'হলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁদের সে ঋণের কথা স্বীকার করব।

দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক কথাপ্রসংগে বলেছিলেন—"তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনি কিন্তু এ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য পুস্তক নাই, যদি আপনি লিখেন, তা'হলে দেশ অনেক উপকৃত হবে।" মাননীয় বিবেকানন্দ বাবুর একথা সত্য হলেও আমি যে দেশবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছি একথা মনে হয় না, তবে পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক যদি এইসব মাল-মসলা নিয়ে ও আরো অনুসন্ধান করে বই লিখেন, তা'হলে একদিন তাম্রলিপ্তের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়ত সম্ভব হতে পারে।

বরগোদা পোঃ—শ্রীরামপুর
ভায়া—ময়না, মেদিনীপুর

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)

# বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস প্রণয়ণে যে সব পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি

১। মহাভারতম্ ( মূল ও অনুবাদ ) ২। ভারতকোষ ৩। ত্রিকাণ্ড-শেষঃ ৪। অভিধান চিন্তামণি ৫। শব্দরত্নাবলী ৬। শব্দকল্পদ্রুমঃ ৭। ভবিষ্যপুরাণ ৮। বাচস্পত্য ৯। প্রকৃতিবাদ অভিধান ১০। শব্দার্থ প্রকাশিকা ১১। বিষ্ণুপুরাণ ১২। পাণ্ডববিজয় ১৩। বায়ুপুরাণ ১৪। জন্মভূমি ১৫। বিশ্বকোষ ১৭। দ্বিগ্বিজয় প্রকাশঃ ১৮। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১৯। জৈমিনি ভারত ২০। তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ ২২। আর্যদর্শন ২৩। বৃহৎ সংহিতা ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত ২৫। গিল হরিবংশ ২৬। পদ্মপুরাণ ২৭। ব্রহ্মপুরাণ ২৮। রহস্য-সন্দর্ভ ২৯। মৎস্য পুরাণ ৩০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩১। সিদ্ধজামল তন্ত্র ৩২। প্রাণতোষিণী তন্ত্র ৩৩। রঘুবংশ ৩৪। বঙ্গদর্শন ৩৫। ভারতী ৩৬। মহাবংশ ৩৭। দাতবংশ ৩৮। জ্ঞানাঙ্কুর ৩৯। শ্রীদারুব্রহ্ম ৪০। দশকুমারচরিত ৪১। কথা-সরিৎ-সাগর ৪২। মনুসংহিতা ৭৩। পরশুরাম সংহিতা ৪৪। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪৫। এডুকেশন গেজেট ৪৬। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৪৭। সময় ৪৮। রামায়ণ ৪৯। তমোলুক পত্রিকা ৫০। নব্য ভারত ৫১। চৈতন্যমঙ্গল ৫২। সম্বন্ধনির্ণয় ৫৩। বান্ধব ৫৪। মেদিনীপুর ইতিহাস ৫৫। তমোলুক ইতিহাস —ত্রৈলক্য রক্ষিত ৫৬। তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী ৫৭। মাতঙ্গিনী হাজরা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ ৫৮। শহীদ যুগল—নগেন গুহরায় ৫৯। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ৬০। বঙ্গীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ-পরিচয়—সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী ৬১। ভ্রান্তিবিজয়—হরীশ চক্রবর্তী ৬২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন ৬৩। ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৬৬। বাংলার ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৬৫। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ৬৬। বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী—'মালীবুড়ো' ৬৭। বঙ্গ-প্রসংগ—সুশীল রায় সম্পাদিত ৬৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ বসু ৬৯। শ্রীকৃষ্ণচরিত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭০। রায়-বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ৭১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিল রায় ৭২। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র ৭৩। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য—পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৭৪। বাংলা বাঙ্গালীর ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার ৭৫। বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ৭৬। মেদিনীপুর কাহিনী —প্রবোধ ভৌমিক ৭৭। বিপ্লবী মেদিনীপুর—সু-মো-দে ৭৮। হিজলীর

মসনদী-ই-আলা—মহেন্দ্র করণ ৭৯। সত্যার্থ প্রকাশ—দয়ানন্দ সরস্বতী ৮০। আই-সিং—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৮১। বঙ্গ-সাহিত্যে মেদিনীপুর —যোগেশচন্দ্র বসু ৮২। বৃহৎ বঙ্গ—ডাঃ দীনেশ সেন ৮৩। জ্ঞান ভারতী—প্রভাত মুখোঃ ৮৪। প্রবাসী, ১৩৩৮ ৮৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৩৮ ৮৬। সাহিত্য সমাজ পত্রিকা, ১৩৬৩ ৮৭। বাংলা সাহিত্যের কথা—সুকুমার সেন ৮৮। সাহিত্য, ১৩০৪ ৮৯। প্রলাপ, ১৯৬০, ৯০। মেদিনীপুর পত্রিকা, ১৩৬২, ৯১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭০, ৯২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—যোগেন্দ্রনাথ বসু ৯৩। তমলুক মঙ্গল—গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ৯৪। কালিদাস গ্রন্থাবলী —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৯৫। যুগান্তর, ১৩৬০, ৯৬। ভারতবর্ষ, ১৩৬৩, ৯৭। হিমাদ্রী ও নীহার, ১৩৬২, ৯৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২, ৯৯। বিক্ষনী ১০০। দেশ, ১৩৬১, ১০১। কবি-দীপিকা—সত্যেন জানা ১০২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

ইংরেজী পুস্তক সমূহ :—103. Ancient India as described, by Megasthenes and Arrin, J. W. Mc. crindle. 104. Si-yu-ki. by Samuel Beal. 105. Hunter's Orissa 106 H. H. Wilson's Sanskrit and English Dietionary 107, Indian Antiquities 108. Ancient India as desbribed by Ptolemy by J. W. Mc crindle 109. Asiatic Researches 110. R. C, Dutt's History of civilization in Ancient India 111. Imperial Gazetteer of India. 112. Journal of the Royal Asiatic Society 113. Cuuningham's Ancient Geography of India 114. Documents Geographiques 115. Julien's Hiouen Thsang 116. East India Gazetteer 117. A Statistical Account of Bengal 118. A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal 119. Muir's Sanskrit texts 120. Elphinstone's History of India 121. Hunter's Brief History of the Indian People 122. Geographical Dictionary of ancient and Meidiaeval India by Nanda Lal Dey 123. Proceedings of Asiatic Society of Bengal 124. Moakerjee's Magazine 125. Pilgrimage of Fa-Hian 126. Marshman's History of Bengal 127. R C. Dutt's Rambles in India 128. Report on the census of the District of Midnapur. 129. A Short Geography of Bengal by W. H. Arden Wood 130. Cunningham's Archædogical Survey of India 131. Ain-i-Akbari 132. J. C. Price's History of Midnapore 133. Sratesman. ১৩৪। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রায় ১৩৫। বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম —ডাঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ১৩৬। নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত—অধর ঘটক।

## এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহের জন্য যে সব জায়গায় গিয়েছি

১। বালেশ্বর (উড়িষ্যা) ২। দাঁতন ৩। মেদিনীপুর ৪। ঘাটাল ৫। শান্তিপুর বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ (নদীয়া) ৬। গড়বেতা ৭। বিষ্ণুপুর ৮। ঝাড়গ্রাম ৯। বহিচাড ১০। বিরুলিয়া ১১। মহিষাদল ১২। রঘুনাথ বাড়ী ১৩। সুন্দরনগর ১৪। চাঁচিয়াড়া ১৫। ডিমারীহাট ১৬। নন্দকুমার ১৭। খঞ্চি ১৮। কল্যাণচক ১৯। গুমাই ২০। ময়নাগড় ২১। তিলদা ২২। হাওড়া ২৫। ক্ষেপুত ২৪। মামুদপুর ২৫। পাঁশকুড়া ২৬। নন্দপুর ২৭। কাঁথি ২৮। কলিকাতা ২৯। সুতাহাটা ৩০। খয়রা-কানাইচক ৩১। বৈষ্ণবচক ৩২। দেউলিয়া ৩৩। নারান্দা (পট্টগ্রাম) ৩৪। কেলোমাল ৩৫। শালিকা ৩৬। সিঙ্গি (বর্ধমান) ৩৭। মোহনপুর দাঁতুনিয়া ৩৮। বাঁকাকুল ৩৯। অষ্টবাটিকা ৪০। পাকুড়িয়া ৪১। তমলুক অঞ্চল।

## ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা বই, তথ্য ও উৎসাহাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

১। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগারিক, তমলুক ২। কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানা, তমলুক ৩। সিধুভূষণ জানা, বিরুলিয়া ৪। সুব্রতকুমার রায়, তমলুক ৫। হরেকৃষ্ণ পট্টনায়ক, পাঁশকুড়া ৬। পণ্ডিত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য, মহিষাদল ৭। অধ্যাপক নিরঞ্জনকুমার মিশ্র, মহিষাদল ৮। চন্দ্রমোহন রাজ, পিঁয়াজপেড়্যা ৯। চণ্ডীচরণ সামন্ত, ডিমারীহাট ১০। বিল্বপদ জানা, সম্পাদক শহীদ পাঠাগার, সুতাহাটা ১১। দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, আটবেড়িয়া ১২। মদনমোহন অধিকারী, পাকুড়িয়া ১৩। প্রবোধকুমার নায়ক, উকিল, তমলুক ১৪। পণ্ডিত অক্ষয়কুমার কয়াল, বড়ুল, ২৪ পরগণা ১৫। মণীন্দ্রনাথ মাইতি. বি-এ, ওসমানপুর ১৬। অজিতকুমার ব্যানার্জী ও চিত্তরঞ্জন রায় (রাইমণি কেল্লার সহযাত্রী), দাঁতন ১৭। রামেন্দুশেখর দাস, আসনান ১৮। অধ্যাপক নিশিকান্ত ভৌমিক, তমলুক ১৯। গণেশ দাস, বি-কম, কাঁথি ২০। বিভূতিভূষণ জানা, তমলুক ২১। দাঁতন পাবলিক লাইব্রেরী ২২। বিভূতিভূষণ সী, বি-এস-সি ২৩। সুধীরকুমার মল্লিক, এম-এ, বি-টি ২৪। রাধিকারঞ্জন দাস মহাপাত্র, বালেশ্বর ২৫। তৃপ্তিরাণী মাইতি, ওসমানপুর ২৬। নিরদবরণ পাণিগ্রাহী ও চণ্ডীচরণ পাণিগ্রাহী, দাঁতন ২৭। পণ্ডিত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, সম্পাদক, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর।

## ॥ সূচীপত্র ॥

পদ্মমূর্তি ও বিষ্ণুপদ

ব্যাখ্যান বুদ্ধ

একটি মূর্তি ( ময়না )

বিদ্যাসাগরের উড়ানি ও লাঠি

জিষ্ণুহরির মন্দির

জৈনমূর্তি ( দাতন )

# বৃহত্তর
# তাম্রলিপ্তের ইতিহাস

## প্রথম অধ্যায়

### অবস্থান ও সীমা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সদর সহর তমলুক। এই তমলুকই প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত। বর্তমান তমলুক মেদিনীপুর জেলার পূর্ব রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে চেপে তমলুকে আসতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। মেচেদা স্টেশনে নেমে তমলুক সোজা বাসে বা ট্যাক্সিতে চড়ে আসা যায়। ভাড়া লাগে মাত্র ১'৭৮ ন.প.। এর অক্ষাংশ ২২°১৭'৫০" উত্তর, এর দ্রাঘিমাংশ ৭৮°৫৭'৩০" পূর্ব।[১]

বর্তমান কালের তমলুকই যে প্রাচীন কালের বিশ্ববিশ্রুত তাম্রলিপ্ত এবার আমরা সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হবো।। মোগল শাসনের পূর্বে বাংলা বলে কোন রাজ্য ছিল না। অখণ্ড বাংলা ছিল তখন কয়েকটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য। এই সকল স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে তাম্রলিপ্তও একটি।

'মহাভারতে মগধ, মেদোগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ ও ওড্র প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়, এখনকার বাংলা দেশ তৎসমুদয় রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্রাটগণের

---

১ Vide Statistical Account of Bengal, Vol. II, P. 29.

শাসনকালেও বাংলা দেশের পাঁচটি প্রধান হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—তাম্রলিপ্ত রাজ্য তাহার অন্যতম’।[১]

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে তাম্রলিপ্ত[২], তাম্রলিপ্তী[৩], বেলাকূলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তা, তমালিকা[৪], দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং[৫], তমোলিপ্ত[৬] ও তমোলিপ্তী[৭] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাম্রলিপ্তের আরো কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই বন্দরের নাম তমোলিতি[৮] ও তম্মোলিতি[৯] বলেও উল্লেখ আছে। তবে তম্মোলিতি শব্দটি পালি সংস্কৃতের তাম্রলিপ্ত কথার চীনপরিণতি বলে মনে হয়। মুসোঁ জুলিয়েন সাহেব ও জেনারেল কানিংহাম এই যুক্তির পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন।[১০]

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত ছিল কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত। রামায়ণের যুগে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।[১১] সুদূর অতীত কালে অঙ্গদেশ থেকে চারজন ঔপনিবেশিক যথাক্রমে পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ) সুহ্ম[১২] (তাম্রলিপ্ত ও রাঢ়) বঙ্গ (পূর্ব বাংলা) এবং কলিঙ্গ

---

১ তমলুকের ইতিহাস —সেবানন্দ ভারতী। পৃঃ ২।

২ মহাভারতম ৩ ভাবকোষ ৪ ত্রিকাণ্ডশেষঃ ৫ হেমচন্দ্রঃ ৬ শব্দরত্নাবলী ৭ শব্দকল্পদ্রুমঃ।

৮ "In the writings of the Puddhists of Ceylon the name appears as 'Tamolitti,' corresponding to the Tamluk of the present day."

See—"Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" by J. W. Mc. Crindle, M. A , P. 138.

৯ Vide Si-Yu-Ki, by Samuel Beal, Vol. II, P, 200.

১০ Vide Hunter's Orissa, Vol. I P. 311.

১১ Indian Antiquary Vol. XIII. P. 363.

১২ "অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী"—দশকুমারচরিত। এখানে তাম্রলিপ্তের অন্য নাম দামলিপ্তী বলে অভিহিত হয়েছে।

( উড়িষ্যা ) দেশে যেয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই অতীত যুগে বঙ্গদেশবাসিগণ তা'হলে "কলিঙ্গ" নামে অভিহিত ছিলেন। বর্তমান কালের মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম তখন ছিল কলিঙ্গের অন্তর্গত।

এখন বিচার্য হচ্ছে এই তাম্রলিপ্ত পুরাকালে কোথায় অবস্থিত ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের ৬৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

**অর্থ**ঃ—"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।"

এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্ত ছিল রূপনারায়ণ নদের তীরে। কিন্তু এই বিশাল নদের তীরে বললেই ত আর আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানতে হবে বর্তমান তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত কিনা। ভবিষ্য-পুরাণ—ব্রাহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্ত-প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে॥ ৯॥"

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বর্গভীমা দেবী তাম্রলিপ্তে বিরাজ করেন। সে তাম্রলিপ্ত গোবিন্দপুরের শেষ সীমায় সুরধনীর তীরে। বর্গভীমা দেবী রূপ-নারায়ণ নদীর ধারে তমলুক ছাড়া আর অন্য কোথাও আছে বলে আজো জানা যায়নি। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বর্তমানের তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাটনা কলেজের তৎকালিন অধ্যক্ষ জে. ডব্‌লিউ. মাক্রিণ্ডেল সাহেবের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে "তাম্রলিপ্ত" বা তমোলুক বলে লেখা আছে। এ ছাড়া এচ্. এচ্. উইলসন সাহেব, জেনারেল কানিংহাম

সাহেব, মাননীয় এম. এলফিনষ্টোন সাহেব, ডাক্তার ডব্লিউ. ডবলিউ. হণ্টার সাহেব, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই বলেছেন বর্তমানের তমলুকই প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত।

"Tamalities, moreover, which has been satisfactorily identified with Tamluk."[১] এবং "Tamalities represents the Sanskrit Tamralipti, the modern Tamluk."[২]

## ॥ সীমা ॥

তাম্রলিপ্ত বন্দর যে পুরাকালে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ভৌগোলিক বিবরণ বলতে যা বুঝায় তখন সেরকম কোন গ্রন্থ লিখিত হয়নি। তবে বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে যতদূর জানা যায় তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

"মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও খুলনার দক্ষিণাংশ সুন্দরবন —অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রায় পশ্চিম সীমাস্থিত সুবর্ণরেখার মুখ হইতে সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সমগ্র দেশ এবং সমগ্র বঙ্গোপসাগর তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।"[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের[৪] রাজার প্রিয় কবি রামচন্দ্র 'পাণ্ডব দিগ্বিজয়' নামে একটি সংস্কৃত ভৌগোলিক

---

১ Vide Indian Antiquities, Vol. XIII, P. 364.

২ Vide, Ancient India as described by P'tolemy' by J. W. Mc. Crindle, P. 169.

৩ তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী পৃঃ ৮।

৪ ব্লকম্যান সাহেবের মতে শেখরভূমির বর্তমান নাম শেরগড— "Sikharbhum or Sergarh, the mahall to which Raniganj belongs" Blochmann's contributions to the Geography and History of Bengal, P. 16.

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পচেট্ রাজ্য পঞ্চকোটের অপভ্রংশ।

গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং বিক্রমবিজ্জলের "বিক্রমসাগর" নামক দেশ-বিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রবর্ধিত সংস্করণ।[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই "দেশাবলী বিবৃতি" উদ্ধার করেন। এই পুস্তকে লিখিত আছে—"তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে 'তমলুক' বলিত। তদনুসারে বেহালা, বঁড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত ছিল।"[২]

এ ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থ অংশে লিখিত আছে—

—তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি ॥ ১৮

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।[৩]

বায়ু পুরাণেও লিখিত আছে—

"ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ।

এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্ ॥ ৪৯

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।[৪]

পূর্বে গঙ্গা নদী তমলুকের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হোত। 'জন্মভূমি' প্রথম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভাগীরথী-স্রোতঃ হুগলী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত, পূর্ব্বে কিন্তু এই মহাকায় স্রোতস্বতী সপ্তগ্রামপদ বিধৌত করিয়া আদমপুর, আমতা, আন্দুল এবং তমোলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ কল্লোলে বহমানা ছিল।"

---

১ বিদ্যাপতি ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক, তৎপরে বিক্রমবিজ্জল, জগমোহন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, ৫৩৯ পৃঃ।

২ বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশ সেন, পৃঃ ১০৯৯।

৩ বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৪ বায়ুপুরাণম্, Published by the Asiatic Society of Bengal. Edited by Rajendra Lal Mitra L.L. D, C. I. E., Vol. I, P. 362.

জেনারেল কানিংহাম সাহেব-এর বিবরণ থেকে জানা যায়—

"Tamralipti—country lying to the Westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north."

তাম্রলিপ্তী—হুগলী নদীর পশ্চিম দিকে এবং উত্তরে বর্ধমান ও কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন—তমলুক রাজ্য পূর্বে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং সমুদ্রও তৎকালে তমলুকের নিকটবর্তী ছিল। এখন সমুদ্র তমলুক হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়াছে। অতএব তমলুকের পশ্চিমস্থ ময়নাগড়ের রাজগণের পুরাতন রাজ্যাংশ —সবঙ্গদেশ বা সবং পরগণা—বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট করিতে হইলে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মাতলা সহর পর্যন্ত সীমা ধরিতে হয়।"[২]

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বাংলা দেশের পুরাতন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের একতম "সমগ্র দক্ষিণ-বাঙ্গলা-ব্যাপী" বলে নির্দেশ করেছেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে যখন ভারত পরিভ্রমণ করতে আসেন, তখন তাঁর বিবরণীতে তাম্রলিপ্তের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"এই রাজ্যের পরিধি ১৪০০ 'লি' ( ২৮০ মাইল ) এবং উহার রাজধানী ১০ 'লি'র ( দুই ক্রোশ ) অধিক বিস্তৃত।"—মেদিনীপুরের ইতিহাস।

এইসব থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্তের একদিকে ছিল কলিঙ্গ দেশ। উত্তরে—বর্ধমান ও কালনা, দক্ষিণে—সমুদ্র ও পশ্চিম-দক্ষিণে—

---

১ Vide General Cunningham's Ancient Geography of India P. 504.

২ তমলুকের ইতিহাস- সোনান্দ ভারতী, পৃঃ ১০।

কলিঙ্গরাজ্য, পূর্বে—গঙ্গা। ফলতঃ তাৎকালিক 'ইহার পরিধি প্রায় ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ ছিল।'[১]

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। গয়া-জেলাস্থিত কোলাহল পর্বতের সম্মুখস্থ সরোবরের উত্তর-পশ্চিম গহ্বরের শিলালিপি পাঠ করলে মনে হয় এককালে তথায়ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

এতক্ষণ আমরা তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলাম, প্রায় তার সবগুলোই প্রাচীন পুঁথি-পত্তর ও বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অভিমত থেকে। তবুও মনে জাগে সংশয়। এই তমলুকই কি সেই তাম্রলিপ্ত? প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না পেলে মন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না তমলুকের প্রাচীনতাকে।

কিন্তু এই সংশয়ও আজ বিদূরিত হয়েছে। সম্প্রতি এমন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দেখিয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলা যায়, এই তমলুকই সেই সুপ্রাচীন কালের বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্র কর্তৃক তমলুকে অনুষ্ঠিত খনন কার্যের ফলে একটি লিপি খোদাই করা মৃৎপাত্রের অংশ পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, এই লিপিটির এতদিন পর্যন্ত কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি, অন্তত এই লিপির কোন পাঠোদ্ধার প্রকাশিত হয় নি। সাধারণ ভাবে পণ্ডিতরা এই লিপি দেখে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী লিপি। লিপির একটি আলোকচিত্র ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বার্ষিক বিবরণীতে ছাপা হয়।

---

১ "The Kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference."

See—Documents Geographiques, P. 450, and Julien's "Hiauen Thsang," Vol. III, P. 83.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর অধ্যাপক পরেশ দাশগুপ্ত ( বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান অধিকর্তা ) উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেন। খরোষ্ঠী লিপিতে ঐ মৃৎপাত্রে লেখা ছিল—তমলিপ্তস্। অর্থাৎ তাম্রলিপ্তের নীচে একটি অস্পষ্ট স্বাক্ষর। হয়ত বা সেকালের কোন মৃৎশিল্পীর।

আজকাল যেমন কোন জিনিসের নীচে থাকে প্রস্তুতকারী দেশের নাম। যেমন "মেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া, মেড্ ইন গ্রেটবৃটেন, 'মেড্ ইন ইউ. এস. এ" ইত্যাদি। তেমনি হয়ত বা কোন মৃৎশিল্পী লিখেছিল তমলিপ্তস্ বা তাম্রলিপ্তের। 'তমলিপ্তস্' শব্দটি খুব সম্ভবত পালি বা প্রাকৃতের ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ। আজকের তমলুককে আর তাম্রলিপ্ত বলে চেনা যায় না। একদা এই নগরী ছিল বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান।

নব্য প্রস্তর যুগ থেকে এখানে সভ্যতার উজ্জ্বল প্রসার। আর তখন তাম্রলিপ্ত ছিল পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ। শক, যবন, গ্রীকদের সঙ্গে ছিল এই নগরীর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এবং আজ তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করেছে ঐ মৃৎশিল্পের নিদর্শন।

প্রায় চার বছর আগে ঐ লিপিটির এনলার্জ করা ফটোটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের হস্তগত হয়। অধ্যাপক পরেশ দাশগুপ্ত লিপিটি পুনরায় পরীক্ষা করেন। হ্যাঁ, ঐ লিপিটির অর্থ—'তাম্রলিপ্তের', এ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না। অধ্যাপক দাশগুপ্তকে সমর্থন করলেন পণ্ডিত সরসীকুমার সরস্বতী। অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে এই নিদর্শনটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিককার। ইতিপূর্বে খরোষ্ঠী লিপি ভারতের পূর্বদিকে এক মথুরা পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। বড়জোর বিহারের কুমরাজারে ( পাটনার কাছাকাছি ) একটি মন্দিরের চিত্রযুক্ত ফলকে

খরোষ্ঠী লিপিযুক্ত মৃৎপাত্র ও শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। চন্দ্রকেতু-গড়ে প্রাপ্ত শীলমোহরের একটিতে লেখা ধনমিত্রেণ (ধনমিত্র সম্ভবত কোন মিত্র উপাধিধারী রাজা) এটি সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের পূর্বেকার। এ ছাড়া পাওয়া গিয়েছে কুশান আমলের লোনভিস, দ্রোণভিস্ নামাঙ্কিত নিদর্শন। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, বাংলাদেশে যে একাধিক খরোষ্ঠী লিপি (প্রাচীন পারসিক লিপি থেকে উদ্ভূত এই লিপি, ডানদিক থেকে বামদিকে লেখার রীতি) আবিষ্কৃত হচ্ছে তাতে ভাষাতত্ত্ববিদদের চিন্তা করতে হবে যে, বাংলা হরফের সৃষ্টিতে এর দান কতটুকু। এ পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে যে মৌর্য ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় হরফের সৃষ্টি।

(প্রলাপ, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৮ই জুন ১৯৬০।)

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# নামোৎপত্তির বিবরণ

তাম্রলিপ্ত নগরের জন্ম কতকাল পূর্বে হয়েছিল, তা নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। মহাভারতের যুগ থেকে তাম্রলিপ্ত নগরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পরে তাম্রলিপ্তের নিকটে কয়েকটি ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই ব-দ্বীপগুলি ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয়ে যথাক্রমে মহিষাদল, গুমগড়, দোরো, কেওড়ামাল ও হিজলী প্রভৃতি পরগণার সৃষ্টি করেছিল।[১]

হাজার হাজার বছর পূর্বে তাম্রলিপ্তও খুব সম্ভবত একটি দ্বীপ-রূপে বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছিল।[২] তারপর মূল ভূখণ্ডের সাথে কালক্রমে মিলিত হয়েছে। সেই সুপ্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটেই গঙ্গাসাগর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ গঙ্গা এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলেই নির্দিষ্ট হয়েছিল সাগর তীর্থ। এখন বহুদূরে সাগর দ্বীপে বসে এই সুপ্রাচীন তীর্থমেলা।

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk."[৩]

"গঙ্গাসাগরসঙ্গোমোপকূলে স্থিত তাম্রলিপ্ত নামের সহিত বর্তমান তমোলুক নামের বিশেষরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায়, তাহা একই স্থান বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।"[৪]

---

১ মহিষাদলের ইতিহাস—ভগবতী চরণ প্রধান।

২ Vide Journal of the Royal Asiatic Society, Vol V. P. 135

৩ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, পৃঃ ৮।

৪ ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরবর্তী, একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল, ইহার দক্ষিণে ও বামে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান ছিল। হিজলীর মসনদ-ই-আলা, পৃঃ ২৯।

তবে এই স্থানের নাম কেন তাম্রলিপ্ত হয়েছিল, নিশ্চয় করে তা' কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে কয়েকটি উপাখ্যান শোনা যায়। তারই উপরে ভিত্তি করে এর নামোৎপত্তির কারণ নির্দেশ করার প্রয়াস পাব।

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বৃন্দাবনে বাসুদেব যখন করছিলেন রাসলীলা তখন স্তম্ভন হয়েছিল চন্দ্র-সূর্যের তাঁরি ইচ্ছায়। পরে সূর্যদেব বললেন, ভারতে আমি প্রকাশিত হবো। অর্থাৎ সৃষ্টি করব দিন। তুমি শীঘ্র এসো উদয়াচলে। তখন রশ্মিজাল নিয়ে উত্থিত হলেন সারথি। তাতে পতিত হোল জ্যোৎস্না। (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হয়ে সমুদ্রপ্রান্তে হলেন লিপ্ত। যে-স্থানে লিপ্ত হয়েছিলেন সূর্যদেব, সে-স্থানই তাম্রলিপ্ত নামে হলো কীর্তিত।[১]

এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাকালে "দামল" নামে এক জাতির লোক বাস করত তাম্রলিপ্তে। এই দামল জাতির নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয় তাম্রলিপ্ত। আর এই দামল জাতিই দক্ষিণ ভারতে সৃষ্টি করেন তামিল দেশ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরাই তামিল

---

১ "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতো হি চারুণঃ।
সমুদ্রপান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ॥ ৫৬
অরুণাপাসাবশেষেণ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ববাসিনঃ॥ ৫৭"

দিগ্বিজয়প্রকাশঃ।

অথ "যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃষ্ঠা

দেশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃহৎ বঙ্গে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এ মত সমর্থন করেছেন। পৃঃ ১১০০।

খুব সম্ভবত তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ বা পালিভাষার তামলিট্টি ( তাম্রলিপ্তি ) শব্দ থেকেই 'তামিল' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পণ্ডিত কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁর "The Tamils Eighteen Hundred Years Ago" নামক পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য তা' এস্থানে উদ্ধৃত করছি—"Most of these Mongolian tribes emigrated to Southern India from Tamalitti,[১] the great emporium of trade at the mouth of the Ganges, and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the more ancient inhabitants of the Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras, as inhabitants of Bengal and adjoining seacoasts in the Vayu and Vishnu Puranas."

উক্ত পুস্তকের উপসংহারে ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—They were known as Tamils, most probably because they had emigrated from Tamilitti ( Tamralipti ) the great Sea-Port at the mouth of the Ganges.[২]

---

১ The Pali form of Sanskrit Tamralipti. It is now known as Tamluk, and lies on a bay of the Rupnarayan river 12 miles above its junction with the Hughly Mouth of the Ganges. Mc. Crindle's Ptolemy : 170

২ The Modern Tamluk on the Rupnarayan Branch of the Hoogly, 35 miles South-West of Calcutta. The Tamilittis or Tamraliptas are also mentioned as a separate nation inhabiting Lower Bengal in the Matsya, and Vishnu, and other Purans.

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ( ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ) প্রতিভা।' পত্রিকায় শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গলা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সঙ্গে তামিল ভাষার সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রাচীনকালে তাম্র-লিপ্তবাসীগণই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তামিল দেশের। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

"কনকসভৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গলায় তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্তি এবং পালিভাষায় তামলিট্টি নামে বিদিত ছিল। তামিল শব্দ উক্ত তামলিট্টি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে তাম্রলিপ্টি হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গলা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাঁড়া, নাড়া, হাড়ী, ভুঁড়ি প্রভৃতি তৎসমুদয়ের অবশেষ।"

ইহা ছাড়া আবার কেহ কেহ বলেন তমোলিপ্ত অর্থে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত ( তমঃ darkness or sin and লিপ্ত soiled ) এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এই নামকরণ কারা করেছেন আজ পর্যন্ত তা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। সম্ভবতঃ "যখন তাম্রলিপ্তি হিন্দুদিগের হস্ত বিচ্যুত হইয়া বৌদ্ধদিগের আয়ত্তাধীনে আসে, সেই সময়ে হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তি শব্দকে বিকৃত করিয়া ঘৃণাসূচক নাম 'তমোলিপ্তে' পরিণত করিয়া থাকিবেন।—পরে যখন তাম্রলিপ্ত ব্রাহ্মণদিগের ধর্মশাস্ত্রান্তর্গত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্র অর্থসূচক নাম 'তমোলিপ্তে'র ও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।"[১]

১ প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ৪৪৭ ও ৪৪৮ ( ৩৪৭ ও ৩৪৮ ? ) পৃষ্ঠা।

আর একস্থানে লেখা আছে—বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি অবিশ্রান্তভাবে অসুরগণকে ধ্বংস করে চলেন। তাঁর এই বিশ্রামহীন সংগ্রামের ফলে পূত-অঙ্গ থেকে নির্গত হতে থাকে স্বেদরাশি। এই পূত-অঙ্গের ঘর্মরাশি পতিত হয় এই পুণ্যস্থানে। দেব-শরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।[১]

"তমলুক মঙ্গল" রচয়িতা পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ভট্টাচার্য তাঁর পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"তাম্রধ্বজ রাজা লুপ্ত হইলে তাঁহার নামানুসারে এই স্থান তাম্রলিপ্তী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।"

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এখানে পূর্বকালে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেত এবং তামার ব্যবসা বেশ ভালই চলত, তাই কালক্রমে এইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে পরিচিত হয়।

"কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটি জনশ্রুতি অনুসারে ইহা ময়ূরভঞ্জের রাজা কর্তৃক সংস্থাপিত।"[২]

ওই জনশ্রুতির মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলে মনে হয় না। কারণ তাম্রলিপ্তের নাম প্রাচীন সাহিত্যাদিতে যেরূপ অধিক পরিমাণে উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা মনে হয় ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে পূর্বে তমলুক ও ময়ূরভঞ্জ এই উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ সংস্রব ছিল বলে মনে হয়।

এই সমস্ত বিভিন্ন মত থেকে তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কারণ নির্ণয় করা বড় কষ্টকর। এই বন্দর এত প্রাচীন যে এ বিষয়ে কোন অনুমান করাও অসম্ভব। তবে প্রাচীন বিভিন্ন

১ "—That it took its name from the fact that Vishnu, in the form of Kalki ( ? ), having got very hot in destroying the demons dropped perspiration at this fortunate spot which accordingly became stained with the holy sweat ( for dirt ) of the God."

—Hunter's Orissa Vol. I. P. 311.

২ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত, পৃঃ ১২।

ভ্রমণ কাহিনী সমূহ পাঠ করে মনে হয় তাম্রলিপ্তবাসীগণ খুব রণ-নিপুণ, দুর্দান্ত সাহসী নাবিক ও শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। এই 'দুর্দান্ত' শব্দটিই হয়ত ক্রমে অপভ্রংশ হয়ে হয়ে 'দামল' রূপে হীন পরিণতি লাভ করেছে তাই বা কে জানে। চলতি বাংলায় আমরা যাকে বলি 'দামাল' তারই শেষ পরিণতি এই দামল। তাম্রলিপ্তের নাম থেকেই যে 'তামিল' জাতির উৎপত্তি এবং দামল জাতি থেকেই যে তাম্রলিপ্ত নামের উৎপত্তি পণ্ডিত কনকস্‌ভাই পিলে মহাশয়ের এই যুক্তি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

# মহাভারতীয় কাল

তাম্রলিপ্তের নাম আমরা মহাভারতে অনেক জায়গায় পাই। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় মহাভারতীয় যুগে তাম্রলিপ্তের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহাভারত কত বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হয়েছিল, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। আজো সে বিরোধের সুমীমাংসা হয়নি। তবে বিদেশী এবং দেশী পণ্ডিতদের মতামত পড়ে যতদূর মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আজ থেকে কম করে হলেও ৩৩৮০ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।[১] এবং তাম্রলিপ্ত অন্ততঃ তার অনেক আগে থেকেই বর্তমান ছিল।

---

১ কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে এখানে সংক্ষেপে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করলাম।

ইউরোপীয় পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উইল্‌সন সাহেবও এই মতাবলম্বী। এল্‌ফিনষ্টোন গণনা করে এ মতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খৃঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট্ সাহেব বলেন খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। "ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খৃষ্টপূব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।" কৃষ্ণচরিত্র : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎ প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলেছেন—সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না। "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনৌ।" সকলেই জানেন যে, বৎসরে দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুইদিনে সূর্য থাকেন,

সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial Point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ পরে অয়ণ পরিবর্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়ণে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়ণে মরিব না, (তাহা হইলে সদগতির হানি হয়), অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘমাসে উত্তরায়ন হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।" তবে তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বদিনকে মকরসংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী নক্ষত্র প্রথম বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না, এবং এখন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না, এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়, ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত সুতরাং অয়ণ পরিবর্তন স্থানও বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত (Precession of Equinoxes)—হিন্দুনাম "অয়ণ চলন," কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্ত ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতিবিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়া ছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্ত কারণ হইতে ৫০'২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন। এবং সর্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০'৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন।

এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোনদিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কেন না, তাহা হইলেই "মাঘোহয়ং, সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, রবির শীঘ্রগতি মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ১৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গলা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। কৃষ্ণচরিত্র ৫ম পরিচ্ছেদের শেষাংশ।

পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন— "বঙ্কিমবাবুর এই গণনা পরিশুদ্ধ নহে। তিনি যেভাবে "তদা প্রবৃত্তশ্চ-কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" (৩৯) শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বিষ্ণুপুরাণের ৪।১।৫২ শ্লোকে ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা পুরাণ নিজেই করিয়াছেন। শ্লোক দুইটি এই—

"ত্রীণি লক্ষানি বর্ষাণি দ্বিজমানুষসংখ্যয়া
ষষ্ঠিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ।
শতানি তানি দিব্যান সপ্তপঞ্চ চ সংখ্যয়া,
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্।"

অর্থাৎ—হে ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদিগের বৎসর অনুসারে তিন লক্ষ ষাট হাজার বৎসর কলিযুগ চলিবে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়া (স্বামী) এই তিন

---

* সেকালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ৬ ঋতুর কথা মহাভারতে আছে। ১২ মাস না হইলে ৬ ঋতু হয় না।

লক্ষ যাইট্ হাজার মানুষ-বৎসরে দেবতাদের সাত যোগ পাঁচ ( ৭+৫=১২ ) অর্থাৎ বারশত বৎসর হয়। ইহার পরে আবার সত্য যুগ হইবে। কাজেই দেখিলেন, ৩৪ শ্লোকে যে বার শত বৎসর বলা হইয়াছে তাহা দিব্যমানে ১২০০ বৎসর। উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, পরীক্ষিতের সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়, যে কলিযুগের পরমায়ুঃ দিব্যমানে বার শত বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশবাদে মনুষ্যমানে ৩,৬০,০০০ বৎসর। বঙ্কিমবাবু লোককে বুঝাইয়াছেন যে, পরীক্ষিতের সময় কলির ১২০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল, এই কথা যে শুদ্ধ নহে তাহা বুঝিলেন। সাক্ষাৎ কলিযুগ প্রবেশের পূর্বেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করেন, পরীক্ষিতের সময় কলির সাক্ষাৎ প্রকাশ। এই জন্যই পরীক্ষিতের সময় হইতে কলির গণনা।

পরীক্ষিত হইতে নন্দের অভিষেককাল বিষ্ণু ও ভাগবত অনুসারে মাত্র ১০১৫ বৎসর পরে। নবনন্দ মাত্র ১০০ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পরেই চন্দ্রগুপ্ত। অতএব পরীক্ষিৎ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর দূরবর্তী।

জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বর্তমান ছিলেন। সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় ১০০১ বৎসর পরবর্তী। তৎপরে প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর, শিশুনাগ বংশ ৩৬২ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরেই নন্দ। কাজেই নন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৫০১ বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। তাহার ১০০ বৎসর পর চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে ( ১০০১+১৩৮+৩৬২+১০০=১৬০১ ) বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। চন্দ্রগুপ্তেরই ১৬০১ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ইহা বিষ্ণুপুরাণ হিসাব করিয়া দিয়াছেন। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ ৩২৭ পূর্বাব্দের লোক হইলে খ্রীঃ ১৯২৮ পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। পরীক্ষিৎ হইতে ১০১৫+১০০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার যে অধিকার আমাদের আছে, সহদেব হইতে ১৬০১ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার সেইরূপ অধিকার আমাদের আছে। নক্ষত্র গণনার কথা পরে বলিতেছি, বরং ভারতযুদ্ধকারী সহদেব হইতে একাদিক্রমে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের কাল গণনাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ কালের ছন্দ্রকট্টাস্ কি এই পুরাণোক্ত চন্দ্রগুপ্ত? তাহা হওয়া যেন অসম্ভব। পঞ্জিকোক্ত কল্যব্দ ধরিয়া হিসাব করিলেও কোন মতেই তাহা হইতে পারে না। কেন না বর্তমান কল্যব্দ ৫০১৩ হইতে ১৬০১ বিয়োগ করিলে ৩৪১২

হয়। উহা হইতে ১৯৬০ বিয়োগ করিলে ঠিক ১৫০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। এই সময়ে পাতঞ্জল মহাভাষ্য রচিত হওয়ার কথা দাঁড়ায়। ৩২৭ ও ১৫০২ অঙ্কে অনেক অন্তর। বৌদ্ধদিগের বিবরণানুসারে ৪৩৩ খ্রীঃ পূঃ ভদ্রবাহু নামক একজন লোক জন্মেন। তাঁহার সমকালে এক চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ পরেও এক চন্দ্রগুপ্ত দেখা যায়। ইহাতে বোধহয় চন্দ্রগুপ্ত একটি উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "বোধ হয় অনেকেই সাণ্ড্রাকট্টাস্ ছিলেন।" সুতরাং গ্রীক সাহিত্য দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরা যায় না—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালও ধরা যায় না।

সৌর মাসের হিসাবে ক্রান্তিপাতের গতির অনুপাত দ্বারা বৎসর হিসাব করা ঠিক নহে। যে ভীষ্মের উক্তি লইয়া মাঘে উত্তরায়ণ-প্রারম্ভের হিসাব বঙ্কিমবাবু দিয়াছেন, সেই ভীষ্মই বিরাট পর্বে চান্দ্র মাস ধরিয়া অজ্ঞাতবাস পূরণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। নীলকণ্ঠকৃত বিচার দ্রষ্টব্য। তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ২৪-২৭।

পঞ্জিকাকারগণের মতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলির্গতাব্দাঃ ৫০৬৪ বৎসর। তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সময় ৫০৬৪ বৎসর হইতেছে।

জ্যোতির্বিদাভরণে পাই—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু—
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শক কারকানৃপাঃ॥

শ্লোকটির আবার অন্যপাঠ এইরূপ

"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রম শালিবাহনৌ
ততোনৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাদ্বেযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ব বিশ্বে ১৩৫ হ্বভ্রখখাষ্টভূময়ঃ ১৮০০০।

ততোঽযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ ॥
দশমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থ—যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলী (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দ স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের ও ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে, এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্তমান সময়ে শালিবাহন শকাব্দের মান ১৮৮৭ বৎসর। তা হলে জ্যোতির্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮৮৭) থেকে ৫০৬৬ বৎসরকে আমরা বর্তমান বছর বলে ব্যবহার করছি। এবং

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"—ভাস্করাচার্য
"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য।" মকরন্দ,

এর দ্বারা বুঝায়, ৩১৭৯ বৎসর কলি গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ। যোগ করিলে কলি প্রবৃত্তির প্রথম বর্ষ হইতে উক্ত ৫০৬৪ বর্ষই বর্তমান বর্ষ ইহা স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শক ও কল্যব্দের এক বর্ষই বলিতে হয়।" জন্মভূমি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১।

প্রাচীনকালের একমাত্র ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, তা কহ্লন পণ্ডিত বিরচিত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী'। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে একমাত্র এই গ্রন্থকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। এতে লিখিত আছে—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যাধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥
রাজতরঙ্গিনী, প্রথমতরঙ্গ, পৃঃ ৩

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলি প্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলে অনুমিত হয়। অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পুর্বে হয়। রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা আরও বলেন কাশ্মীর রাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় ১৬ই কার্তিক, সোমবার ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরে (রাজতরঙ্গিনী মতে কল্যব্দ ৬৫৩,২,৫২৬ শকাব্দ পূর্বে, ২৩৯১ সংবৎ পূর্বে, ২৪৪৮ খ্রীষ্ট পূর্বে)

দুষ্টমতি দুর্যোধন বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহ দাহ করতে পুরোচন নামক যে মন্ত্রীকে প্রেরণ করে ছিলেন, সেই মন্ত্রী ছিল গ্রীস দেশীয় যবন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহা যজ্ঞের কাল কলির ১২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্বে, এবং ২৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে। এই যজ্ঞে তাম্রধ্বজ রাজাও যোগ দিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় অগ্রহায়ণ মাসের ১লা থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৮ দিন পর্যন্ত। এইস্থান বর্তমানে ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ। সে হোল কলির ১৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্বে, এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে।

যুধিষ্ঠির মোট ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স ১২৬ বৎসর তখন তিনি মহাপ্রস্থান করেন। সে হোল কলির ১৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ পূর্বে ২২৫৬ সংবৎ পূর্বে, এবং ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে। আর্যদর্শন, দশম খণ্ড, ৩৮৭—৩৯৩ পৃঃ।

পরিশেষে আমরা পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের মতামত উল্লেখ করে এ বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তি রেখা টানব। বসু মহাশয় প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের পদ্ধতি অনুযায়ী 'মন্বগণনা' দ্বারা এ বিষয়ের সম্পর্কে যে নতুন আলোকপাত করেছেন তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। 'পুরাণ প্রবেশ' নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করছি। আশাকরি এ আলোচনা রসিক পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করবে। বসু মহাশয় মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কাল ৪০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে স্থিরবিন্দু ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করেছেন ১৪১৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। এই দুইয়ের ব্যবধানকাল ১০১৫ বৎসর তিনি কোথা থেকে কিভাবে গ্রহণ করলেন তা' দেখা দরকার। পুরাণাদিতে কয়েকস্থলেই পরীক্ষিৎ এবং মহাপদ্মনন্দ এই দুই রাজার ব্যবধান কাল সম্পর্কে "পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর" এই নাম দিয়ে একটি "কাল-পরিমাণ" উল্লিখিত আছে। বিষ্ণু পুরাণে (৪।২৪।৩২) ১০১৫ বৎসর, বায়ু পুরাণে (১৯।৪।১৫) ১০৫০ বৎসর, মৎস্যপুরাণে (২৭।৩।৩৫) ১০৫০ বৎসর এবং

ভাগবতে (১২।২।২৫)। ১১১৫ বৎসর পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল বলে উল্লিখিত আছে। বসুমহাশয় এই তিনটি কালের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের ১০১৫ বৎসরই বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কাল ৫০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দের সাথে যোগ করেছেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করেছেন ৪০১+১০১৫=১৪১৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। আপত্তিকারীরা বলতে পারেন যে, এক্ষেত্রে ১০১৫ বৎসর, ১০৫৫ বৎসর এবং ১১১৫ বৎসর পুরাণোক্ত এই তিনটির মধ্যে কোনটি বেশী ও কোনটি কম বিশ্বাসযোগ্য তা নির্ণয় করে দু'টিকে বর্জন করে তৃতীয়টিকে গ্রহণ করাই আসল প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে' পুরাণোক্ত পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কালের উপর নির্ভর করে কাল নির্ণয় ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল-নির্ণয় সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত কিনা? বিশেষতঃ যে স্থলে অন্য প্রকারে কালনির্ণয় করার উপযোগী নিশ্চিততর উপকরণ বিদ্যমান তখন সংশয়াত্মক পুরাণোক্তি গ্রহণ করা কেন? দেখা যায় যে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কালকে স্থিরবিন্দুরূপে গ্রহণ করে 'মৃতগণনার'[১] পদ্ধতিতে কালনির্ণয় করার জন্য নিশ্চিততর 'রাজনামমালা'[২] পাওয়া যাচ্ছে এবং যখন তার সাহায্যেই অনেকটা

১,২—মিশরদেশীয় কালপঞ্জী নির্ণয়ে দু'প্রকার প্রণালী বা পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় তার প্রথম প্রণালীর নাম 'মৃতগণনা' ( Dead reckoning )। সুদূর অতীতকালে মিশর দেশে বিভিন্ন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন—নানা উপায়ে তাঁদের নামমালা পাওয়া গেছে। ( তন্মধ্যে Champollion—আবিষ্কৃত Turin Papyrus-এ লিখিত রাজমালা এবং ( Manetho ) বর্ণিত বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ) এইভাবে প্রাপ্ত রাজসংখ্যার সঙ্গে গড় রাজত্বকাল ( Average period of reign ) গুণ করে যে বর্ষ পরিমাণ পাওয়া যায় তা, কোন সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত সাল তারিখের সঙ্গে যোগ করে বিভিন্ন রাজবংশের 'রাজ্য আরম্ভকাল', 'মোট রাজত্বকাল' প্রভৃতি নির্ণীত হয়েছে। মোটকথা জনসাধারণের মধ্যে 'এক পুরুষে' ২৫ বৎসর ধরে কিংবা ১০০ বৎসরে 'চার পুরুষ' গণনা করে যে ভাবে কাল নির্ণয় করা হয় 'মৃত গণনা' ও তদ্রূপ একটি গণনা মাত্র। অবশ্য এতে ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় নিশ্চিত হাতে পারতেন না। তাই তাঁরা 'জ্যোতিষিক কাল গণনা'র আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সভায় তাম্রলিপ্তাধিপতি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদিকে ভারতের সমবেত শক্তিশালী বীর রাজপুত্রদের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছেন—

---

সুনিশ্চিত ভাবে কালগণনা ও কালনির্ণয় করা চলে তখন সংশয়যুক্ত পুরাণোক্তি গ্রহণ করা কি উচিত?

বসু মহাশয় প্রদর্শিত রাজানামমালায় লক্ষ্য করা যায় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বল এবং পরবর্তীকালের মহাপদ্মনন্দের পর্যায়সংখ্যা যথাক্রমে ১৮১ ও ২১৭। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে ৩৬ পুরুষ ব্যবধান ছিল। এই ৩৬ এর সঙ্গে পর্যায় কাল ২৫ বৎসর দিয়া গুণ করলেও ৯০০ বৎসরের বেশী পাওয়া যায় না। ৪০১ খ্রীঃ পূর্বের সঙ্গে এই নয় শত বৎসর যোগ করলে ৪০১+৯০০=১৩০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হিসাবে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের নিকট বৃহদ্বল ও নন্দের ব্যবধানকাল হিসাবে ৯০০ বৎসর ও একটু বেশী বলে মনে হতে পারে। কারণ তাঁরা বলতে পারেন যে, যেহেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় জনসমাজে নানা কারণে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেহেতু এই সময়কার পর্যায়কাল ২৫ বৎসরের ও কম ধরা সঙ্গত। অবশ্য আপত্তিকারীদের এই যুক্তি খণ্ডনকল্পে বলা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজে বাল্য বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হলেও তার প্রভাব বহুদিন যাবৎ ক্ষত্রিয় বা রাজন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। উহা ক্ষত্রিয়েতর সমাজেই ছিল সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের পর্যায়কাল ২৫ বৎসর ধরা অসঙ্গত বলে মনে করা উচিত নয়।

উপরে পুরাণোক্ত, 'পরীক্ষিৎ—নন্দান্তর কাল' ১০১৫ বৎসর এবং মৃত-গণনা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ৯৮০ বৎসরের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা' যা' বলা হোল তা' সত্বেও আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য মোটামুটি ভাবে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হিসাবে গ্রহণ করেছি—(১) ইহা পুরাণোক্ত নক্ষত্র যুগের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন (২) অল্প পুরুষের মধ্যে 'পর্যায়কাল' অথবা 'গড় রাজত্বকাল' উভয়ই ২৭।২৮ বৎসর এমন কি ২৯।৩০ বৎসরও হতে পারে। এক্ষেত্রে ৩৪ পুরুষে ১০০০ বৎসর ধরলে পর্যায়কাল বা গড় রাজত্বকাল হয় ২৯৫ বৎসর। অতএব ইহা খুব অসম্ভব বলে মনে হয় না।

"হে ভগিনি! দেখ কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পাণ্ডনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎ পুত্র শল্য ** ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাজনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"[১]

তারপরে চলে আসুন সভাপর্বে। মহাবীর ভীম চলেছেন বীর বিক্রমে দিগ্বিজয়ে। একে একে তিনি তৎকালের সকল বীরকেই করছেন পরাজিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চলেছে তাঁর বিজয় অভিযান। অবিশ্রান্ত তৃতীয় পাণ্ডবের এই দুর্জয় অভিযান। অবশেষে এসে হাজির হলেন মোদাগিরিতে।

'অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানাং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥ ২১ ॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ং রাজানাঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২ ॥

---

১ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদি পর্ব, ২৯৩ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা।

"ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ। * * *
কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পাণ্ডনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩
* * *
এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ॥ ২৩
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়া প্রথিতা ভুবি।
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ সুভেহদ্যতম্॥ ২৪
ইত্যাদি পর্বণি স্বয়ম্বরপর্বাণি রাজনামকীর্তনে
অষ্টাশীত্যধিকশতোঽধ্যায়ঃ।

মহাভারতম্, আদিপর্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪ ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥ ২৫ ॥

ইতি সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ[১]।

"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনোজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধিশ্বর এবং মহাসাগর কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"

এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়, তৎকালে বাংলা দেশে তাম্রলিপ্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি জনপদ ছিল। এবং বাংলা এই নামে সমগ্রদেশকে বুঝাত না। বাংলা ছিল কয়েকটি খণ্ড খণ্ড স্বাধীন জনপদে বিভক্ত। অনুবাদকারকও তাই সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি এক একটি পৃথক রাজের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাম্রলিপ্তাধিপতি কোন রাজা তখন বর্তমান ছিলেন, তা' কোথাও উল্লেখ করেননি।

তবে এ সত্য প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্তাধিপতি তৎকালীন ভারতীয় ধনবান ভূপতিগণের মধ্যেও একজন ছিলেন। তাঁর ধনদৌলত

১ মহাভারতম্, সভাপর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ৭৩।

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব, পৃঃ ৪১—৪২।

নিতান্ত কম ছিল না। পাণ্ডবগণের যজ্ঞে তিনিও উপস্থিত হয়েছিলেন বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক আয় তখন ছিল বিপুল। কলম্বাসের বহুপূর্বে ভারতবাসীগণ আমেরিকার মাটিতে গিয়ে সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন সেই সুদূর অতীতকালে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব।

সভাপর্বে এমনিভাবে উক্ত হয়েছে –

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যাথ ॥ ১৯ ॥
ঈপাদন্তান হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান কুথাবৃতান।
শৈলাভান্নিত্যমত্তা শ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥ ২০ ॥
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবন্তঃ কুলীনাশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥ ২১ ॥"[১]

ইতি সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্যোধন সন্তাপে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

"বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্বতপ্রতিম, কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।"[২]

আমরা পূর্বেই বলেছি, তাম্রলিপ্ত ছিল অতি পুণ্যস্থান।

---

১ মহাভারতম্, সভাপর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ১০৪

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব পৃঃ ৬৯

এখানেই গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল হেতু অনেকেই পুণ্যতীর্থ বলে মনে করতেন। অবশ্য তীর্থ বলে মনে করার আরো অনেক কারণ আছে, তা' পরে বলছি। কিন্তু সেই মহাভারতীয় যুগেই তাম্রলিপ্ত যে পুণ্য জনপদরূপে পরিগণিত হয়েছিল, তা' জ্ঞানী সঞ্জয়ের উক্তি থেকেই বোঝা যায়। ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সেকালের পুণ্যবান নদী ও জনপদের নাম বলতে গিয়ে তাম্রলিপ্তের নামও উল্লেখ করেছেন—

"কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ।
কিরাতা বর্ব্বরাং সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ" ॥ ৫৭ ॥
ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাণি
ভারতীয় নদ্যাদি কথনে নবমোঽধ্যায়ঃ।[১]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাম্রলিপ্ত রাজ পাণ্ডবগণের বিপক্ষে ও কৌরবগণের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। মহাভারত দ্রোণপর্বে পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবা মাত্র তিনি (পরশুরাম) একান্ত ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র. ত্রিগর্ত্ত, মার্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[২]।"

এরপর কর্ণপর্বে আবার তাম্রলিপ্ত রাজের নাম পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাম্রলিপ্তবাসী সৈন্যগণ বিপুল শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন—

---

১ মহাভারতম্, ভীষ্ম পর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ২৪

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারত, দ্রোণ পর্ব পৃঃ ৯৮।

"হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, মণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। *। ** হস্তিশিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছন্দ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল।"[১]

নিম্নলিখিত ঘটনাটি ব্যাস-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্বে ও কাশীরাম দাস প্রণীত মহাভারত অবলম্বনে লিখিত হোল।

রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব, তা' রক্ষা করছেন তাম্রধ্বজ মহাবীর। তাম্রধ্বজ হলেন ময়ূরধ্বজের পুত্র। বহুলধ্বজ সেনাপতিও রয়েছেন সংগে। প্রথমে তিনিই দেখলেন পাণ্ডবদের যজ্ঞীয় ঘোটক। সংবাদ দিলেন তাম্রধ্বজকে সেনাপতি। তাম্রধ্বজ অশ্ব ধোরলেন পাণ্ডবদের। শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্র-ব্যূহ রচনা করে চললেন অশ্ব উদ্ধার করতে। অর্জ্জুন, অনু, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি ও চললেন সংগে। ঘোরতর যুদ্ধ হোল উভয় পক্ষে। কিন্তু মহাবীর তাম্রধ্বজের কাছে কেউই এঁটে উঠলেন না। পরাজিত হলেন সকলেই। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুনও পড়লেন মূর্চ্ছিত হয়ে। এই শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল নর্ম্মদা নদীর তীরে।

---

১ মহাভারত, কর্ণ পর্ব—কালিপ্রসন্ন সিংহ পৃঃ ৩৪ ও ৩৫।

এদিকে তাম্রধ্বজ দু'টি অশ্ব নিয়ে হাজির হলেন নিজ 'নিকেতনে'। পিতাকে জানালেন সব সংবাদ। শুনে আনন্দিত হলেন রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ। কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননায় ব্যথিত হলেন হৃদয়ে।

মহাবৈষ্ণব ময়ূরধ্বজকে ছলনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করে হাজির হলেন রাজসভায়। ময়ূরধ্বজের শরণপ্রার্থী হয়ে বললেন ছদ্মবেশী কৃষ্ণ, আমার পুত্রকে আক্রমণ করেছে এক পরাক্রান্ত সিংহ। সে চায় আমার পুত্রের মাংস। অনেক বুঝিয়ে এবং নিজের শরীর দেব অঙ্গীকার করেও সিংহ ছাড়তে চায় না পুত্রকে। তবে একটি সর্তে সে রাজী আছে, যদি দয়া করে আপনি নিজেকে সমর্পণ করেন সিংহের কাছে, তাহলে ছেড়ে দেবে সে পুত্রকে। পরমবৈষ্ণব ময়ূরধ্বজ সংগে সংগে রাজী হলেন পরহিতার্থে প্রাণ উৎসর্গ করতে। কিন্তু কৃষ্ণ চান অর্ধেক শরীর। আবার তা কেটে দিতে হবে রাজপুত্র ও রাণী এই দু'জনকেই। অগত্যা তাতেই সম্মত হলেন রাণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ। অর্ধেক শরীর কোন কাজে এলো না মনে করে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ ব্যথিত হলেন অন্তরে। বামচক্ষু দিয়ে অবিরল ধারায় বর্ষিত হোল অশ্রু। দেখে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ চললেন উঠে। ব্যথার দান নেবেন না তিনি। তখন বললেন—

'দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষু করয়ে ক্রন্দন ॥'[১]

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের এই নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ দেখে মুগ্ধ হলেন। প্রকাশ করলেন স্বরূপ। নর-নারায়ণ মূর্তি দেখে রাজা ময়ূরধ্বজ সগোষ্ঠী হলেন কৃতকৃতার্থ। ধনজন রাজঐশ্বর্য সব পরিত্যাগ করে শরণ নিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদতলে।[২]

---

১ মহাভারত—কাশীরাম দাস (দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত) পৃঃ ১০০৪

২ জৈমিনি-ভরতম্, ৪১—৪৬ অধ্যায়

বিশ্বকোষ, ৬৯০—৬৯১ পৃষ্ঠা

তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ৬, ৭, ৮ ও ৯ পৃষ্ঠা, এবং A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal P. 23—25

আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় তমোলুক ইতিহাসে' লিখেছেন—'উক্ত ঘটনা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতেও উল্লেখ রহিয়াছে...।' 'বিশেষতঃ জৈমিনি[১] ও কাশীরাম দাস[২] উভয়েই উক্ত ঘটনা নর্ম্মদা

১। পুরাৎপ্রমুক্তোরাজেন্দ্র তৈঃ সকৃষ্ণৈর্মহাবলৈঃ। ৮
যাবৎপ্রয়াতিতুরগ স্তাবৎ তাম্রধ্বজনসঃ।
বীক্ষিতো রক্ষতাম্বংহি বাজিমেধ তুরঙ্গমং। ৯
প্রমুক্তং রত্ননগরাৎ স্বপিত্রাবর্হিকেতুনা।
তাম্রধ্বজস্য হংসং তমর্জ্জুনস্য হয়ো যযৌ॥ ১০
* * * *
রণভূমিং পরিত্যজ্য সমায়াহি যতোব্রজে
পিতাস্য দীক্ষিতঃ পার্থ বিদ্যতে নর্ম্মদাতটে॥ ৩৬
শূরোয়ং জিত কামস্ত সত্যবাগন সূয়কঃ।
ন বোধনীয় পার্থেন সত্যামেতদ্বদামিতে॥ ৩৭"
জৈমিনি-ভারতম, একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।
বেনারস যন্ত্রে মুদ্রিত, ৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ—"জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সহিত মহাবল বীরগণনগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে ঐ তুরঙ্গম গমন সময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের দৃষ্টি বিষয়ে পতিত হইল। তিনি পিতৃদেব বার্হধ্বজ ( ময়ূরধ্বজ ) কর্তৃক রত্ননগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব এদীয় অশ্বের নিকট গমন ও তাহার বদন আঘ্রাণ পূর্বক ধ্বস্তকর্ণ হইয়া শব্দ করতে লাগিল এবং এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত ও ক্রোধ ভরে দশন দ্বারা তাহার প্রোথস্থিত মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিল। * * * * বাসুদেব কহিলেন—পার্থ! তুমি আমার সহিত রণভূমি ত্যাগ করিয়া আগমন কর। ইহার পিতা বার্হধ্বজ নর্ম্মদাতটে যজ্ঞসূত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন ও শূর, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে। আমি গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

জৈমিনিভারত, একচত্বারিংশ অধ্যায়, নতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২। 'শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অশ্ব সঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন॥

তীরে রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এখন পর্যন্ত নর্ম্মদার নিকট, বিলাসপুরের উত্তরে, রত্নপুর নামে স্থ ন বর্তমান রহিয়াছে।'[১]

অতএব রক্ষিত মহাশয়ের মতে উক্ত রত্নাবতীনগর নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তে নহে।

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, জৈমিনি বা কাশীরাম দাস কেহই এমন কথা বলেন নি যে রত্নাবতীপুর নর্ম্মদা নদীর তীরে। পক্ষান্তরে তাঁরা বলেছেন, ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব তাম্রধ্বজ রক্ষা করছেন এবং সেই অশ্ব নিয়ে তিনি বিচরণ করতে করতে এসেছেন নর্ম্মদার তীরে। সেখানেই দেখতে পেলেন পাণ্ডবদের অশ্বকে। তারপর কাশীরাম দাস বলছেন—সেই নর্ম্মদার তীরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে মূর্চ্ছিত করে—

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরের ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন নরপতি।
অশ্ব রক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের ঘোড়া গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব,
লক্ষ্মীবিলাসযন্ত্রে মুদ্রিত, ৮৯৩ পৃষ্ঠা।

১ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত পৃঃ ২২—২৪।

'সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে নিজ সৈন্য লয়ে সঙ্গে
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।'[১]

এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে নর্ম্মদা তীর থেকে তাম্রধ্বজ এলেন নিজ রাজ্য রত্নাবতীপুরে। রত্নাবতীপুর নর্ম্মদার তীরে এমন কথা কোথাও লেখা নাই বা কবিও সেকথা বলেন নি।

জৈমিনিও বলেছেন—'তিনি (তাম্রধ্বজ) পিতৃদেব বার্হধ্বজ (ময়ূরধ্বজ) কর্তৃক রত্ননগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব রক্ষার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় ময়ূরধ্বজের অশ্ব রত্ননগর থেকে বেরিয়ে (প্রমুক্ত) তার ইচ্ছে মত চলেছে আর তাম্রধ্বজ আছেন তার রক্ষণাবেক্ষণে। অতএব রত্নাবতীপুর যে নর্ম্মদার তীরে নয় একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রত্নাবতীপুর তা'হলে কোথায়? রক্ষিত মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"এখন পর্যন্ত নর্ম্মদার নিকট, বিলাসপুরের উত্তরে, রত্নপুর নামে স্থান বর্তমান রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্ভবতঃ নর্ম্মদা তীরবর্তী রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়[২]।"

ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন তমলুকই রত্নাবতীপুর।[৩] পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী ও ঐ মতাবলম্বী। তিনি আরো বলেন নর্ম্মদা তীর পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল বিস্তৃত।[৪]

এমতাবস্থায় রত্নবতীপুর যে কোথায় ছিল তা' সিদ্ধান্ত করা বড় দুষ্কর। তবে তমলুকে জিষ্ণুহরির মন্দির আজো বর্তমান। প্রাচীন

---

১। মহাভারত—কাশীরাম দাস (দেবসাহিত্য সং) পৃঃ ১০০০।

২। তমোলুক ইতিহাস—পৃঃ ২৪

৩। "288. Supposed to be referred to as Ratnavati in the Kasidas, or Bengal recession of the Mahabharat, Aswamedhparva. The local name of Ratnavati still survives at Tamluk,—" Hunter's Orissa, Vol 1. P. 309.

৪। তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী পৃঃ ৮

*মন্দির রূপনারায়ণ গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির আবার স্থাপিত হয়েছে। জৈমিনি মহাভারত* ব্যাসদেবের অনেক পরে রচিত হয়েছিল। তাই এই ভারতের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, এই বহু প্রাচীন মতবাদ ও জনশ্রুতিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তাই এ সম্পর্কে আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তমলুকের অনেক প্রাচীন নাম পাওয়া গিয়েছে কিন্তু রত্নগর বলে অন্য কোন স্থানে বড় একটি দেখা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য রত্নাবতী নগরী নর্ম্মদার তীরে থাকলেও সেই রত্নপুর কৃষ্ণার্জ্জুনের শোচনীয় পরাজয়ের স্থান নয়।

জনশ্রুতি মতে, ময়ূরধ্বজ চেয়েছিলেন কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্তি যেন রত্নাবতীপুরের অধিবাসিগণ চিরকাল দেখতে পায়। তাই ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সেই ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন। তাইতো আজো তমলুকে আছে তাঁদের প্রস্তরময় মূর্তি। বিগ্রহ দুটি-ই কিন্তু বিষ্ণুর।

এইসব প্রাচীন জনশ্রুতির মূলে সত্য যে একেবারে নেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আর সবশেষে আমার বক্তব্য হোল এই, তমলুক যেমন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলে আজ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তেমনি রত্নাবতীপুর আর তাম্রলিপ্ত একই স্থান এই সত্য প্রমাণ করতে হলে আরো কিছু প্রাচীন পুঁথি-পত্র থেকে বের করতে হবে তার উল্লেখযোগ্য নজির। তা না হলে জোর করে এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

মহাভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে আর কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায় না। তবে অনেকে হরিবংশে তাম্রলিপ্তের নাম আছে এবং হরিবংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পর্ব বলে গণনা করেন। আমরা কিন্তু হরিবংশকে মহাভারতীয় যুগের গ্রন্থ বলে মেনে নিতে রাজি নই। পৌরাণিক যুগে তাম্রলিপ্তের কথা আলোচনা প্রসংগে

হরিবংশের কথা আলোচিত হবে। এ বিষয়ে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অষ্টাদশপর্ব মহাভারত অনুবাদ করার পর হরিবংশ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হবো।

"অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনা প্রণালী ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে হরিবংশ শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত থাকিলে লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"[১]

বেদের অন্য কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায় না। একমাত্র অথর্ববেদের পরিশিষ্টে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়।[২]

---

১ কৃষ্ণচরিত্র (বসুমতী সং) পৃঃ ৩৫—৩৬। ২ তমলুক মঙ্গল, পৃঃ ২।

## চতুর্থ অধ্যায়

# পৌরাণিক যুগ

পৌরাণিক যুগ কিন্তু মহাভারতীয় যুগের পরে নয়। অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে বিতাড়িত করার জন্য। তাই প্রকৃতপক্ষে পুরাণগুলি বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক কালে রচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[১] কিন্তু তবুও প্রশ্ন উঠে অষ্টাদশ পুরাণ যে ব্যাসদেবের প্রণীত বলে প্রসিদ্ধি আছে? তা'হলে ত পুরাণগুলিকে মহাভারতীয় যুগের পরই স্থান দিতে হয়। এ বিষয়ে একমাত্র বক্তব্য এই যে, ব্যাসদেব কখনই অষ্টাদশ পুরাণ লেখেননি বা তাঁর একার লেখা অষ্টাদশ পুরাণও নয়। এমন হতে পারে অষ্টাদশ পুরাণ বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন। ব্যাস নাম নয় উপাধি মাত্র। মহাভারতকারের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ব্যাস উপাধির কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"বৈদিক সূক্ত সকল * সংকলিত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি এই বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগ জন্য "ব্যাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাহার উপাধি মাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ, এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বলিত।' পৃঃ ৩১।

তা'হলে প্রশ্ন উঠে পুরাণগুলির রচয়িতা কাঁহারা? এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। এমন হতে পারে সেকালে যিনি কিছু পুরাণতত্ত্ব সংগ্রহ করে বই লিখতেন তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী হতেন। যাইহোক এ সম্পর্কে

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩০—৩৬।

বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নয়। আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে পুরাণ যদি বৌদ্ধযুগে রচিত হয়ে থাকে বা বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়নের জন্য এর সৃষ্টি, তা'হলে বৌদ্ধযুগের পর এই অধ্যায়ের সূচনা করা হোল না কেন? এ সম্পর্কে আমি নিজে অনেক চিন্তা করে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হই। স্থির করি বৌদ্ধযুগের পর এই অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু তাতেও মেটে না সমস্যা। ঐতিহাসিক যুগ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছে। বৌদ্ধযুগ থেকেই আমরা প্রকৃত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সন্ধান পাই। বৌদ্ধসাহিত্য জনগণের সাহিত্য। সেখানে দেবতা বড় নয়, প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। মানুষের কথাই বেশী চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু পুরাণের নায়ক-নায়িকাগণ প্রায় সকলেই অতিমানব। তাঁদের লীলাখেলা মর্তের মাটিতে নয়, স্বর্গের নন্দনকাননে। সকলেই তাঁরা দেবতা। দেবতাদের কথা তাই বৌদ্ধযুগের পর লিখতে হলে এই পুস্তকের সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে না। সে কেমন যেন বেসুরো ঠেকবে। মর্তের মাটিতে নেমে এসে, মর্তের মায়ায় জড়িত হয়ে, আবার স্বর্গে ফিরে যেতে প্রাণ যে আকুলি-বিকুলি করে উঠে। তাই দেব-দেবীর কথা আগেই সেরে নেওয়া ভাল বলে মনে করি। এই জন্যই মহাভারতীয় যুগের পর পৌরাণিক যুগের অবতারণা।

পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম যতবারই উল্লিখিত হয়েছে, তার সবই তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্য মূলক। বৌদ্ধযুগে এই সামুদ্রিক বন্দর যেমন বাণিজ্যে খ্যাতিলাভ করেছিল, তেমনি আবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও সঙ্ঘারামে ছেয়ে গিয়েছিল। তাই এই বৌদ্ধ কবলিত বন্দরকে হিন্দুদের তীর্থস্থান করার মানসে নানারকম কাল্পনিক উপাখ্যান ও কাহিনীর সৃষ্টি করে জনচিত্তকে বুদ্ধধর্ম থেকে সরিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। নিম্নের ঘটনাগুলি এই সত্যেরই পরিচয় দেয়।

দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের রাজসভা। একদিন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন সেই দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সখাকে, হে প্রভো, আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থানে সব সময় বাস করেন? জানতে আমার খুব ইচ্ছে করে। শুনে প্রীতিলাভ করব আমি। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ শুনে বললেন, সখে, তাম্রলিপ্ত ছাড়া আমার অন্য কোন প্রীতিপ্রদ স্থান ভূমণ্ডলে নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল কখনো পরিত্যাগ করেন না, আমিও তেমনি, হে কৌন্তেয়, তাম্রলিপ্ত পরিত্যাগ করতে কখনো পারি না। আমি যুগে যুগে সব তীর্থ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তাম্রলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করতে পারি না। এ তুমি স্থির জেনো।[১]

এবার আমরা ব্রহ্মপুরাণ থেকে যে কাহিনীটি বর্ণনা করব, এই কাহিনীটিতে তাম্রলিপ্তকে 'কপালমোচন তীর্থ' নামে খ্যাত করা হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ।

ব্রহ্মা-তনয় দক্ষপ্রজাপতি। তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। আবার দেবাদিদেব মহাদেবের শ্বশুর। সেই দক্ষপ্রজাপতিকে দক্ষযজ্ঞে হত্যা করেছিলেন মহাদেব। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। ফলে দক্ষশির

---

১। "পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠী মধ্যে গতোঽর্জ্জনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ! ভূতল মধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্রমে প্রীতিরুত্তমা॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্মা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তাং হি নত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥"
প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ১৯৯ পৃঃ ও বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠা।

আটকিয়ে গেল মহাদেবের হাতে। মহাচিন্তায় পড়লেন তিনি। কেমন করে এই মহাপাপ থেকে পাবেন নিষ্কৃতি! দেবতারা বললেন পরিভ্রমণ করুন ভারতের সকল তীর্থ। কিন্তু তবুও দক্ষ-কপাল পড়ল না মহাদেবের হাত থেকে। অবশেষে ভোলানাথ হিমালয়ে বসলেন বিষ্ণুর ধ্যানে। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন বিষ্ণু, যেস্থানে গেলে ক্ষণকালের মধ্যে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, বলছি সে স্থানের মাহাত্ম্য। ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাতীর্থ তাম্রলিপ্ত। সে তীর্থে স্নান করলে মানুষ বৈকুণ্ঠে যায়। অতএব সেখানে গেলে পাপমুক্ত হবে তুমি। বিষ্ণুর মুখে তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্য শুনে ভোলানাথ চললেন সেই মহাতীর্থে। বর্তমান বর্গভীমা মন্দির ও জিষ্ণুহরির মন্দিরের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র এক সরসী নীরে নেমে স্নান করলেন মহাদেব। অমনি হাত থেকে দক্ষ-শির হোল বিমুক্ত। দর্শন পেলেন পালনকর্তা বিষ্ণুর। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন —যে মহাপাপ থেকে মুক্ত হলাম আমি, আজ থেকে সেই এই স্থান "কপালমোচন তীর্থ" নামে প্রসিদ্ধি হবে। স্নান করলে এখানে সর্বপাপে মুক্ত হবে মানুষ।[১] "কাল সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতঃপ্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থানটি (কপালমোচন নামক

---

১। "পুরা দক্ষবধে যস্মাৎ তৎশিরঃ স্বকরে শিবঃ।
দদর্শ তত্তস্মান্মোক্তুং তীর্থযাত্রাঞ্চকারবৈ॥"
"ভূতলে সর্ব্বতীর্থানি পর্য্যটন্ন বিনির্গতং।
তস্মাদ্ভীতো হরোগত্বা স্থিতবান্ গিরিগহ্বরে॥"
"ত্বয়া জ্ঞপ্তং পুরা যস্মাৎ কর্ত্তুং তীর্থাটনং ময়া।
কৃতং তীর্থাটনং তস্মাৎ কস্মাৎ পাপান্নহীয়তে॥"
"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃ পাপাস্বর্গো ভবিষ্যসি॥"
"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থ বরং বসেৎ।

সরোবর) বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে প্রাচীন বিষ্ণু-নারায়ণের মন্দির দণ্ডায়মান ছিল, সে স্থান এক্ষণে নদীগর্ভে নিহিত—তথায় অদ্যাপিও বারুণী উৎসবে পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে জনগণ অবগাহন করিয়া থাকে। তমোলুকে প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়া, এই চারিবার মেলা হইয়া থাকে।"[১]

এই কপালমোচন তীর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধ আছে। ভারতবর্ষে এই 'কপালমোচন তীর্থ' খুব কম করে হলেও সাতটির অস্তিত্ব আজো পাওয়া যায়। মহাদেব কর্তৃক দক্ষমুণ্ড হস্ত-মুক্ত হওয়ার জন্য একটি আর ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ —অর্থাৎ দেবগণের শক্তিহরণ-মুখ ছেদন করায় সেই মুণ্ডও শিবের হাতে আটকিয়ে যায় ও সেই ব্রহ্ম-মুণ্ড হাত থেকে মুক্ত হওয়ার দরুণ আর একটি "কপালমোচন" তীর্থের সৃষ্টি হয়। মোট এই দুটি তীর্থই প্রধান। ব্রহ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তকে "কপালমোচন তীর্থ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে

---

তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থ রাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়ঃ॥"
"পুরীং প্রবিশ্যাথ বিলোকনাশ্রয়ং জলাশয়-স্যান্তজগাম সন্নিধিং।
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়চ স্পর্শাৎ শিরোভূমিতলং জগাম॥
ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্বঃ সর্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণুমূর্তিমলোকয়ৎ॥"
"পাপাদ্ যস্মাৎ বিমুক্তোঽস্মি যস্মান্মুক্তং করাৎ শিরঃ।
কপালমোচনং নাম তস্মাদেব ভবিষ্যতি॥"
"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্টা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

১। প্রতিমা, প্রথমখণ্ড, ৩৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা ও রহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম পর্ব্ব, ১৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা।

মায়াপুরে একটি, স্কন্দপুরাণে কুরুক্ষেত্র মধ্যে একটি, প্রভাস খণ্ডে গুজরাটের অন্তর্গত প্রভাস তীর্থের মধ্যে একটি, রেবাখণ্ডে রেবা তীরে একটি এবং উৎকলখণ্ডে উড়িষ্যার মধ্যে কপালমোচন তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোন ছুটি তীর্থ প্রধান আজো স্থিরীকৃত হয়নি। বিভিন্ন পুরাণে একই তীর্থ সম্পর্কে এরূপ মতভেদ দেখে মনে হয়, পুরাণগুলি কখনই একই ব্যক্তির রচনা নয়। যদি তা' হোত, তা'হলে একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে এত মতদ্বৈধ কোনক্রমে উপস্থিত হোত না বা স্থান নির্বাচন নিয়ে গণ্ডগোলও থাকত না। বিভিন্ন প্রদেশের লোক মনে হয় বিভিন্ন পুরাণ রচনা করেছিলেন এবং তাদের দেশের মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্য নিজের দেশের দিকে তীর্থগুলিকে টানবার চেষ্টা করেছেন। আজ বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস, জয়দেব ও লাউসেন রাজার গড় নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এও সেই রকমের সমস্যা। তাই এই সমস্যার মীমাংসা করা বড় কঠিন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকালে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বন্দর এবং বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল তাতে পুরাণকাররা যে সহজে এ বন্দরকে এমন একটি বিশিষ্ট তীর্থ থেকে বঞ্চিত করবেন, তা' কোনক্রমেই মনে হয় না। এ প্রসংগে আমরা বর্গভীমা মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

ব্যাসদেব নকল শ্রীক্ষেত্র নির্মাণ করতে গিয়ে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবার সে কাহিনী সংক্ষেপে "তমলুক মঙ্গল" থেকে উদ্ধৃত করছি।

"পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্যাসদেব, দেবতাগণের ছলনায় বারাণসী পার্শ্বে তত্তুল্য দ্বিতীয় কাশীধাম করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিশোধার্থ এই ভীমাদেবীর পার্শ্বে যোজনার্দ্ধ মধ্যে স্বয়ম্ভু শিব স্থাপন করিতে পারিলে, এখানে শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে পারে, ফলে স্বয়ম্ভুদেবের

নিকট বর পাইয়া শিবলিঙ্গ লইয়া আসিতেছিলেন। এরূপ হইলে দৈব ব্যবস্থার বিঘ্ন হইবেক ভাবিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পরামর্শ পূর্ব্বক মহামায়ার আশ্রয়ে ব্যাসদেবের ভ্রম ঘটাইয়া, যাহাতে ঐ শিবলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে না তুলিতে পারেন, তজ্জন্য দেবর্ষি নারদকে কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ মহামায়ার সহায়তায় তাঁহাকে ভুলাইয়া দিক বঞ্চনা পূর্ব্বক ভীমাদেবীর পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ দিকে যোজনার্দ্ধ অন্তরে বর্তমান গো-মায়ী গ্রামে ঐ শিবলিঙ্গ উঠাইয়া ছিলেন। ঐ কারণেই গো + দিক, মায়ী + বঞ্চক অর্থে গোমায়ী নামকরণ হইয়া থাকিবে। উক্তরূপে বঞ্চিত হওয়ায় এইস্থানে জগন্নাথ ক্ষেত্র হয় না।[১]" পৃঃ—১২—১৩।

তমলুক থেকে দক্ষিণ দিকে গোমায়ী গ্রামে দক্ষিণেশ্বর শিব মন্দির আজো বর্তমান আছে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এই গোমায়ী গ্রামের সন্নিকটে মাহিষ্য রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরীর ধনাগার ও রাজধানী ছিল। কল্যাণ রায় চৌধুরী ছিলেন মহিষাদল রাজ্যের রাজা এবং তমলুক রাজ্যের সামন্ত নৃপতি। খুব সম্ভবত ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে এখানে তিনি রাজত্ব করতেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তমলুকের দক্ষিণ পার্শ্বে যে সমুদ্র ভিন্ন জনপদ ছিল না[২], একথা বহু প্রামাণ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। ভূস্তর পরীক্ষা করে ও তমলুকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এই গোমায়ী গ্রাম পূর্বে যে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। বাংলা ১২৫১ সালের মিঃ ফেণী সাহেবের সংগৃহীত ৭২০ খ্রীষ্টাব্দের সুমারী ও কর সংগ্রহের রেয়োদাদেও এর আভাস পাওয়া যায়। অতএব

১ হিন্দুস্থান ও তমালিকা ১৪—৪০ পৃঃ

২ "খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর তমলুকের দক্ষিণ-দিকবর্তী সমুদ্রগর্ভ ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মনুষ্যবাসোপযোগী হওতঃ দোর, মহিষাদল, গুমাই, অরঙ্গীনগর, জলামুঠা, নাড়ুয়ামুঠা, রসুলপুর, বালিযোড়া প্রভৃতি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।" ভগবতীচরণ প্রধান কৃত মহিষাদল রাজবংশ, পৃষ্ঠা ১৭।

গোমায়ী গ্রামের এই ব্যাস প্রতিষ্ঠিত মহাদেব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। মহাদেবের পূর্বমন্দির ভগ্ন হওয়ায় বাং ১২০৮ সালে মহিষাদলের ধর্মপ্রাণা রাণী জানকী দেবী এর স্বয়ম্ভুত্ব পরীক্ষার জন্য তলদেশ সাধ্যাতীত ভাবে খুঁড়েও কোন ঠিকানা না পেয়ে এর উপরে মন্দির নির্মাণ করে দেন। অদ্যাপি সেই মন্দিরই বর্তমান আছে।[১]

গোমায়ী গ্রামে দক্ষিণেশ্বর শিবের এক অংশ বিশেষ ভাবে কর্তিত। প্রবাদ আছে কালাপাহাড় যখন তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের কোন ক্ষতি না করতে পেরে উড়িষ্যার পথে বিজয় অভিযান চালান, তখন এই শিব মন্দিরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইতিহাস থেকে মনে হয় এই শিবলিঙ্গ ১২।১৩ শত বছরের প্রাচীন। এবং রাণী জানকীদেবী যখন খুঁড়েও এঁর তলদেশ পাননি, এর দ্বারা মনে হয় এটি কোন প্রাচীন সুবৃহৎ স্তম্ভ। কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে এই সুবৃহৎ স্তম্ভটি একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। আজ আর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেও এ সম্পর্কে কোন স্থির সত্যে উপনীত হওয়ার উপায় নাই। চিরকালই হয়ত ব্যাস-প্রতিষ্ঠিত মহাদেব বলে আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি কুড়িয়ে ও চাল কলা খেয়ে ইনি পরিপুষ্ট থাকবেন।

প্রতি বছর শিব চতুর্দশী ও সংক্রান্তির দিন এখানে বিরাট মেলা বসে। প্রতি সোমবার বহু যাত্রীর ভিড় হয়। মহাদেবের গাত্রসংলগ্ন শক্তির স্থানে সব সময়ই জল থাকে। তার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, মাঝে মাঝে শব্দযুক্ত উচ্চ বুদ্বুদও উঠে।[২] নাকি, অনেক চেষ্টা করেও এই বুদ্বুদ বন্ধ করা যায় না।

এই ঘটনা থেকে মনে হয়, গোমায়ী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের

১ তমালিকা, পৃঃ ১৪।

২ তমলুক মঙ্গল—গিরিশচন্দ্র সরস্বতী

সন্নিকটে হয়ত কোথাও কোন তেলের খনি অনাবিষ্কৃত ভাবে বর্তমান আছে। উপযুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা একান্ত আবশ্যক।

খিল হরিবংশে—হিরণ্যকশিপু বধ প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়।[১] পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ও হরিবংশে উক্ত একই শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়।[২] পদ্মপুরাণে আরো দু'জায়গায় তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বর্ণনা প্রসংগে, কিরাত, ঔড্র, বিদেহ প্রভৃতি নামের সংগে এমনিভাবে সন্নিবিষ্ট আছে—

"কিরাতা বর্ব্বরা সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তিকাঃ।
ঔড্রম্লেচ্ছাঃ সসৈরিন্ধ্রাঃ পার্ব্বতীয়াশ্চ সত্তমাঃ॥" ৫২
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্ম আদিখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

পদ্মপুরাণে আর একস্থানে ব্রহ্ম-রুদ্র ধ্যানেও তাম্রালপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। ধ্যানমন্ত্রে এমনি ভাবে লিখিত আছে—

"কাঞ্চীং কাশীং তাম্রলিপ্তাং মগধাম্মালবাং স্তথা।
বৎসগুল্মং চ গোকর্ণং তথা চৈবোত্তরান্‌কুরূন॥" ১৬৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে
ব্রহ্মরুদ্রাধ্যানাধ্যায়শ্চতুর্দ্দশঃ, পৃঃ ৭৭।

মৎস্যপুরাণেও তাম্রলিপ্তের নাম একাধিকবার পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের

---

১ "সুরাষ্ট্রশ্চ সবাহলীকাঃ শূদ্রাভীরাস্তথৈব চ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যশ্চ অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥" ৫৫
অষ্টবিংশত্যধিক—দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

২ পদ্মপুরাণম্, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়ে প্রকাশিতম্, ১১০০ পৃষ্ঠা ও শ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদেন সম্পাদিতম্ শ্রীপাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে নরসিংহ প্রাদুর্ভাবোনাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠাঃ ৩১৫।

নাম করতে গিয়ে পুরাণকার তাম্রলিপ্ত রাজ্যের নামও উল্লেখ করেছেন। যথা—

"অঙ্গা বঙ্গা মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরি।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয় মালবাঃ॥ ৪৪
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্ব-মাগধ-গোনৰ্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৫
চতুৰ্দ্দশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ[১]

শব্দকল্পদ্রুমে ঠিক উপরি উক্ত শ্লোকটির সহিত আর একটি চরণ অধিক সংযুক্ত হয়েছে। যেমন—

"ততঃ প্রবঙ্গা মাতঙ্গা মলয়া মলবৰ্ত্তকাঃ।"[৩]

মৎস্যপুরাণের অন্যত্র পাই—

"পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মাগধাঙ্গা স্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রালিপ্তাংস্তথৈব চ॥" ৫০
একবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ[২]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কূর্মকে ভগবানরূপে বিচিত্র করা হয়েছে। সেই কূর্মরূপী ভগবানের বিভিন্ন অংশে ভারতের বিভিন্ন দেশ অবস্থিত। সেই বিভিন্ন অংশ বর্ণনা প্রসংগে মার্কণ্ডেয় পুরাণকার বলেছেন—

"কশায়া মেঘলামুষ্টা স্তাম্রলিপ্তৈকপাদপাঃ।
বৰ্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূৰ্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥" ১৪
অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ[৪]।

কূর্মের পাদদেশে অর্থাৎ ভারতের শেষ তটরেখায় বঙ্গোপসাগরে তাম্রলিপ্ত অবস্থিত। ঐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতের পূর্বদিকে প্রসিদ্ধ

---

১, ২, মৎস্যপুরাণম্, বঙ্গবাসীযন্ত্রে মুদ্রিত; পৃঃ ১৫০, ১৬০।

৩ শব্দকল্পদ্রুমঃ পুনঃ প্রকাশিতঃ পৃঃ ১৬৯৯।

৪ মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, পৃঃ ১০০।

জনপদ সমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাম্রলিপ্তের নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধ গোমন্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ ॥" ৪৪

পণ্ডিত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতাতেও তাম্রলিপ্তের নাম, কোশল, গিরিব্রজ, মগধ, পুণ্ড্র, মিথিলার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—

"আপ্যোঽঙ্গ-বঙ্গ-কোশল-গিরিব্রজা মগধ-পুণ্ড্র-মিথিলাশ্চ।
উপতাপং যান্তি জনা বসন্তি যে তাম্রলিপ্ত্যাঞ্চ ॥" ১৪
শনৈশ্চর চারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।[২]

বৃহৎ সংহিতার অন্যত্র পাওয়া যায়—

"উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পোণ্ড্রোৎকল-কাশি-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ" ॥ ৭
কূর্মবিভাগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ[৩]

জ্যোতিস্তত্ত্বে আছে—

"প্রাচ্যাং মাগধশোহর্ণা চ বারেন্দ্রাগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাদয়াদ্রয়ঃ ॥"[৪]

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ৪।৫টি পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম পরিদৃষ্ট হয়। বাকি আর অন্য পুরাণগুলিতে তাম্রলিপ্তের নাম নাই। আমরা এই অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছিলাম, পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করার জন্য এবং

১ মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ, পৃঃ ৯৯।

২ বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত ; পৃঃ ৩১

৩ বৃহৎসংহিতা, ঐ পৃঃ ৪০।

৪ স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেন বিরচিত অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি, ২৯৭ পৃষ্ঠা ও শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিতঃ পৃষ্ঠা ২৪৬০।

বৌদ্ধপ্রধান স্থানগুলি হিন্দুদের ভগবানের প্রাচীন লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা নানারূপ কাল্পনিক কিংবদন্তীর সৃষ্টিও করেছিলেন। সেই কিংবদন্তী-অধ্যুষিত স্থানগুলি আজো হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে। আমার মনে হয় এই পুরাণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা খুব অল্পই আছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পুরাণগুলিতে যেরূপভাবে তাম্রলিপ্তের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকালে যে খুব সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাণে বর্গভীমা দেবীর সম্পর্কে অনেক কথা আছে, সে সব আলোচনা এই অধ্যায়ে করলাম না। বর্গভীমার মন্দিরের আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে এর সূত্রপাত করা যাবে।

---

## পঞ্চম অধ্যায়

# বৌদ্ধ যুগ

তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই যুগেই তাম্রলিপ্তের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন ভ্রমনকাহিনী পাঠ করে তাম্রলিপ্তের প্রতি অধিক কৌতূহলী হন। ভারতের পূর্ব উপকূলে কোথায় তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল তা' অনুসন্ধান করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বৌদ্ধযুগেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্রমণকারক ও ধর্মপ্রচারকগণ ভারতে আসেন এবং ভারত থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে গমন করেন। ভারতীয় নাবিকগণ শুধু শ্যাম, বালি, সিংহল, যবদ্বীপ ও চীন দেশে নয় সুদূর আমেরিকা, গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বাণিজ্য করার সংগে সংগে উপনিবেশ স্থাপনও করেছিলেন। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধপূর্ব যুগ ছিল ভারতের এক গৌরবময় যুগ। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকেই প্রমাণিত হয় খ্রীষ্ট জন্মের বহু শত বছর আগে তাম্রলিপ্তবাসিগণ দুর্দান্ত নাবিক ও রণনিপুণ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। কলম্বাসের বহুপূর্বে ভারতীয় নাবিকগণ যে আমেরিকা আবিষ্কার করে সেথায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তার প্রমাণ আজ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ৩২৬ বছর পূর্বে বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁর সেনাপতি নিয়ারকস্ যখন আসেন, তখন তিনি ইউফ্রেটিস্ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত একখানিও অর্ণবযান দেখতে পাননি। কেবল কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক জেলেডিঙ্গী ( fishing boat ) দেখেছিলেন[১]।

---

১ Vide cowell's Elphinstone's History of India, book III, ch, x. P. 183.

যখন হিপ্‌পালাস ( Hippalus ) লোহিত সাগরের মুখ থেকে বেরিগোজা ও মুসিরিস্ পর্যন্ত সোজাসুজি পার হতে সাহস করেন নি, তার বহু পূর্ব থেকেই ভারতের অর্ণবযানসকল বঙ্গোপসাগর দিয়ে, সিংহল, বর্মা, মালাক্কা ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যাতায়াত্ করত। গ্রীক, রোমান জাহাজ তখনও উল্লিখিত স্থানে যায়নি। আরবগণও মহম্মদের জন্মের পূর্বে ঐ সকল স্থানই জানতেন না।[১]

এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে পূর্ব উপকূলের নাবিকগণই একমাত্র বিদেশে ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় প্রাচীন কালে পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্ত ছিল একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর। কলিঙ্গ ছিল তখন তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত। আর এই কলিঙ্গবাসিরাই খৃঃ পূর্ব ৭৫ অব্দে যবদ্বীপে গমন করে, সেখানে একটি অব্দের প্রচলন করেন। সে অব্দ এখনো তথায় প্রচলিত আছে। এ বৃত্তান্ত জানা যায় যবদ্বীপের ইতিহাস পাঠ করলে। যবদ্বীপে যে হিন্দুদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তার বহু প্রমাণ আজও পাওয়া যায়[২]।

ভারতীয় বণিকগণ কেবলমাত্র ভারত মহাসাগরেই বাণিজ্য করে যে সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়। "কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন নাই, অথবা আরবগণ আমেরিকার সন্ধান পর্যন্ত জানিতেন না, তাহারও বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতীয় বণিককূল বাণিজ্য ব্যপদেশে আমেরিকায় গিয়া হিন্দুসভ্যতা বিস্তার ও ইন্দ্রপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্য আমেরিকায় যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদির

---

১ "Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, directly across to Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malaca, and to Sumatra. No Greek or Roman ship visited those places. No Arub settlers were found there prior to the birth of Mohamed. The earth in these quarters was unknown to them." Mookerjee's, Magazine June, 1873, P. 270.

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৭৩—৭৫।

ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকলের গঠনপ্রণালী সর্বাংশেই দক্ষিণ ভারত ও ভারতমহাসাগরীয় অনুদ্বীপস্থিত হিন্দুমন্দিরের অনুরূপ[১]। ভারতবর্ষে পাহাড় কাটিয়া যেরূপ মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে মেক্সিকোর সিৎল নামক স্থানে তদনুরূপ প্রস্তর মন্দির সকল দর্শন করিলে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুগণ সমুদ্র পরপারস্থ সেই অতি দূরবর্তী মহাদেশে যাইয়া ভাস্করবিদ্যার বিরাট নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছেন। তথায় প্রস্তরখোদিত বহুতর দেবদেবীর মূর্তিও বাহির হইয়াছে, তাহা অনেকাংশেই এ দেশীয় হিন্দু দেবদেবীর মত। দক্ষিণ আমেরিকার টিটি-কাকা হ্রদের তীরেও ভারতীয় শিল্পচাতুর্য প্রকটিত রহিয়াছে। মেক্সিকোবাসীরা গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্বে হস্তী পাওয়া যাইত না, সে দেশে কখনই এরূপ মূর্তি কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দু বণিকদিগের নিকট হইতেই তাঁহারা সিদ্ধিদাতা-গণেশমূর্তি পাইয়াছিল। এখনও কম্বোজ, শ্যাম, যব, বালি প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপসমূহে নানাবিধ গণেশমূর্তি দৃষ্ট হয়, এতদ্দারা অনুমিত হয় যে হিন্দুরা কম্বোজ বা যবদ্বীপাদি হইতে আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন।

আমেরিকায় সকল জাতি অপেক্ষা ইঙ্ক জাতিই শ্রেষ্ঠ। ইঙ্ক দিগের প্রাচীন বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, মঙ্ক নামক প্রথম ইঙ্ক"ইন্তির" আদেশে টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন। তিনিই অসভ্য জাতিগণকে সুসভ্য করিয়া ইঙ্ক রাজ্যে স্থাপন করেন। এই বংশীয় সকলেই আপনাদিগকে সূর্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।[২]

---

১ Squirel's Serpent Symled.

২ দক্ষিণ আনাম্ হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিসমূহে "ইন্দ্র" উপাধিধারী বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (De Guignes) এই 'ইন্দ্র' উপাধিকে অপভ্রংশে 'ইন্তো' বা 'ইন্তি' নামে উল্লেখ করেছেন। এরূপ স্থলে আমেরিকার 'ইন্তি' ও সংস্কৃত 'ইন্দ্র' অভিন্ন বলে মনে হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, পৃঃ ৭৫—৭৬।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক ঐতিহাসিক তাসিতাস উত্তর প্রদেশের ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। পরে তাঁর বন্ধুবর প্লিনি এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ অব্দে কতকগুলি ভারতবাসী বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে এসে বাত্যা-বিতাড়িত হয়ে জর্ম্মণ-উপকূলে পতিত হয়েছিলেন, তখন সুএবীয়রাজ তাঁদের উপহার স্বরূপ গলের প্রধান শাসনকর্তা মেটেলাসের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন ।[১]

তাসিতাসের অনুবাদক মার্কি সাহেব প্লিনির এই বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, কর্ণোলিয়া নেপোস্ ( তাসিতাস ) সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে যে বিস্তৃত বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, প্লিনি তা' সংক্ষিপ্ত ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যদি মূল গ্রন্থখানি পাওয়া যেত, তা'হলে সমুদ্র-বাণিজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস পেতাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বর্ত্তমান তমলুকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু সমূহের আলোচনা করে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারব যে সেই সুদূর অতীতকালে সত্যসত্যই তাম্রলিপ্ত-বাসিগণ এইসব দেশে গিয়ে বাণিজ্য করেছিলেন। তমলুকে এমন সব জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, যার প্রাচীন মিশর, গ্রীস, ও সুদূর আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের আবিষ্কৃত জিনিসের সাথে প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য আছে।

আমরা এখন প্রাচীন ভ্রমণকারী ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে সব জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়, তাই আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। তৎপূর্বে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ থেকে একটি শ্লোক নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন, কালিদাস রঘুব

---

১ Carnelius Nepos de Septentrionali circuitu tradit quinto Metello celeri, Lucii Afranii in consulatee collegæ, sed tum Galliæ, Procunsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii causa navigantes, tampestatibus essent in Germanian abrepit." Pliny, lib, ii. S. 67.

দিগ্বিজয় বর্ণনা করতে গিয়ে কপিশা ও সুহ্মদেশের নাম করেছেন। বলা বাহুল্য রামায়ণের কালে কালিদাস বর্ণিত স্থানসমূহ বর্তমান ছিল এমন কোন প্রমাণ আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তা'ছাড়া কালিদাস বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১] তাই আমরা রঘুবংশকে বৌদ্ধযুগের মধ্যে ধরলাম। শ্লোকটি এই—

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥ ৩৫।
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৬॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৭॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥ ৩৮॥

( চতুর্থঃ সর্গঃ )

**অর্থ :**—বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্য-দেশ-সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলা-ভূমিতে উপনীত হইলেন॥ ৩৪॥

---

১ কালিদাসের জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু মতভেদ আছে। তিনি কোন সময়ে ও কোন বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, তা স্থির করে বলা বড় শক্ত। ঐতিহাসিক ম্যাকডোনেল বলেন—"But as to the date of the most famous classical poets, Kalidasa, Subandhu, Bharabi, Gunadhya, and others, we have no historical authority." ম্যাকডোনেল সাহেবের এরূপ উক্তির কোন মানে হয় না। অন্যভাবে অনেক চেষ্টায় কালিদাসের সময় সম্পর্কে যে মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা' সংক্ষেপে এই। এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রক্ষিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে

বেগবতী প্রবাহিনীর খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছ্রিত বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু আনতকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে, তাঁহাদের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

---

দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশসমূহের যে নামাবলী ক্ষোদিত আছে, তার কতকগুলি দেশের নামের সাথে কালিদাসের রঘুবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট রঘুর বিজিত দেশসমূহের নাম হুবহু মিলে। অথচ যে মহাকাব্যের ঘটনা নিয়ে রঘুবংশ রচিত, সেই বাল্মীকি রামায়ণে রঘুরদিগ্বিজয়ের নামগন্ধও নাই। কালিদাসের কাল সম্বন্ধে চারটি মত প্রধান। (১) খৃষ্টজন্মের ৫৬ বৎসর পুর্বে (২) খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক (৩) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক (৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কতক এবং ষষ্ঠ শতকের কতক অংশ। এই চারটি মতের মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকই প্রমাণ বাহুল্যে অধিকতর বলিষ্ঠ। তাঁকে অনেকেই খৃষ্টীয় শতকের লোক বলে মনে করেন, কিন্তু বতমানে বহু গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, কালিদাস পঞ্চম শতকে জন্মগ্রহণ করে গুপ্তগণের মালবরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৮০ শতকে গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে উজ্জয়িনী জয় করেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেননি। খ্রীষ্টিয় ৪১২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি ৪ শত ৫৫ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ, অর্থাৎ চারশত তিন, চার বা পাঁচ সাত, অব্দ থেকে কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল অর্থাৎ ৪৫৫ অব্দ পর্যন্ত এবং হয়ত বা স্কন্দগুপ্তেরও রাজত্বের কিছুকাল পর্যন্ত উজ্জয়িনীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।
কালিদাস প্রশস্তি, পৃঃ ১—৩ )

তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় (রোয়া ধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর রঘু গজ-নির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গ-ভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন[১] ॥ ৩৭ ॥

৩৪ শ্লোকের 'তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলাভূমি' এই কটি শব্দের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় পূর্ব ভারতের একেবারে শেষ সীমায় সাগরের কাছে যে দেশ বা উপকণ্ঠ সেখানে এসে দিগ্বিজয়ী রঘু উপস্থিত হয়েছিলেন। তৎকালে পূর্বভারতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শতকে তাম্রলিপ্তই ছিল একমাত্র সমুদ্র উপকূলে বিখ্যাত বন্দর। এর পরের শ্লোকে উপমার দ্বারা সুহ্ম দেশীয় নরপতিদের পরাজয়ের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, সে উপমাটি এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে "উপমা কালিদাসস্য" এই প্রবাদ বাক্যকে সার্থক করেছে। দশকুমার চরিতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—"অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।" এর দ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে সুহ্মদেশেই ছিল দামলিপ্তী বা তাম্রলিপ্ত নগর। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়-দেশকে সুহ্মদেশ বলে নির্দেশ করেছেন। পাণ্ডু এই দেশ জয় করেছিলেন (মহাঃ আদিঃ অঃ ১১৩) কিন্তু বৃহৎ-সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশের মধ্যবর্তী ভূভাগকেই সুহ্ম নামে কীর্তিত করা হয়েছে। মৎস্য-পুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে কলিঙ্গ এবং সুহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দু'টি পৃথক রাজ্য

---

১ কালিদাস-গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৬ সাল, পৃঃ ৪৭—৪৯।

বলা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্বে ২৯ অধ্যায়ে এবং মৎস্য পুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্তকে দু'টি পৃথক দেশরূপে দেখা যায়। পঞ্চনদের অন্তর্গত সুহ্মনামে আর একটি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। অর্জ্জুন এই দেশ জয় করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর আত্মজ বালির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র ছিলেন, তাঁদের নাম অনুসারেই পুরাকালে পাঁচটি দেশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সব বিভিন্ন মতবাদ থেকে মনে হয় বাংলা দেশের কোন না কোন স্থান প্রাচীন কালে সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল এবং এই দেশ কখনো স্বাধীন এবং কখনো বা আশ-পাশের কয়েকটি ছোট বড় দেশ একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এবং কালিদাস-এর উক্ত শ্লোক থেকে বেশ বোঝা যায় সুহ্মে বিভিন্ন ভূখণ্ডের রাজন্যবর্গ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। পরবর্তী শ্লোক অর্থাৎ ৩৬ শ্লোকের দ্বারা বাংলার তৎকালীন নৌবহর যে কি বিরাট ও শক্তিশালী ছিল, তা' উপলব্ধি করতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ডে ২১০ ও ২১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধপটু ছিল; এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।"

আজকে আমরা বাংলা দেশ বলতে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝি তৎকালে কিন্তু বাংলা দেশ এত বৃহৎ ছিল না। প্রাসদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদাজির মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মানদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগই বঙ্গ নামে পরিচিত। মহাভারতের সময়েও বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্ত এই তিন দেশ থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দেশ ছিল। (মহাঃ সভাঃ অঃ ২৯।) প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউ এন্-স-সঙ্গ

যখন এদেশে থাকেন, তখন বঙ্গ দেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যথা (১) পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ (২) সমতট বা পূর্ববঙ্গ (৩) কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ (৪) তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ (৫) কামরূপ বা আসাম। খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হওয়ার পরে, বঙ্গদেশ চারটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। বল্লালসেনই এই বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তরদিগ্‌বর্তী ভূভাগ বারেন্দ্র এবং বঙ্গ, আর দক্ষিণদিগ্‌বর্তী ভূভাগ রাঢ় এবং এবং শাখা জলাঙ্গী নদী কর্তৃক বিভক্ত। মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী বরেন্দ্রভূমিই প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ, বঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ, ভাগীরথীর পশ্চিমদিগ্‌বর্তী রাঢ়দেশ কর্ণসুবর্ণ এবং বাগ্‌ড়ি দক্ষিণবঙ্গ-রূপে বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক নির্ণীত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ৭৩২ শতকে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, দেবীবর ঘটকের মতে ঐ সময়ে বঙ্গদেশ রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং গৌড় এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের প্রথম নির্দেশ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় ১৩শ শতকেও বঙ্গ দেশ "বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হয়।

৬২৯ শতকে হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতে এসেছিলেন। তখন বাংলা দেশে 'বঙ্গ' নামে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। এদিকে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠ শতকের কিছু অংশ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এমতাবস্থায় কালিদাস বঙ্গ বলতে যে কোন ভূভাগকে নির্দেশ করেছেন, তা' বলা বড় শক্ত। বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে। তবে একথা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নদীমাতৃক বাংলা দেশের যে অঞ্চলকে কালিদাস "বঙ্গ" বলে অভিহিত করেছেন, সে বঙ্গদেশ ছিল সমুদ্রের সন্নিকটে। কেন না রঘু গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। নদীর মোহনা ছাড়া দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয় না ইহাই ভৌগোলিক সত্য।

এদিকে যে বিরাট নৌবহরের কথা কালিদাস বলেছেন, তা প্রাচীন বাংলা দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে তাম্রলিপ্ত, সমতট, রাজমহল, সপ্তগ্রাম, ভূরীশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রকেতুগড়, পাণ্ডুয়া এবং কমলাঙ্কে ( কুমিল্লা ) ছিল। তাম্রলিপ্ত আর সমতট ( বাগেরহাট ) থেকেই একমাত্র সমুদ্রগামী জাহাজ সকল যাতায়াত করত। এরদ্বারা মনে হয় কালিদাস সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত কোন ভূভাগকেই বঙ্গদেশ বলে অভিহিত করেছেন।

এবার ৩৭ শ্লোক নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এই শ্লোকটি এমনভাবে লিখিত হয়েছে যে কালিদাসকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞ বলে প্রমাণিত করেছে। কালিদাসের কাব্যরাজিতে এমন কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় তিনি বোধহয় বাঙালী ছিলেন.। কোন কোন দুঃসাহসিক ঐতিহাসিক কালিদাসকে বাঙালী বলে অভিহিত করতেও ভয় পাননি। এ সম্পর্কে কিছু মতামত দেওয়ার পূর্বে শ্লোকটি তর্জমা করে দেখি আসুন। "উৎখাত-প্রতিরোপিত।" সোজা কথায় তুলে আবার লাগান। বাংলা দেশে যাকে রোয়া চাষ বলে এ হোল তাই। ঘন ভাবে তলা ফেলে যখন সেই চারা বড় হয়, তখন আবার তাকে তুলে নিয়ে ৩।৪টি চারা এক সংগে যুক্ত করে 'গোছ' অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে লাগানকে রোয়া বলে। কিছুদিন পরে, ধানের ভরে গাছগুলি একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বঙ্গের এই প্রধান এবং নিজস্ব বস্তুর সাথে দর্শনপটু কবি, পরাজিত, এবং বশ্যতা স্বীকার করায় পুনরায় রঘু কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রতিরোপিত নৃপতিদিগের তুলনা করেছেন। এ তুলনা যে কত সুন্দর, কত হৃদয়গ্রাহী ও যথার্থ হয়েছে তা' বলে বুঝান বড় কষ্টকর। কবি একথা মনে রেখেছেন, তিনি রঘুকে নিয়ে এসেছেন বাংলা দেশে, যে দেশ হোল কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ। তাই তিনি এই বাংলাদেশের অতি পরিচিত বস্তু নিয়েই উপমা আহরণ করেছেন। এ একমাত্র প্রতিভাবান কবি ছাড়া তাই বা

বলি কেন কালিদাস ছাড়া সম্ভব নয়। সাধারণ পাঠক যদি ভাবেন এমন একটি জিনিসের সাথে আবাল্য পরিচিত না থাকলে কখনো সাহিত্যে প্রয়োগ সম্ভব নয়, তা'হল সে অনুমান ভুল হবে বলে মনে হয় না। "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস" লেখক ধনঞ্জয় দাস মজুমদার মহাশয় তাঁর প্রণীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডে পৃঃ ৭৪—৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"অনেক পণ্ডিতের মতে মহাকবি কালিদাস বাঙালী ছিলেন, কারণ কালিদাস নাম একমাত্র বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল বা আছে। তাহার রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা—

"দূরদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমাল তালিবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥"

এতদ্বারা সততঃই মনে হয় যে, কালিদাস খেজুরী থানার খেজুরী ডাক-বাংলার কাছে গঙ্গার সন্নিবিষ্ট শ্যামল, তমাল ও তাল, নারিকেল তরুগণের সবুজ শোভায় নীলাকাশের নীচে বসিয়া শরৎকালের স্বচ্ছ-নীল-লবণাম্বুর ঢেউ দেখিতে দেখিতে এই পদ্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কালিদাসের সময়—তাম্রলিপ্তে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াই ইহা লিখিয়াছিলেন। এইরূপ দৃশ্য ভারতের আর কোথাও নাই এবং এই দৃশ্য না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না।"

এই দুঃসাহসী ঐতিহাসিককে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না। অনেক পণ্ডিত নাকি কালিদাস বাঙালী বলে মনে করেন। লেখক সেই সব পণ্ডিতদের এক জনেরও নাম উল্লেখ করেন নি বা তাঁদের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আলোচনারও সূত্রপাত করেননি। এরূপ একটি নতুন তথ্য পরিবেশন করতে হলে যেরূপ প্রমাণ ও তথ্যের প্রয়োজন তার একটিও লেখক দেননি। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন কালিদাস চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক। অথচ যে খেজুরী থানার ডাক বাংলার কাছে বসে তিনি রঘুবংশ লিখেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা' মাত্র ১৫৫৩

খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছে। তখনো মনুষ্যবাসের কোন চিহ্নই সেখানে নেই। লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, তা'হলে কালিদাস মাত্র চারশত কি সাড়ে চারশত বছর আগে বর্তমান ছিলেন বলে মনে করতে হয়। 'খেজুরী যে অত্যাধুনিক স্থান তা ডিব্যারার মানচিত্র দেখলেই স্পষ্টই বোঝা যাবে। ডিব্যারো মানচিত্রে (১৫৫৩) বর্তমান কস্‌বা-হিজলী পরগণা স্থানে একটি দ্বীপ উৎপন্ন হচ্ছে ইহাই সূচিত হয়েছে। ব্লেভের মানচিত্রেও (১৬৬০) হিজলী দ্বীপাকারে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। ভ্যাণ্ডেন্‌ব্রুক্ (প্রায় ১৬৬০) ও বৌরির (১৭৮৭) মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপরূপে চিহ্নিত আছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের জর্জ হিরোণের মানচিত্রেও এই দুটি দ্বীপ স্পষ্টই বর্তমান দেখা যায়। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকের মানচিত্রে এই দু'টি দ্বীপ অঙ্কিত আছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হুইট্‌চার্চের এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বোল্টের মানচিত্রে এই দু'টি দ্বীপের অবস্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুদ্র নদী দ্বারা এই দ্বীপ দুটি স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত "হিজলীর মসনদ্—ই—আলা"র দ্বিতীয় সংস্করণ-এর ২৭—২৮ পৃঃ পাঠ করে দেখতে অনুরোধ করি।

লেখক শেষে তাম্রলিপ্ত কালিদাসের রঘুবংশের পটভূমি বলে যে অনুমান করেছেন, সে সম্পর্কেও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে তাম্রলিপ্তে কালিক নামে একজন খুব বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের। ষোড়শ স্থবিরের মধ্যে কালিক ছিলেন একজন। এঁর সম্বন্ধে যথাস্থানে সময়ে আলোচনা করা হবে।

কালিদাসকে বাঙালী বলে গ্রহণ করতে হলে যে সব প্রমাণের প্রয়োজন, তা' যতদিন আবিষ্কৃত না হচ্ছে, ততদিন জোর দিয়ে কিছু বলা মানে দুঃসাহসী করা। কবি হলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ।

বাংলা দেশের পরিচিত কিছু দেখলেই যদি বাঙালী হয়ে যান তা'হলে "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও "পদ্মা নদীর মাঝি" পড়ে মাণিক বন্দ্যোধ্যায়কে আমরা কি মনে করব? মহাকবি কালিদাসের জীবনী আজো সাধারণের কাছে অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। তাই এ সম্পর্কে কোন কিছু মতামত ব্যক্ত করা আমার মত নগণ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৮ শ্লোকে কপিশা নদীর নাম পাওয়া যায়। এই কপিশা নদীর উপরে গজ-নির্মিত সেতু প্রস্তুত করে তার উপর দিয়ে তিনি উৎকল দেশে উপনীত হয়েছিলেন। এই কপিশা নদী নিয়েও পণ্ডিতদের নানা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্তমান সুবর্ণরেখা নদীর প্রাচীন নাম ছিল কপিশা। কিন্তু মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী বর্তমান কাঁসাই নদীকেও অনেকে 'কপিশা' বলে থাকেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও এই কথা বলা হয়েছে! এক সময়ে গান্ধার (কান্দাহার) রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 'কপিশা' কিন্তু সে কপিশার সাথে আমাদের বর্তমান কপিশার কোন সম্বন্ধ নাই। (N. L. D)

রঘুবংশের উক্ত শ্লোকগুলি নিয়ে আমরা যে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম, এখানে এরূপ আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ উক্ত শ্লোকগুলির কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম সংযুক্ত নাই। তবে রঘুরাজ যে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না কালিদাসের বর্ণনানুযায়ী তাম্রলিপ্তের একদিকে গঙ্গা, একদিকে সমুদ্র ও আর দিকে কপিশা নদী পারেই উৎকল ও কলিঙ্গ দেশ। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয় তৎকালে উৎকল ও কলিঙ্গ নামে দু'টি পৃথক দেশ বর্তমান ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান তথাগত বুদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর আর্যাবর্তের বিভিন্ন স্থানে ৪৫ বছর ধরে করেছিলেন তাঁর সৎধর্ম প্রচার। তারপর খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৮৩ অব্দে আশী বৎসর বয়সে

কুশী নগরে পাবা নামক স্থানে দু'টি শাল বৃক্ষের মাঝে হিরণ্যবতী নদীর তীরে লাভ করেন মহাপরিনির্বাণ। বুদ্ধদেবের নির্বাণের তারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি ৮১ বছর বয়সে উক্ত স্থানে ৪৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমাধিস্থ হন।

যখন তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন, তখন ইন্দ্রকে ডেকে বললেন, "আজ বিজয় লঙ্কা দ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।" (বাংলার গৌরব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৩, আশ্বিন, বঙ্গ প্রসঙ্গ থেকে)।

এই বিজয় সিংহ ছিলেন বাংলা দেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে সিংহবাহু সিংহপুরে রাজত্ব করতেন। সিংহপুর বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার অধীন সিঙ্গুর নামক সহর। (হুগলী জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৫৯)

এই সিংহবাহুর "বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেলো"। রাজা সাত শ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্র যাত্রা করিল। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারী দ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরার্ক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকা চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল।" (প্রাচীন বাংলার গৌরব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গ-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১২০-১২১)

এরপর শাস্ত্রী মশায় মন্তব্য করেছেন—"সাতশ লোক যে নৌকায় যায় সেত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, স্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটি ত এখনো আছে. তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত চৌদ্দ শ' বৎসর হইয়া গিয়াছে।···তাম্রলিপ্তি বা বাংলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শোনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার 'নাবধ্যক্ষ' থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রযানেরও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।" (ঐ, পৃঃ ১২১-১২২)

দশকুমার চরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হয়েছে। এই দশকুমার চরিতে তাম্রলিপ্তি নগরীর বিবরণ আছে তা' আমরা পূর্বেই দু'এক জায়গায় বলেছি। সেখান থেকে অনেক পোত বঙ্গসাগরে পাড়ি দিত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি থেকে এক বিরাট পোতে চড়ে দূর সমুদ্রে যাচ্ছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁর পোতকে ডুবিয়ে দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়ে ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূপ ছিল।

## ॥ অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও তাম্রলিপ্ত ॥

মহামতি ধর্মাশোক পূর্ব জীবনে চণ্ডাশোক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ভীষণ দুর্দান্ত ছিলেন। পিতার জীবিত-কালে তিনি পাঞ্জাবের প্রান্তদেশে এক দুর্দান্ত অধিবাসীদের নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেন। এবং পিতার কাছ থেকে জোরপূর্বক সিংহাসন অধিকার করে নেন। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের চার বছর পরে খৃঃ পূঃ ৩১৯-২০ অব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়।

সিংহাসনে আরোহণের ত্রয়োদশ কি অভিষেকের নবমবর্ষে তিনি কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেন। এই প্রদেশ তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ-রাজ বড় সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। মেগাস্থিনিস্ বলেন, তাঁর ৬০,০০০ হাজার পদাতিক, ১ হাজার অশ্বারোহী, ৭ শত রণহস্তী ছিল। এই যুদ্ধনিপুণ রাজাকে পরাজিত করতে অশোক বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। কলিঙ্গবাসীগণ দুর্দান্ত বীর ও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করে তবেই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী ও এক লক্ষ সৈন্য নিহত এবং বহু সৈন্য অনাহার ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ভীষণ দৃশ্যে অশোকের বিবেকে নিদারুণ আঘাত লাগে এবং তাঁর হৃদয়ে অনুশোচনা, মর্মান্তিক দুঃখ ও মনস্তাপের ভীষণ অগ্নি জ্বলে উঠে। তখন তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্র—শ্মশানক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন এমন লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে একমাত্র রাজ্যলোভে আর কখনো প্রবৃত্ত হবেন না। কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রেই চণ্ডাশোক ধর্মাশোক লাভের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন।

যে কলিঙ্গবাসীগণ দুর্দান্ত অশোককে ধর্মপথে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ী ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যে। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর প্রণীত বৃহৎ বঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডের এগার শত পৃষ্ঠায়

এ সম্পর্কে বলেছেন—"অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন—সেই কলিঙ্গের সৈন্যগণ বোধ হয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইঁহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন।" হিউয়েন সাঙ্গ বলেন তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকের অনুশাসন স্তম্ভ দেখেছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অনুশোচনা দুর্দান্ত কলিঙ্গবাসী-দিগকে কতকটা নিরস্ত করেছিল।

দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের এই অনুমানের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী দেশ সমূহকে তৎকালে "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ" বলিত। প্লিনি লিখেছেন—"গঙ্গানদীর শেষ ভাগ 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।** গঙ্গারিডির প্রধান নগর 'গঙ্গে' ভারতের প্রধান বন্দর ছিল।" 'পিরিপ্লাস ইরিথ্রিমেরি' নামক [ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত ] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে—"গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি হইত।" খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ভৌগোলিক টলেমি বলেন—"গঙ্গার মোহনা সমূহের সমীপবর্তী প্রদেশে 'গঙ্গারিডি'গণ বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা গঙ্গে নগরে বাস করেন।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হয়, গঙ্গারিডি তৎকালে তাম্রলিপ্ত প্রদেশবাসীকেই বোঝাত। আর এই তাম্রলিপ্তবাসীগণ যে তৎকালে খুব বীর ছিলেন তারও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। গঙ্গারিডি বীরগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম সম্রাটের নিকট বীরত্ব প্রদর্শন করে জগতকে বিস্মিত করেছিলেন। মহাকবি ভার্জ্জিল ( জার্জ্জিকস্ কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায় ) লিখেছেন। যার বাংলা তর্জমা হোল—"তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্ম্মর প্রস্তরের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন এবং মন্দিরের দ্বার ফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্ত দ্বারা গঙ্গারিডিগণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।"

মহাকবি ভার্জিল যে গঙ্গারিডিগণের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় এমন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই প্রাচীন গঙ্গারিডিগণের বংশধরগণ আজো এইসব অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শক্তিশালী জাতি বলে পরিগণিত হয়ে আসছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসিগণ যে অপূর্ব বীরত্ব, শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা' দেখে মনে হয় এই জাতির পূর্বপুরুষগণের বীরত্ব সত্যই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ছিল। সম্প্রতি একটি প্রাচীন বংশের বংশাবলী সহ ইতিহাস উদ্ধার করেছি। তাতে যে অপূর্ব বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তা' যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করব।

অশোক তাঁর কলিঙ্গ বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ কলিঙ্গদেশের প্রান্ত সীমা তাম্রলিপ্ত নগরীতে স্থাপন করেছিলেন। যে স্তম্ভ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্গ দেখে গিয়েছিলেন, তার কোন অস্তিত্ব আজ আর বর্তমান নেই। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হিউয়েন-সাঙ্গের ভ্রমণ বৃতান্ত প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হবে।

বৌদ্ধগ্রন্থ "মহাবংশ" পাঠ করে জানা যায়, "খ্রীষ্ট জন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্বে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র কূলবর্তী একটি বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল[১]।"

সম্রাট অশোক নিজে একবার তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন। "সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থের একটি গল্পে দেখিতেছি সম্রাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য নিজে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত আসিয়া সেই বন্দরে তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গয়া হইতে স্থলপথে বিন্ধ্যপর্বত (ছোট নাগপুরের

১। মহাবংশ, ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষ ৬৮৯ পৃষ্ঠা।

পাহাড় ) অতিক্রম করিয়া আসিতে তাঁহার ঠিক সাতদিন লাগিয়াছিল।' বাংলার ইতিহাস, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৬৯।

মহারাজ ধর্মাশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য যে দূত পাঠিয়ে ছিলেন, তাঁরা এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসে জাহাজে আরোহণ করে ছিলেন।[২]

অশোকের রাজত্বকালে যখন চতুর্দিকে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হোচ্ছিল, সেই সময় অশোকের ভ্রাতা বা পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলের রাজা তিষ্যের অনুরোধে ২৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সিংহল দ্বীপে গমন কবে ছিলেন। তখন ভারতবর্ষ থেকে সিংহল, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে যেতে হোলে তাম্রলিপ্ত একমাত্র বন্দর ছিল। অশোক পুত্র মহেন্দ্র ও বিস্তর ভিক্ষুবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে ঐ বন্দর থেকেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন। ( Pilgrimage of Ea-Hian, Ch. XXVIII. P 53 )

"ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ( Archipelago ) যবনগণ যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট প্রথম শতাব্দীতে তমলুক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেন।" ( Hunter's Orissa, Vol. I. P. 310 ).

## বুদ্ধদন্ত ও তাম্রলিপ্ত

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তমলুক দিয়ে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্তখণ্ড সিংহলে প্রেরিত হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠা বংশ পাঠ করে এ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় দন্তপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—"বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের একটি নগর। বৌদ্ধাধিকারের প্রাধান্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পূর্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। কলিঙ্গরাজ

২। Pilgrimage of Fa-Hian, ch. XXXVII, P. 331. and Lethleridge's History of India.

ব্রহ্মদত্তের সময় এই স্থানে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত ও তদুপরি মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম "দন্তপুর" বা "দন্তপুরী" হয়।

ক্ষেম নামে বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটি দন্ত সংগ্রহ করেন। তিনি এই দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্মাণ করান, দহগোব নির্মাণ করান নাই। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে গুহশিব নামে এক রাজা হন। গুহশিব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির পূজক ছিলেন। একদিন রাজধানী দন্তপুরে দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটালপুত্ররাজ পাণ্ডুরাজকে জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডুরাজ জনৈক অধীন নৃপতি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত চৈতন্য নামক জনৈক সামন্ত নৃপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। চৈতন্য দন্তপুরে গিয়া দন্তমন্দিরাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। কিন্তু পাণ্ডুরাজের আদেশ অমান্য না করিয়া যুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দন্তপুর হইতে দন্তটিও লইয়া পাটলিপুত্রে উপনীত হন।

বুদ্ধদন্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। পাণ্ডুরাজ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের সর্বব্যাপৃতত্ত্ব ও অসংখ্য অবতারত্বের কথা বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। পাণ্ডুও বৌদ্ধ হইলেন। পাণ্ডু কলিঙ্গ রাজ গুহশিবকে স্বরাজ্যে আটক করিয়া রাখিয়া দন্তের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহশিব দন্ত লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে একরাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র একে একে রাজা হইয়া গুহশিবকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহশিব বিপদ বুঝিয়া জামাতাকে বলেন যে যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দন্ত লইয়া সিংহলে যাইও। ঘটনা তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়। রাজপুত্র দন্তকুমার সস্ত্রীক দন্ত লইয়া সিংহল যাইবার উদ্দেশ্যে তামলিত্তি ( তাম্রলিপ্তি ) নগরে উপনীত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন করেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে দন্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। ফা-হিয়েন যখন খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, তখন পুরীই একটি বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার জন্য এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দন্তকুমার তাহা না করিয়া সিংহলে যাইবার জন্য যখন তমোলুকে গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহারই কোন নিকটবর্তী স্থানে দন্তপুর[১] ছিল।" ( বিশ্বকোষ ৮ম ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৪ )

১। দন্তপুর সম্পর্কে আমি আমার লেখা "মেদিনীপুরে বৌদ্ধধর্ম" পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। দাঁতনই যে দন্তপুর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দাঁতন অঞ্চলে অনুসন্ধান করার নিমিত্ত ১৩৫৯ সালের ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে ১৫।২০ দিন থেকে বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করি এবং কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিও পাল যুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই। এই সব নিদর্শন স্পষ্টই প্রমাণিত করে যে দাঁতন অতি প্রাচীন স্থান। দাঁতন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। "দন্তপুর প্রত্নতত্ত্ব শালার প্রতিষ্ঠাতা" ৺ললিতমোহন সামন্ত মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার করে আশপাশের গ্রাম থেকে প্রাচীন মূর্তি ও নানা ঐতিহাসিক জিনিসের ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোগলমারী কাকরাজিৎ গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, বরুণ মূর্তি ও মোহনপুর দাতুনিয়া গ্রামে বুদ্ধমূর্তি। আর অখণ্ড দু'টী ছোট বড় বৌদ্ধযুগের পানপাত্র, একটি ভগ্ন শিলালিপি। যতদূর মনে হয় প্রাচীন কুণিক লিপির অনুকরণে লেখা।

দাঁতনে কয়েকটি বড় বড় দীঘি আছে। তাতে ডুবে ডুবে অনুসন্ধান করেও কয়েকটি মূর্তিসহ বুদ্ধযুগের পানপাত্র একটি পাই। বীরবর রাজা সুরেশচন্দ্র রায় সাহিত্যবিনোদ মহাশয়ের পুরাতন গড়ে দু'টি পাল যুগের সুন্দর মূর্তি দেখে ছিলাম। একটি জৈন গুরু মহাবীরের। মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন আর তার চার পাশে ১২জন ১২জন ২৪জন তীর্থঙ্করের মূর্তি অতি সুন্দরভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ২২" ইঞ্চি ও প্রস্থে প্রায় ১২" ইঞ্চি। শিয়রে মাথার কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দু'টি পরী মালা হাতে নিয়ে। শিল্পী যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মহাবীরের ধ্যানযোগীর ভাবকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে নিখুঁতভাবে চেষ্টা করেছেন।

বুদ্ধমূর্তিটি আকারে একটু বড়। উচ্চতায় ২৪" ইঞ্চির কাছাকাছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্তিটি অক্ষত অবস্থায় নাই। দক্ষিণ পার্শ্বের কিছু অংশ ভগ্ন। মূর্তিটি দেখতে অতি সুন্দর। নাসিকাগ্রে অর্ধনিমিলিত নয়নের দৃষ্টি। সমগ্র মুখমণ্ডলে নিহিত স্থির, শান্ত সমাহিত ধ্যানযোগীর আলোকসত্ব ভাব। অঙ্গসৌষ্ঠবতা এবং প্রতনুকোমলতার প্রাচুর্যে স্নাত অবয়বসমূহ—এসকলই শিল্পীর শিল্পসাধনার চূড়ান্ত সার্থকতার পরিচয় দেয়। মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত এবং সমসাময়িক সারনাথ শিল্পরীতির বুদ্ধমূর্তির সাথে এর সাদৃশ্য অতি নিবিড়। মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন সারনাথ অঞ্চল থেকেই আনা হয়েছে। বাংলা দেশে সবচেয়ে প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে রাজসাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে। বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির সাথে এর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে। সেটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তবে এর চেয়ে আরো বেশী ভগ্ন—হাটুর কাছ থেকে একেবারে নেই। মূর্তিটির দু'পাশে দু'জন শিষ্য দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করছেন। এই দু'জন শিষ্য খুব সম্ভবত এপুশ ও ভল্লিক। মূর্তিটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

এছাড়া আরও একটি ভগ্ন বুদ্ধের মাথা আবিষ্কার করি জয়পুরা পল্লীতে। এ মূর্তিটির গলার কাছ থেকে একেবারে নাই। মাথার মুকুটের খানিকটা অংশ ভগ্ন এবং নাসিকার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন। মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

বিশ্বকোষ প্রণেতা তমলুকের কাছেই দন্তপুর ছিল বলে অনুমান করে

ছিলেন। কানিংহাম সাহেব, রোমক পণ্ডিত প্লিনীর ভারতীয় স্থান সকলের নির্দেশকালে বলেছেন, প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য কলিঙ্গ অন্তরীপ থেকে দন্তপুর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ কলিঙ্গ অন্তরীপ বর্তমান কলিঙ্গ পত্তনের কাছে এবং দন্তপুর নগর প্লিনীর মতে গঙ্গার মোহনা থেকে ৫৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান রাজমাহেন্দ্রী নগরের দূরত্ব গঙ্গার মোহনা থেকে প্রায় ঐ রকম দূরে অবস্থিত। এই কারণে কানিংহাম সাহেবের মতে রাজমাহেন্দ্রীই প্লিনীর কথিত দন্তপুর নগর। তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন যে, বর্তমান করিঙ্গপত্তন থেকে রাজমাহেন্দ্রী বা প্রাচীন দন্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। ( Ancient Geography of India P. 518 )।

আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে—কলিঙ্গ নগরীতে প্রথম বুদ্ধদন্ত স্থাপিত হয়েছিল। তৎপরে পিপলির নিকটে একস্থানে মন্দির নির্মাণ করে তন্মধ্যে দন্তটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দন্তপুর নগর। ( Antiquities of Orissa, Vol. 11 P. 106-107)

দাঠা বংশের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহলে প্রেরিত হয়েছিল। সে সময় পুরীও একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। একথা ফা-হিয়েন নিজেই বলেছেন। পুরী যদি দন্তপুর হোত, তবে শিবগুহের জামাতা পুরী থেকেই পোতারোহণ করে সিংহলে গমন করতে পারতেন। তাঁকে বহু দূরবর্তী তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসতে হোত না। রাজমাহেন্দ্রী থেকে সিংহল যাত্রা করতে গেলেও তাম্রলিপ্ত অপেক্ষা পুরী বন্দরই অনেক নিকটবর্তী ছিল। দাঁতন থেকে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব মাত্র ৫০।৬০ মাইল। কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় ৩০০ মাইল। রাজমাহেন্দ্রী আরও অনেক দূরে অবস্থিত। তখনকার দিনে আজকের মত এত দ্রুতগামী যানবাহনও ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্য যে ছিল তা' কাহিনী থেকেই পাওয়া যায়। তাই পুরী থেকে বা রাজমাহেন্দ্রী থেকে আসতে হলে পথ যে কোনমতেই নিরাপদ ছিলনা একথা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং সময়ও অনেক ব্যয়িত হোত। বন-জঙ্গল ও দস্যু তস্করের কথা ছেড়ে দিলেও বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু ব্রাহ্মণগণের হাত থেকে তিনি কোন মতেই রেহাই পেতেন না। এতসব বিপদের ঝুঁকি :মাথায় না নিয়ে তিনি

দাতবংশে এই ঘটনাটি নিম্নরূপ আছে। শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে "ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অংসখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদন্ত পাইবার আশায় যুদ্ধযাত্রা করিলে দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ আপনাকে বলহীন ভাবিয়া বুদ্ধদন্ত গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তী রাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার (হেমকলা ?) সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া 'দেবানম্ পিয়' তিষ্য নির্মিত ধর্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান একদা সিংহল দ্বীপে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব 'দালাদপিঙ্কয়া' দর্শন করিয়াছিলেন।[২]"

এই বুদ্ধদন্ত সিংহলে ব্যাণ্ডির দন্তমন্দিরে নিয়মিত পূজিত হচ্ছে।

## ॥ ফা-হিয়ান ॥
## Fa-Hian

বুদ্ধদেবের অনেক আগে থেকেই মহাচীনের সাথে ভারতের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা

---

অতি সহজে পুরী দিয়েই চলে যেতে পারতেন সিংহলে। আমরা পূর্বেই বলেছি দাঁতন অতি প্রাচীন স্থান এবং সেখান থেকে বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপ্ত বন্দরও দাঁতনের কাছে। এমতাবস্থায় দাঁতনই যে প্রাচীন দন্তপুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দাঁতনের নিকটবর্তী শতদোলা ও মোগলমারী গ্রামে রাজঘাট রাস্তা নির্মাণের সময়ে অনেক সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সকল ইষ্টক ও প্রস্থরাদি দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এখানে একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল।

২। দাত বংশ, পঞ্চম অধ্যায় ও জ্ঞানাঙ্কুর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯-৪৩০।

করব। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর চীন থেকে অনেক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন জ্ঞানলাভ করার জন্য। ভারত তখন শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও ধর্ম-কর্মে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের সুশীতল ছায়ায় অর্দ্ধেক পৃথিবীবাসী করেছিল আশ্রয় গ্রহণ। যে সমস্ত বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের সকলের ভ্রমণকাহিনী আজ আর পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে চিটাওয়ান ( chi-tao-an ) নামে যিনি এসেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাঁর অমূল্য ভ্রমণকাহিনীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্তের খ্যাতি পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান আর্যাবর্ত্ত ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ৩৯৯ থেকে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪।১৫ বছর ভারতে অবস্থান করে ছিলেন। অতএব ভারতের অনেক কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বিভিন্ন দিক দিয়ে ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মূল্য তাই অনেক। তিনি ভারতবর্ষ ও মধ্য-এসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্যটন করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ও তৎকালীন ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। তাঁর এই ১৪।১৫ বছর ভ্রমণ কালের মধ্যে পুরো দু'বছর কেটেছিল তাম্রলিপ্তে। এই দু'বছর তিনি তাম্রলিপ্ত নগরীর বিভিন্ন বৌদ্ধমঠে অবস্থান করে বহু মূল্যবান বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে ছিলেন এবং বৌদ্ধ দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি অঙ্কন করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই পোতারোহণে তিনি সিংহল দ্বীপে গমন করে ছিলেন। সেখানেও কাটিয়ে ছিলেন পুরো দু'টি বছর। সিংহলে ফান্ ভাষাতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথির নকল অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে করেন। তিষ্য নির্মিত ধর্মমন্দিরে বুদ্ধদন্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জাভা দিয়ে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তন করেন।[১] ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত নগরীতে মোট ২৪টি সংঘারাম ( বৌদ্ধ আশ্রম ) ও বহু বৌদ্ধাচার্য সন্দর্শন করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাম্রলিপ্ত তখন শুধু ব্যবসা বাণিজ্য আর জাহাজ নির্মাণের জন্যই নয়, বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তা'না হলে ফা-হিয়ানের মত পণ্ডিত মানুষ দু'বছর থেকে কেনই বা বিদ্যাশিক্ষা করে ছিলেন। কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ তখন তাম্রলিপ্তে বাস করতেন, সে সম্পর্কে তিনি যদিও কিছু স্পষ্ট লিখে যাননি, তবুও যখন বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কন করে ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাযান ও হীনযান এই দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ তাম্রলিপ্তে বাস করতেন। এবং বজ্রযানি সম্প্রদায়ও কিছু কিছু ছিল বলে অনুমিত হয়। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মহাযান দার্শানক ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত। এছু'টি পন্থের ভিতর নানারকম প্রভেদ আছে। হীনযানে নিজের মুক্তিই লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশুপক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপব নিজের মুক্তি। বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও একমাত্র উৎপত্তিস্থল শূন্য। এই শূন্যকে বজ্রযানে "বজ্র" আখ্যা দেওয়া হয়। তার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব।[২]

ফা-হিয়েন যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তিনি পাটলিপুত্র সহরে মহারাজ অশোকের প্রাসাদ বর্তমান দেখে ছিলেন। দারুময়

---

১। Elphinstone's History of India, Appendix IX. (Cowell's Edition) P. 288

২। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এসম্পর্কে যদি বিস্তৃতভাবে কিছু জানতে চান, তা'হলে বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের "বৌদ্ধদের দেবদেবী" পুস্তক পাঠ করলে অনেকখানি পরিতৃপ্ত হবেন।

এই প্রাসাদ দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং এরি সন্নিকটে হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের ছ-সাতশো সন্ন্যাসীকেও বিভিন্ন মঠে বাস করতে দেখে ছিলেন। এর দ্বারা মনে হয়, তখন তাম্রলিপ্তেও এই দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বাস করতেন। বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্য থেকেই বৌদ্ধ মূর্তির ও বৌদ্ধ দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছিল। তাম্রলিপ্তে মূর্তিপূজার প্রচলন যদি না হয়ে থাকে, তা'হলে বৌদ্ধগ্রন্থাগার গুলিতেই বা এই সব দেব-দেবীর মূর্তি সংগৃহীত হবে কোথা থেকে।

ফা-হিয়ানের ভারত ত্যাগের এক শতাব্দী পরে হোই-সেং ( Hoei-Seng ) ও সং-উন ( Song-Yun ) নামক দু'জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতের উত্তরে ভ্রমণ করতে আসেন, কিন্তু তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তের কোন নাম পাওয়া যায়নি।

## ॥ আচার্য বোধিধর্ম ॥

তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই বৌদ্ধগুরু আচার্য বোধিধর্ম কাণ্টন যাত্রা করেছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক নন। ভারত থেকেই বিদেশে গিয়েছিলেন তথাগতের বাণী প্রচার করতে। এই আচার্য বোধিধর্ম প্রসংগ বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগের ৪১১ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

আচার্য বোধিধর্ম—খ্রীষ্টীয় ৫২৬ অব্দে আচার্য বোধিধর্ম তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টনযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন সম্রাটের সভায় আহুত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্মের 'কাষায়' ও "ভিক্ষাপাত্র" জাপানের 'ইকরুণ' মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এদেশ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ দু'খানি জাপানের 'সিঙ্গোন' বা তান্ত্রিকগণ যে সকল

স্তব কবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করিয়া থাকেন, সে সমুদয় পূর্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

আচার্য বোধিধর্ম খুব সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। জাপানে 'ইকরুণ' মঠে আজো বোধিধর্মের উক্ত দু'খানি পুস্তক সযত্নে সংরক্ষিত আছে। জাপান যাত্রী দু'একজন ভ্রমণকারীর ডায়েরী থেকে এতথ্য জানা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে এই পুস্তকের প্রতিলিপি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, প্রাচীন বাংলা হরপের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা কালে এই দুটি গ্রন্থের লিপি কৌশল বিশেষ মূল্যবানরূপে গৃহীত হবে বলে আশা করি। ১৩৬৯ বছর পূর্বে বাংলা ভাষা ও তার লিখন প্রণালী কিরূপ উন্নত ছিল এতথ্য নিঃসংশয়ে আবিষ্কৃত হবে। চর্যাপদের ভাষা যদি হাজার বছরের পুরানো বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন, তা'হলে সে অনুমান যাচাই করে নিতে পারা যাবে "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" তন্ত্রগ্রন্থ থেকে। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের থেকেও প্রাচীন বঙ্গাক্ষর-এর পরিচয় বহন করছে এই দু'টি পুস্তক। চর্যাপদও তান্ত্রিক গ্রন্থ আর "প্রজ্ঞাপারমিত-হৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" এ দু'টি গ্রন্থও তন্ত্র সম্বন্ধীয়। তাই বলছিলাম, যদি এ দু'টি গ্রন্থের প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তা'হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সন্ধান পাওয়া যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাপদ থেকেও এ দু'টি গ্রন্থ আরো প্রাচীন। না জানি কোন অজ্ঞাত কবি ও তাঁদের পরিচয় এই দু'টি গ্রন্থে হয়ত বা লিপিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধিৎসু গবেষক পণ্ডিতবৃন্দের কাছে এ দু'টি এক মহামূল্যবান বস্তু আর বাঙালীর কাছে এ এক পরম বিস্ময়।

## ॥ পরিব্রাজক হিউয়ান-চোয়াং ॥

[ Hiouen Thsang ]

বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়ান-চোয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন ভারতের রাজতক্তে মহর্ষি হর্ষবর্ধন ছিলেন আসীন। তিনি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তখন ভারতে ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হিউয়ান চোয়াং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের অভিষেকের ৩০ বছর পরে প্রয়াগে ষষ্ঠবার যে মেলা হয়েছিল, সেই মেলা একমাস চলার পর সভাগৃহ বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষীগণ পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেই সময় হর্ষ এক স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। গোলমালের মধ্যে ছুরিকা হাতে এক ধর্মান্ধ হর্ষকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যায়। তাকে ধরে ফেলাতে হর্ষের জীবন রক্ষা পায়। এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠার জন্য কি ভীষণভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সে যাই হোক, হিউয়ান চোয়াং-এর মতে ভারতবাসীরা— 'সত্যবাদী, সাধু, সরল, ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিলেন।' তাম্রলিপ্ত-বাসিগণ ছিলেন উদার, ধর্মভীরু, পরিশ্রমী ও বীর। সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় তথা তাম্রলিপ্তের সভ্যতা সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখেছেন— "জগতের কোন সভ্যতাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে একথা বলা যায় না কিন্তু এটা সত্যি যে বৈদগ্ধ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতা এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল, যাকে অতীত বা বর্তমান কোনো সভ্যতাই অতিক্রম করতে পারে নি।" [১]

---

১ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ২০৩।

এই বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক 'তমলুককে ( Tam-mo-liti ) একটি উচ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধশালী উপসাগরের তীরবর্তী বৌদ্ধবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথে ও বহির্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইত। এখানে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও ১০০০ বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন, এবং নগরের একপ্রান্তে মহারাজ অশোক-নির্মিত ২০০ ফিট একটি স্তম্ভ ও তাহার পার্শ্বে সিঁড়ি ছিল, তাহাতে প্রাচীন বুদ্ধগণ বসিতেন ও বেড়াইতেন। দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্য এখানে প্রচুর পাওয়া যাইত, বিস্তর ধনীসওদাগর ও জাহাজের অধিকারিগণ ( Ship-owners ) বাস করিতেন ; এবং সাধারণতঃ অধিবাসিগণ ধনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ছিল, এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধমঠ ব্যতীত এখানে আর ৫০টি পৌত্তলিক হিন্দুমন্দির ছিল। যদিও ইহার ভূমি সকল নিম্ন ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্বরাশালী থাকায় কর্ষিত হইয়া যথেষ্ট ফুল ও ফল উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী ও কার্য তৎপর ছিলেন।' [১]

হিউয়ান চোয়াং-এর ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে অন্যত্র দেখা যায় ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত নগরী সমুদ্রে ধুয়ে যায়। [২] এই ধুয়ে যাওয়া যে কি রকমভাবে হয়েছিল তা' তিনি কোন উল্লেখ করে যান নি। তিনি ভারতে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ বছর অবস্থান করেছিলেন।

ইউয়ান চোয়াং-এর আগমনকালে বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন—(১) কর্ণসুবর্ণ ( ভাগলপুরাদি ), (২) পুণ্ড্র

---

১। Samuel Beal's Budhist Records of the Western World, Voll. II, P. 200-201 and Hunter's Orissa, Vol. I, P P. 209-310.

২ Imperial Gazetteer of India, Vol. VIII. P. 514

( দিনাজপুরাদি ), (৩) কামরূপ ( আসামাদি ), (৪) সমতট ( ঢাকাদি ), (৫) তাম্রলিপ্তি ( বিস্তৃত তমলুক রাজ্যাদি। ) ৩

চোয়াং রচিত ভ্রমণ কাহিনীর নাম "সি-য়ু-কি" ( Si-Yu-Ki )। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় চোয়াং সমতট ( বর্তমান ঢাকা ) থেকে পশ্চিম দিক ধরে নয়শত "লি" আসার পর তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রাজ্যের পরিধি ১৪০০ 'লি' এবং ইহার রাজধানী ১০ 'লি'র অধিক ছিল। এই রাজ্যের বাণিজ্য সমারোহ দেখে চোয়াং চমৎকৃত হয়েছিলেন!

ফা-হিয়ান ভারতে এসেছিলেন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর হিউয়ান চোয়াং এর ঠিক ২৩০ বছর পরে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে আসেন ভারতে। এই ২৩০ বছরের ব্যবধানে তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে যে কত অঘটন ঘটে গিয়েছে, তার কোন সংবাদই আমরা জানি না। অন্তত আজ পর্যন্ত তা' আবিষ্কার হয় নি। ফা-হিয়ান তার ভ্রমণ কাহিনীতে তাম্রলিপ্তে ২৪টি সংঘারাম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিন্দু মন্দির যে কতগুলি ছিল, সে সম্পর্কে কোন কিছু বলে যান নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ফা-হিয়ান হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তাই তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে হিন্দুদের সম্বন্ধে কোন কিছু লিখে যান নি। এ ধারণার মূলে কতখানি সত্য আছে জানি না। তবে ফা-হিয়ান যেখানে ২৪টি সংঘারামে দেখেছিলেন সেখানে ২৩০ বছর পরে হিউয়ান-চোয়াং এসে মাত্র ১০ বিহার এবং হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখলেন। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাম্রলিপ্ত থেকে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে কিরূপভাবে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ২৩০ বছরের মধ্যে ১৪টি সংঘারাম একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উঠে গিয়েছিল। ফা-হিয়ানের সময় হয়ত তাম্রলিপ্তে হিন্দুধর্মাবলম্বী কিছু সংখ্যক লোক ছিল, তা'

৩ R. C. Dutt's Rambles in India. PP. 156-157.

নিতান্ত নগণ্য। তাই ফা-হিয়ান তাদের সম্পর্কে কিছু বলা উচিত বলেই মনে করেন নি। বস্তুত ফা-এর সময়ে তাম্রলিপ্ত পুরাপুরি-ভাবেই বৌদ্ধ ছিল। হিউয়ান-চোয়াং-এর সময়ে ৫০টি হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ দেখে মনে হয়, তাম্রলিপ্ত তখন সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কবলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা' না হলে যেখানে ১০টি বিহার সেখানে তার চার-পাঁচ গুণ বেশী হিন্দু মন্দিরই বা কেন গজিয়ে উঠবে। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আজো যখন পাওয়া যায় নি, এ সম্পর্কে কোন মতামত দেওয়াও সমীচীন হবে বলে মনে হয় না।

তবে একথা স্পষ্টই মনে হয় যে এই ধর্মবিপ্লবের ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্যিক লেন-দেন-এর কোন বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নি। কেন না চোয়াং স্পষ্টই বলেছেন, তিনি এর বাণিজ্য সমারোহ দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এবং এই বাণিজ্য সমারোহ হয়ত আজো অক্ষুণ্ণ থাকত, যদি না তাম্রলিপ্তের ভাগ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হোত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণগণকে তাম্রলিপ্ত তথা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে বিতাড়িত করতে অনেক বিপ্লব করতে হয়েছিল সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

হিউয়ান-চোয়াং বলেছেন ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দর ধৌত হয়েছিল। সে যে কি রকম ধৌত তা' তিনি বিশদভাবে বলে যাননি। তাম্রলিপ্তের ভূমি ছিল নিম্ন অথচ উর্বর। এই নিম্নভূমি সামুদ্রিক কোন বিশেষ বিপর্যয়ের ফলে ধৌত হয়েছিল, তাই বলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তা' যদি হোত, তা'হলে চোয়াং নিশ্চয়ই সে কথা স্পষ্টই উল্লেখ করতেন। তবে অনুমান হয়, বিগত ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যেরূপ ভীষণ ঝটিকা ও জল প্লাবন হয়ে এই নগর ধৌত হয়েছিল উহাও হয়ত তদ্রূপ।[১]

---

১। Marshman's History of Bengal, [ 8th Edition ] P. 104.

দু'শত ফিট উচ্চ যে অশোক স্তম্ভ তাম্রলিপ্তে তিনি অবলোকন করেছিলেন, তার কোন চিহ্নই আজ আর বর্তমান নাই। এই অশোক স্তম্ভ যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কোথায় ছিল, সে স্থান সম্পর্কে কোন নির্দেশ আজো পাওয়া যায় নি। অনেকে হ্যামিল্টন সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের সম্মুখে যে প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভাংশটি আছে, সেইটিকেই উক্ত স্তম্ভের অংশ বিশেষ বলে অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কারণ তমলুকরাজ সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজবাটীর সীমা মধ্যে মৃত্তিকা খননকালে এই প্রস্তর খণ্ডটি পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্মুখে রক্ষিত প্রস্তর খণ্ডটি উক্ত প্রস্তর। তা'হলেও প্রশ্ন উঠে অশোক স্তম্ভের মত এই প্রস্তর খণ্ডটি ওস্থানেই বা পাওয়া গেল কেন? আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যমধ্যে প্রস্তর নির্মিত দুর্গও ছিল। মোগল শাসনের সময় তমলুক দুর্গের পরিমাণ ২৯৭ বিঘা নির্দিষ্ট হয়েছিল। হয়ত উক্ত প্রস্তর খণ্ডটি কোন প্রস্তর নির্মিত দালানের স্তম্ভাংশ। এবং প্রস্তর নির্মিত দুর্গটি বঙ্গে পাল রাজা বা গুপ্তরাজত্বের সময় তৈরী হয়েছিল। যার জন্য স্তম্ভ বা থামগুলি বৌদ্ধ ভাস্কর্যের অনুরূপ করে নির্মিত। কিন্তু আজ আর প্রস্তর নির্মিত দুর্গের বা গৃহের সামান্যতম নিদর্শনও বর্তমান নাই। বঙ্গোপসাগরের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অনন্তকালের জন্য মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই সমস্ত ভাস্কর্যের পুনরুদ্ধার করা আর হয়ত সম্ভব নয়, তবুও ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হয়ত টুকরো টুকরো নিদর্শন আজো আবিষ্কৃত হতে পারে।

চোয়াং তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ১৪০০ শত 'লি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'লি' শব্দটি চৈনিক দূরত্বমাপক শব্দ। বর্তমান কাঁথি মহকুমার অনেকাংশ ও সূতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম এই ১৪০০ লির মধ্যে নয়। কারণ এই সমস্ত দেশ তখন ছিল সমুদ্রের অতল গহ্বরে। তা'হলে অনুমান করা যায় যে বর্তমান ঘাটাল হয়ে

হাওড়া ও হুগলীর সামান্য কিছু অংশ হয়ত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান উড়িষ্যার সম্পূর্ণ বালেশ্বর জেলা ত এককালে বিস্তৃত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অংশ ছিলই। মূল তাম্রলিপ্ত বন্দরের পরিমাণ ছিল ১০ 'লি'। এই বিস্তৃত পরিমাণ স্থান আজো নির্দেশিত হয়নি। যদি এই স্থানের সীমা আজ নির্নীত হয়, তাহ'লে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের বিশেষ সুবিধা হবে। কারণ বর্তমান তমলুকটুকুই প্রাচীন বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত বন্দর নয়। প্রবাদ আছে তমলুক থেকে চার পাঁচ মাইল পশ্চিম দিকের গ্রাম 'দরজা' নাকি তমলুক বন্দরের "দরজা" ছিল। স্থলপথে এই বন্দরে প্রবেশ করতে হলে এই স্থানের নির্মিত দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হোত। যদি এ প্রবাদে কিছু মাত্রও সত্য থাকে, তা'হলে তাম্রলিপ্ত নগরীর খনন কার্য শুধু তমলুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তমলুকের আশপাশের বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সব শেষ কথা হোল এই মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার মত এখানে কোন ঢিপি নেই যে ঢিপি খুঁড়লেই কোন কিছুর হদিস মিলবে। তাম্রলিপ্ত ছিল সেকালে অত্যন্ত নিম্নভূমি। সেই নিম্নভূমি ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পলিতে ভরাট হয়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চল জেগে উঠেছে। তাই প্রকৃত তাম্রলিপ্তের স্থান নির্ণয় করতে হলে বা হিউয়ান-চোয়াং বর্ণিত তাম্রলিপ্তের সীমা নির্দ্ধারণ করতে হলে বেশ কষ্ট পেতে হবে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন।' এ উক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হয়ত অমূলক নয়, তবে হিউয়ান-চোয়াং-এর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য যেমন পাওয়া যায়, তেমন ভারতের একটি সুস্পষ্ট চিত্রও পাওয়া যায়। সে চিত্র পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিকগণকে বৌদ্ধ ভারত তথা হর্ষবর্দ্ধনের সময় ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করেছে।

আর যাই হোক ভারতবাসী এবং তাম্রলিপ্ত অধিবাসিগণ যে পরিশ্রমী, সৎ, উদার এবং সাহসী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হিউয়ান-চোয়াং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে যখন আসেন, তখন এই প্রদেশের শস্য সম্পদ ও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তাম্রলিপ্তের মাটিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোত এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হোত। চোয়াং তাম্রলিপ্ত বন্দরের এক অধিবাসীর সংগে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব করে তাঁর সাহাযোই বিদেশে সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়ে ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় চোয়াংকে তৎকালীন তাম্র-লিপ্তেব অধিবাসী অর্থাৎ বৌদ্ধগণ অপেক্ষা বাঙালী নাবিকই বেশী সাহায্য করে ছিলেন।

## পরিব্রাজক আই-সিং

### [ I-sing ]

মহাচীন থেকে ভারত পরিভ্রমণের জন্য প্রাচীন কালে যাঁরা এসেছিলেন, আই-সিং তাঁদের সকলের চেয়ে ভাল সংস্কৃত জানতেন। এই সংস্কৃত জ্ঞানই তাঁর ভারতভ্রমণকে সার্থক করে তুলেছিল। সম্রাট্ তৈ-সাংয়ের রাজত্বকালে ( ইনি ৬২৭ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন ) ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফান্-ইয়াংয়ে ( বর্তমান চো-চৌ ) আই-সিং জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তার বয়স সাত বছর তখন তিনি সান্-উ এবং হুই-সি নামক আচার্য দ্বয়ের নিকট পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। আর ঠিক চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বৎসর, তখনই ভারতে আসার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। ( ৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে )। কিন্তু এই সংকল্প তিনি তখনই রক্ষা করতে পারেননি। তৎকালে ভারতই ছিল বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। যিনি যত বড় বিদ্বান হোন না কেন, আজকালের মত যেমন

বিলাত ভ্রমণ করে না এলে শিক্ষা সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না তেমনি তৎকালে ভারত ভ্রমণ না করলে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি হোত না। চীন-সম্রাটগণ সাহায্য দিয়ে তৎকালে ভারতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বদেশের পণ্ডিতদের পাঠিয়ে দিতেন।

আই-সিং স্বদেশে অত্যন্ত যত্নপূর্বক প্রায় ঊনবিংশ বৎসর ধরে ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে ভারত দর্শনের ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবলরূপ ধারণ করে। তিনি বিনয় সংক্রান্ত পুস্তক প্রায় পাঁচ বছর ধরে অধ্যয়ন করে ঐ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফলে তাঁর উপাধ্যায় হুই-সি তাঁকে ঐ বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদানে আদেশ দেন। বস্তুত বিনয় শাস্ত্রে তাঁর মত পণ্ডিত তৎকালে চীন দেশে একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের প্ররোচনায় তিনি অভিধর্মপিটক সংক্রান্ত অসঙ্গের শাস্ত্রদ্বয় অধ্যয়নের জন্য পূর্ব-উইতে ( বর্তমান চ্যাং-টে-ফু ) গমন করেন। এই স্থান থেকে তিনি অভিধর্মকোশ এবং বসুবন্ধুর ও ধর্মপালের বিদ্যামাত্রসিদ্ধি শিক্ষার জন্য পশ্চিম রাজধানী সিয়ান-ফু-তে গমন করেন। খুব সম্ভবত চ্যাং-থানে অবস্থান কালেই তিনি হিউয়ান-চোয়াং কর্তৃক ভারত ভ্রমণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রোৎসাহিত হয়েছিলেন। এই সময় ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়ান-চোয়াং-এর মৃত্যু হয়। রাজাদেশে তিনি হিউয়ান-চোয়াং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সন্দর্শন করেছিলেন।

ফা-হিয়ানও হিউয়ান-চোয়াংকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জীবনী লেখক বলেছেন, এঁদের নাম কীর্তন করতে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কে বলতে পারে হিউয়ান-চোয়াং জীবদ্দশায় ও দেহান্তে স্বদেশে যে সম্মান লাভ করেন, সেইরূপ সম্মান লাভেচ্ছায় আই-সিং ভারতবর্ষ আগমনে প্রণোদিত হন নাই! যাই হোক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানী থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

চ্যাং-আনে অধ্যয়ন কালে পিংপু ( সেন্-সি প্রদেশস্থ পিং-চৌ ) বাসী চুই ধর্মশিক্ষক, লৈ-চো ( সাং-টাংয়ের অন্তর্গত লাই-চো-ফু ) নিবাসী শাস্ত্রাধ্যাপক হুং-ই এবং আরো দুই তিন জন ভারতবর্ষে আসবার জন্য একমত হন। কিন্তু পরিশেষে সিন্-চৌ-বাসী যুবক-যতি সান্-হিংকে[১] সংগে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হন।

ভারতবর্ষ ভ্রমন ব্যাপারে তিনি যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁদের কথা আই-সিংয়ের নিজের ভাষাতেই বলি—

"সিয়েন-হেং রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমি ইয়াং-চ্যুতে ( কিয়াং-স্থুর অন্তর্গত ইয়াং-চৌ। পর্যটক মার্কোপলো এই স্থানকে ইয়াং-ফু বলে উল্লেখ করেছেন ) গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিলাম। হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে আমি অসম্ভাবিতভাবে কোং-চৌবাসী ( কোয়ং-সিং প্রদেশের প্রাচীন নাম ) সিয়াও-চুয়ান্ নামক রাজদূতের সন্দর্শন লাভ করিলাম; তাঁহারই সাহায্যে, আমি দক্ষিণদিকে যাত্রা করিবার জন্য এক পারস্য দেশীয় জাহাজের স্বত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলাম এবং তিনিও দ্বিতীয় বার আমার দানপতির কার্য্য করিলেন। সিয়াং-টাং এবং সিয়াও-চেং নামক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় (ইঁহারাও রাজদূত ছিলেন) এবং নিং ও পেন্ নাম্নী তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদ্বয় ও অন্যান্য সকলেই আমাকে নানারূপ উপহার দানে অনুগ্রহীত করিলেন।"

"পূত-ভূমি পরিদর্শনে যে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম তাহা কেবল কেং বংশের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। অধিকন্তু, লিং-নানের ( কোয়াং-টাং এবং কোয়াং সি ) শ্রমণ ও সাধারণ ব্যক্তিগণ বিদায়-কালে অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিয়াছিলেন?"

"এই বৎসরের একাদশ মাসে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা সর্প ও

১ সান্-হিং আই-সিং-এর ছাত্র ছিলেন। ইনি আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে সুমাত্রা পর্যন্ত এসে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে চীনে প্রত্যাগমন করেন।

বৃশ্চিকরাশির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও পান্‌-উকে ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া যাত্রা করিলাম। কখনও কখনও আমি মৃগদাবের কথা মনে করিতে লাগিলাম। অন্য সময়ে আমি কুক্কুটপাদগিরিতে বিশ্রাম করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।"[১]

২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই জাহাজ মালব দেশের রাজধানী ভোজে উপস্থিত হোল। এইস্থানে আই-সিং জাহাজ থেকে নেমে ছ'মাস অবস্থান করে ছিলেন। এই ছ'মাসের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন। ভোজের রাজা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। ফলে তিনি মালয়ু প্রদেশে আসেন। এর বর্তমান নাম শ্রীভোজ। এখানে দু'মাস অবস্থান করার পর কচ্চ গমন করেন। কচ্চে একবছর অবস্থান করে রাজকীয় জাহাজে আরোহণ করে পূর্বভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এর দশদিন পরে "উলঙ্গ জাতি"র দেশে আসেন। আই-সিং এই দেশের রীতি-নীতি ও অধিবাসীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। "লোহা" এদেশে পাওয়া যেত না। এরা খুব হিংস্র ছিল। এই "উলঙ্গ দেশ" থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় পঞ্চদশ দিবস অগ্রসর হয়ে তারা তাম্রলিপ্ত পৌছিলেন। তাম্রলিপ্তিই পূর্বভারতের দক্ষিণ প্রান্তসীমা, ইহা মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ষাট যোজনের অধিক দূরবর্তী।

"সিয়েন-হেং রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের ( ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ ) দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে আমি তথায় উপনীত হইলাম। পঞ্চম মাসে পুনর্বার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথিমধ্যে আমি দুই একটি সঙ্গী পাইতে লাগিলাম।

মহাযান প্রদীপের[১] সহিত সর্বপ্রথমে আমার তাম্রলিপ্তিতেই

---

১ মহাযান প্রদীপ অন্যতম পর্যটক হিউয়ান—চোয়াংয়ের শিষ্য। ইনি পশ্চিম শ্যাম, লঙ্কা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে নালন্দা, বৈশালী এবং কুশীনগরে গমন করিয়া তত্রস্থ পরিনির্বাণ বিহারে দেহত্যাগ করেন।

২ আই-সিং, পৃঃ ৯-১১।

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারই আশ্রয় লাভ করিয়া আমি ব্রহ্মভারত (সংস্কৃত) শিক্ষা শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ) আরম্ভ করি। আচার্য্য টেং ও বহু সংখ্যক বণিক্ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখী রাজপথ দিয়া মধ্যভারতে উপনীত হইলাম।"[১]

এরপর আই-সিং নালন্দা প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থগুলি একে একে পরিভ্রমণ করেন। নালন্দায় কয়েক বৎসর অবস্থান করে ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সুদীর্ঘ ভারত ভ্রমণে তিনি কয়েকবার দস্যু হস্তে পড়ে ছিলেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে তবেই তিনি ভারত ভ্রমণ শেষ করে ছিলেন। তিনি বলেছেন ভারতেব পথঘাট তৎকালে একা একা ভ্রমণ করা কোনমতেই সমীচীন ছিল না। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বেরিয়ে নালন্দায় যাওয়ার সময় এমন ভাবে দস্যুহস্তে পড়েছিলেন যে তাঁর সর্বস্ব তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং শেষে তিনি সর্বাঙ্গে পাঁক মেখে তবেই কোন রকমে সঙ্গীদের সাথে গিয়ে মিলেছিলেন। এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল তিনি সাময়িক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে। তাম্রলিপ্ত থেকে সঙ্গীগণ সহ একদল বণিকের সাথে তিনি নালন্দার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি বলহীন ও অসুস্থ হওয়ার দরুণ সঙ্গীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন! এবং সেই অসুস্থ শরীরেই পথ অতিক্রম করতে থাকেন।

আই-সিং মৃগদাবে প্রবেশ, কুক্কুটপদে গমন ও নালন্দা বিহারে দশ বৎসর[২] অতিবাহিত করে ছিলেন। চুকাং রাজত্বের প্রথম বৎসরে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দা থেকে ছ'যোজন দূরবর্তী স্থান উ-হিংয়ের

---

১। কথিত আছে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিমল কীর্তি বৈশালীতে এক গৃহে বাস করতেন। এই গৃহ দশ হস্ত পরিমিত ছিল, পরে ইহা "কান্-চ্যাং" নামে অভিহিত হয়, বর্তমানে সংঘ মাত্রই এই নামে আখ্যাত হয়।

২ আই-সিং, পৃঃ ১৩।

নিকট বিদায় নিয়ে তিনি আবার দেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন। আই-সিং লিখেছেন—

"আমি ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিলাম। তৎপরে আমি তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাগমন করিলাম। তাম্রলিপ্তি পৌঁছিবার পূর্বে আমি পুনর্ব্বার দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে তাহাদের তরবারীর আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া অতি কষ্টে আমার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। অতঃপর তাম্রলিপ্তি হইতে আমরা জাহাজে কচ্চ অতিক্রম করিলাম। আমি যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছি তাহাতে পাঁচ লক্ষাধিক শ্লোক আছে। এইগুলি চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইলে সহস্রাধিক পুস্তক হইবে। এইগুলি সহ এক্ষণে আমি ভোজে অবস্থান করিতেছি।" আই-সিং, পৃঃ ১৬।

ভারতবর্ষ ও তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে আই-সিং বলতে গিয়ে বলেছেন —"মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষীয় মধ্য দেশ হইতে পূর্ব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তিনশত যোজন। উত্তর দক্ষিণে চারিশত যোজনের অধিক। আমি স্বয়ং সকল প্রান্তদেশ না দেখিলেও, অনুসন্ধানে ইহা অবগত হইয়াছি। ভারতবর্ষের পূর্বসীমা হইতে তাম্রলিপ্তি চল্লিশ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে পাঁচ-ছয়টি সংঘারাম আছে। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী। ইহা পূর্ব ভারতবর্ষের অন্তর্গত এবং মহাবোধি ও শ্রীনালান্দা হইতে ষাট যোজন দূরবর্তী। চীন হইতে আসিতে হইলে এই স্থানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে দুই মাস জলপথে গমন করিলে কচ্চে পৌঁছান যায়।" আই-সিং, পৃঃ ১৭।

কচ্চে ভোজ থেকে একটি জাহাজ আসে। এই জাহাজ সাধারণতঃ বছরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাসে ভোজ থেকে এসে উপস্থিত হয়। ভোজ থেকে সিংহল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যেতে হয়, ইহার দূরত্ব সাতশত যোজন।

আই-সিং যখন তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেছিলেন, তাম্রলিপ্তে তখন ভা-রা-হা নামে একটি বিরাট বিহার ছিল। এই বিহার তার আবশ্যকীয় আহার্য এবং পরিচ্ছদ সম্পর্কে আলোচনা বিস্তৃত ভাবে করেছেন। তাম্রলিপ্তে এই বিখ্যাত বিহারটি কোথায় ছিল আজো তা' আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই বিহারের নিয়ম-শৃঙ্খলা যে কত সুন্দর ছিল, তা, আই-সিং গ্রন্থ থেকে অবিকল উদ্ধৃত করছি। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এতে খুশী হবেন।

"প্রথমবার তাম্রলিপ্তিতে গমন কালে আমি বিহারের বহির্দ্দেশে তত্রস্থ কয়েকজন প্রজাকে কিছু শাক তিন অংশে বিভাগপূর্বক এক অংশ যতিগণকে উপহার প্রদান করিয়া ও অন্য দুই অংশ সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিলাম। আমি তাহাদের ঐরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না এবং পূজনীয় মহাযান প্রদীপকে ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, "এই বিহারের অধিকাংশ শ্রমণই প্রতিমোক্ষ প্রতিপালন করেন। মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ করিতে নিষেধ করায়, তাঁহারা তাঁহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তাঁহারা সদাচারে জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া হলচালনা ও জলসেচনের দ্বারা প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।"

আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে প্রত্যহ প্রভাতে ঐ বিহারের অধ্যক্ষ কূপসান্নিধ্যে জল পরীক্ষা করিতেন; জলের মধ্যে কোন কীট না থাকিলে ঐ জল ব্যবহৃত হইত কিন্তু তন্মধ্যে একটি কীট থাকিলেও ঐ জল পরিষ্কৃত হইত; কোন দ্রব্য এমন কি কিঞ্চিৎ শাকও প্রদত্ত হইলে সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হইত না, কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে সঙ্ঘই উহা বিচার করিতেন এবং যদি কোন যতি একাকী কোন সিদ্ধান্ত করতেন অথবা ইচ্ছানুযায়ী,

সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে, শ্রমণগণের সহিত ন্যায় বা অন্যায় আচরণ করতেন, তবে তাঁহাকে কুলপতি আখ্যা প্রদান করিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইত।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল :— সন্ন্যাসিনীগণ বিহারে যতিগণের নিকট গমনকালে, সঙ্ঘকে নিবেদন করিয়া পরে তথায় গমন করিতেন। যতিগণকে সন্ন্যাসিনীগণের কক্ষে যাইতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া গমন করিতে হয়। বিহার হইতে দূরে ভ্রমণকালে সন্ন্যাসিনীগণ একাকী গমন করিতেন না; কিন্তু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতে হইলে তাঁহারা একত্রে· চারিজনের কম গমন করিতেন না। প্রতি মাসের উপবাস দিবসে বিভিন্ন বিহার হইতে বৈকালে বহু শ্রমণ সমবেত হইয়া কর্ম্মপদ্ধতি পাঠ ও সম্মানের সহিত উহা প্রতিপালন করিতেন।

আমি নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একদিন নিম্নশ্রেণীস্থ জনৈক ভিক্ষু এক প্রজার স্ত্রীকে এক প্রস্থ তণ্ডুল একটি বালককে দিয়া প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এই কার্য চাতুরী বলিয়া মনে করা হয় এবং এক ব্যক্তি এই ঘটনা সঙ্ঘের গোচরীভূত করে! শিক্ষককে আহ্বান ও পরীক্ষা করিলে তিনি ও তাঁহার সহযোগী অপরাধ স্বীকার করিলেন। যদিও তিনি কোন দোষ করেন নাই; তথাপি লজ্জিত হইয়া সঙ্ঘ হইতে নিজ নাম প্রত্যাহার করিয়া বিহার হইতে চিরদিনের জন্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গুরুদেব পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ অন্য ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। এবম্প্রকারে শ্রমণগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে গমন না করিয়া নিজেরাই অপরাধের বিচার করেন। স্ত্রীলোকগণ বিহারে প্রবেশকালে কদাপি যতিগণের কক্ষে প্রবেশ করে না; অলিন্দে থাকিয়া মুহূর্ত্ত-মাত্র কথোপকথন করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। ঐ সময়ে বিহারে রাহুল মিত্র নামক একজন ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, তাঁহার চরিত্র অনিন্দনীয় এবং তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত

হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সাত শত গাথা সমন্বিত রত্নকূটসূত্র পাঠ করিতেন। তিনি কেবল ত্রিপিটকেই পারদর্শী ছিলেন না; তিনি চতুর্বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শাস্ত্রেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্ব আর্যদেশের শ্রমণগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ হইতে তাঁহার মাতা বা ভগিনী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করেন নাই; তাঁহার মাতা বা ভগিনী তাঁহার নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার কক্ষের বহির্দ্দেশে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিবস আমি তাঁহাকে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি স্বভাবতঃই সংসারের প্রশক্তিতে আসক্ত; এরূপ না করিলে আমি উহার উৎস প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হই না। স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতে আমরা ভগবান দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে স্ত্রীলোকদিগকে দূরে রাখাই কর্তব্য।"

উচ্চ শিক্ষিত পূজনীয় শ্রমণগণকে ও ত্রিপিটকে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বিহারের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষগুলি ও ভৃত্য, সঙ্ঘ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। দৈনিক শিক্ষাদান কালে ইঁহারা ভিক্ষুদের উপর ন্যস্ত ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। বহির্গমন কালে ইঁহারা শিবিকায় গমন করিতে পারেন; কিন্তু অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ। অপরিচিত ভিক্ষু বিহারে উপস্থিত হইলে পাঁচ দিবস তাঁহাকে উত্তম খাদ্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা এবং বিশ্রামর্থ অনুরোধ করা হয়। এই কয়দিবস অন্তে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় গণ্য করা হয়। সচ্চরিত্র হইলে সঙ্ঘ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত বাস করিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার পদমর্যাদানুযায়ী শয্যাবস্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু শিক্ষিত না হইলে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় পরিগণিত করা হয়; পক্ষান্তরে, তিনি শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলে তাঁহার প্রতি উল্লিখিত ভাবে ব্যবহার করা হয়। এরূপ হইলে তাঁহার নাম তালিকা ভুক্ত

করিয়া তাঁহাকে ঐ বিহার-বাসী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাঁহাকে তখন বিহারের পুরাতন অধিবাসীর ন্যায়ই গণ্য করা হয়। কোন গৃহস্থ সদুদ্দেশ্যে সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করা হয় এবং তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহনেচ্ছু দেখিলে সর্বপ্রথমে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অতঃপর রাজ্যের তালিকার সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সঙ্ঘেরই ভিন্ন তালিকা আছে এবং তাঁহার নাম এই তালিকা ভুক্ত হয়। নিয়মভঙ্গ করিলে ও আচার প্রতিপালনে অন্যথা করিলে তাঁহাকে বিহার হইতে দূরীভূত করা হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করা হইত না। যতিগণ পরস্পরের নিকট আত্ম-দোষ স্বীকার করেন বলিয়া, পাপ বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই দমন হয়।[১]

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি আবেগ ভরে বলিলাম, "গৃহে বাস কালে আমি আপনাকে বিনয় পিটকে অভ্যস্ত মনে করিতাম, এবং কদাচ অনুমান করি নাই যে একদিবস এই স্থানে আসিয়া আপনাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিব। পশ্চিমাঞ্চলে না আসিলে কি প্রকারে আমি এই সকল যথাযথ আচার প্রত্যক্ষ করিতাম?"

---

১। সঙ্ঘের যে সকল বিধান দ্বারা মণ্ডলীর শাসন বা শাস্তি বিধান হইত, তাহার নাম "পাতিমোক্‌খ" (প্রতিমোক্ষ). পালি ধর্মগ্রন্থে যে পাতিমোক্‌খের বিধান আছে, তাহাই সর্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য, ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি॥ সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিধান একরূপ, তবে বিধানের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, পালিগ্রন্থ মতে ভিক্ষুগণের প্রতিমোক্ষের সংখ্যা ২২৭, চীনদেশে প্রকাশিত ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ে এই সংখ্যা ২৫০; তিব্বতে ২৫৩ এবং মহাব্যুৎপত্তিতে ২৫৯, বুদ্ধের আদেশ ছিল যে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ প্রতি পক্ষে একবার ঐ সকল নিয়মাবলী পঠিত হইবে, চারজন ভিক্ষু যেখানে সমবেত হইতেন, সেখানেই এই আবৃত্তি হইতে পারিত, প্রত্যেক বিধানের আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন ভিক্ষু তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা, লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্যভাবে সভায় বলিতে হইত।

উল্লিখিত আচারের অনেকগুলি সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ত্যাগ স্বীকার শিক্ষার জন্য, অন্যগুলি বিষয়ে দৃষ্ট হয় এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর বহুদিবস অতীত হওয়াতেও এইগুলি অবশ্য আচরণীয়। তাম্রলিপ্তির ভা-রা-হা বিহারের এইগুলিই ক্রিয়াপদ্ধতি। ( আই-সিং,—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, একাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় কল্প-সমসাময়িক ভারত। চৈনিক পরিব্রাজক। পৃঃ ১০২—১০৭ )

আই-সিং এই ভা-রা-হা বিহারে বসেই বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের 'সুহৃল্লেখ' গ্রন্থ ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করেছিলেন। 'সুহৃল্লেখ' পদ্যে লিখিত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র কবিতা। ইহা পত্রাকারে লিখিত। অর্থ—"ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট পত্র'। ইহা তাঁর পুরাতন দানপতি জেতককে উৎসর্গ করা হয়েছিল, শতবাহন[1] নামক এই নরপতি দক্ষিণ ভারতের সুবৃহৎ দেশাধিপতি ছিলেন। এই পত্রের সৌন্দর্য আশ্চর্য্য এবং সৎপথের জন্য উপদেশ গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ। তাঁর দয়া কুটুম্বিতা অপেক্ষাও অধিক এবং ঐ পত্রের বহুপ্রকার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখেছেন "ত্রিরত্নকে[2] সম্মান ও বিশ্বাস কর এবং আমাদের মাতাপিতার ভরণ পোষণ কর। আমাদের শীল রক্ষা করা কর্তব্য এবং পাপজনক কর্ম্ম পরিহার করো।"

"যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্র অবগত না হইব, ততক্ষণ কাহারও সংসর্গে থাকিবে না। অর্থ ও সৌন্দর্যকে সর্বাপেক্ষা কদর্য দ্রব্য বলে মনে করব। আমাদের সাংসারিক কার্যের সুবন্দোবস্ত করব এবং সর্বদাই মনে রাখব যে, এই পৃথিবী অনিত্য।" ( আই-সিং, পৃঃ ২৭০—২৭১ )

---

১। এই রাজা কে ঠিক অবগত হওয়া যায় না, হিউয়েন-চোয়াং এঁকে দক্ষিণ কোশলের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন, আই-সিং 'সদবাহন' রাজার উদ্দেশ্যে এই কবিতা লিখিত হয় বলেছেন, তার নাম উদয়ন বলেছেন, আবার কেহ কেহ এঁকে শতবাহন রাজা বলে স্থির করেছেন।

২। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ।

আই-সিং পণ্ডিত রাহুল মিত্র সম্পর্কে যে সামান্য আলোকপাত করেছেন, তা' অত বড় পণ্ডিতের পরিচয়ের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই ডাঃ নলিনীনাথ সেনগুপ্ত তাঁর প্রণীত 'বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম" নামক গ্রন্থে বড় দুঃখ করে লিখেছেন— "আই-সিং দয়া করিয়া এই তথ্যটি না লিপিবদ্ধ করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, অতখানি রাহুল মিত্রের এই এতটুকু না জানলেও বাঙ্গালীর ইতিহাসের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না। এমন কত রাহুল মিত্রই বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন বিবরে লীন হইয়া আছেন, আই-সিং গণের ক্ষমতাও নাই তাঁহাদের প্রনষ্ট স্মৃতিতে আবার ক্ষীনতম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁহাদের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-জননীর ভাগ্যলিপিকে নিরর্থক নিষ্ঠুর খোঁটা দিতে চাই না। তবে আই-সিংকে অন্ততঃ মুখের একটি ধন্যবাদ দিতেই হয়। ( বাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ৬৭ )

ভা-রা-হা বা বরাহ বিহার তাম্রলিপ্তের যে কোথায় অবস্থিত ছিল, আজো তা, আবিষ্কৃত হয়নি। এই সুপ্রসিদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ যদি আবিষ্কৃত হোত তা'হলেও অনুমান করা সম্ভব হোত কত বড় ছিল এই সুপ্রসিদ্ধ বিহারটি। এই বিহারে যে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণগণ বাস করতেন, তাই নয় এখানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুনীও থাকতেন। আই-সিং এই বিহারের কোন বর্ণনা দেননি। কিন্তু এর নিয়মাবলী সম্পর্কে যেরূপ ভাবে প্রশংসা করেছেন, তা'তে মনে হয় তৎকালে এই বিহারটি বিবিধ জ্ঞানের রত্নখনি ত ছিলই অধিকন্তু দেশের তৎকালীন রাজা বা রাজপুরুষগণ অনেক জমি জায়গাও এই বিহার পরিচালনার জন্য দান করে ছিলেন। কারণ, আই-সিং নিজেই দেখেছেন বিহারের সম্পত্তিতে কৃষকগণ চাষ করতেন এবং তাঁরা উৎপন্ন শস্যের একভাগ মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে দিতেন এবং বাকি দু'ভাগ নিজেরা গ্রহণ করতেন। অন্যান্য নিয়মকানুন সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা' থেকে মনে হয় এই বিহারটি হয়ত

অট্টালিকা ছিল এবং এতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। এর পরিচালন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কালের কবলে এই বিখ্যাত বিহারটি হয় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে, না হয় বঙ্গোপসাগরের বার বার তরঙ্গোচ্ছাসে পলি পড়ে পড়ে গভীর ভূগর্ভে চাপা পড়ে গেছে। কিম্বা আজকের সুউচ্চে স্থাপিত দেবী বর্গভীমার মন্দিরই হয়ত সেই বিখ্যাত বিহারের সামান্যতম অংশ। বর্গভীমার মন্দিরটি যে বৌদ্ধ মঠের অনুরূপ ভাবে নির্মিত তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের মত এই মঠটিকেও ব্রাহ্মণগণ রাতারাতি ধ্বংস করে কিরূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করেছিল, সে কাহিনী সম্পূর্ণ অবগত না হলেও কিংবদন্তীর মধ্যে আজো তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই বলেছি তাম্রলিপ্তে ধীরে ধীরে কিরূপ ভাবে বৌদ্ধ আধিপত্য ধ্বংস হচ্ছে তা ভ্রমণকারীদের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। হিউয়েন-চোয়াং যেখানে ১০টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন, সেখানে ৪৪ বছরের মধ্যেই চারটি বিহার ধ্বংস হয়েছিল নিশ্চয়ই। কেননা আই-সিং এসে মাত্র পাঁচ-ছ'টি সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন, এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় ব্রাহ্মণগণের বিপ্লব খুব তাড়াতাড়ি বিরাট আকার ধারণ করেছিল। এই বিপ্লব হয়ত বৌদ্ধ-অধ্যুষিত স্থানেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয়েছিল।

## ॥ অন্যান্য পরিব্রাজকগণ ॥

পরিব্রাজক আই-সিং এর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় ভারতে চীন থেকে প্রায় ৫৬ জন পরিব্রাজক এসেছিলেন। এঁদের অনেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দর ঘুরে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। কিন্তু এঁদের ভ্রমণ কাহিনী থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

"তবে তাঁহারা কোন পথে কি ভাবে আসিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ আলোচনা করিলে কোন্ কোন্ দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল পর্যটকের মধ্যে তাও-লিন, তাং-চেং-তেং, হুই-লুন, উ-হিং-চেং-কন, চাং-মিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধি সম্পন্ন। তাও-লিন যবদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পথে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাং-চেং-তেং, লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া বরাহ বিহারে বাস করিয়াছিলেন। যে বাণিজ্যপোতে তিনি তাম্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সেই বাণিজ্যপোত দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। হুই-লুন ও উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া ছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্তের সহিত যে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায়। (পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩)

## ॥ মহাস্থবির কালিক ॥

প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ষোলজন বিখ্যাত মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ষোলজন মহাস্থবির ছিলেন বৌদ্ধ জগতে বিশেষ বিখ্যাত ও সাধন পথে উন্নত। এঁদের পর আরও অনেক স্থবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এই ষোড়শ মহা-স্থবিরের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে কালিকও ছিলেন একজন। কালিক জাতিতে বাঙালী। তিনি ছিলেন তাম্রলিপ্তের অধিবাসী। তাঁর জন্মস্থান খুব সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি কোন একটি গ্রামে। (Mem, As. Sac, of Bengali, Vol 1. No. 1, P. 2)

কিন্তু সমস্যা, এই কালিক যে কত খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, তার নির্দ্দিষ্ট কোন সময় আজো নির্দ্ধারিত হয়নি বা জানবার কোন উপায় নাই। তবে ডাঃ নলিনীনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন, মহাযান

সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে কালিক বর্তমান ছিলেন। স্থবির পূজা সম্ভবতঃ প্রথমে ভারতেই আরম্ভ হয়। তারপর ভারতের শ্রমণগণ খোটান দেশে প্রবর্তন করেন।

তাই বলে মহাযান সম্প্রদায় প্রাচীন নয়, ইহা সর্বাধুনিক। বৌদ্ধধর্মের মুখ্য দু'টি বিভাগ আছে। একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দু'টি যান প্রায় দু'টি বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি হীনযান পুরাতন ও মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দু'টি মতের মধ্যে নানারূপ বিভেদ আছে। কিন্তু মুখ্যত একটিরই উল্লেখ এখানে করা দরকার। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশু-পক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান কাজ। হীনযানে দেবদেবীর বালাই নাই। গৌতম-বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না তাঁর ভাই নন্দ যখন তাঁকে প্রণাম করেন তখন বুদ্ধ তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, প্রণামাদি দ্বারা তিনি সুখী হবেন না। তিনি সুখী হবেন তখনই যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে সদ্‌ধর্মের পালন্ করবেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মহাযান মতের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজা এবং স্থবিরপূজারও প্রচলন হয়েছিল। তা যদি না হোত, তবে হীনযান মতের প্রচার কাল থেকেই বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া যেত। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে কোন মূর্তির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়নি। তখন বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদির পূজা হোত।

রাইমনি কেল্লার দেবদেবী ( উড়িষ্যা )

কোর্ষিনামার একটি পৃষ্ঠা

তাম্রলিপ্তে উল্লেখযোগ্য পরিব্রাজকগণের আর কোন কাহিনী আজো জানা যায়নি না আবিষ্কৃত হয়নি। তবে পণ্ডিত মেজর উইলফোর্ড সাহেব বলেন, "তাম্রলিপ্তের একজন রাজা ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন।"[১]

এই দূত যে তাম্রলিপ্তের কোন রাজা পাঠিয়ে দিলেন, তার কোন বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। যদি উইলফোর্ড সাহেব আমাদের সে সংবাদ দিতেন বা জানার কোন উপায় থাকত, তা'হলে তাম্রলিপ্তের ইতিহাস রচনার পক্ষে অনেক উপকার হোত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাম্রলিপ্তের ইতিহাস সুদীর্ঘ তিন-চার হাজার বছরের ইতিহাস। কিন্তু এই বহু বিস্তৃত ইতিহাসের অতি অল্পই মাত্র সংগৃহীত হয়েছে।

## ॥ দেবী বর্গভীমা ও তাঁহার মন্দির ॥

তমলুকবাসী ত বটেই এবং তমলুকের আশ-পাশের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি গ্রামের অধিবাসিগণ সকলেই তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমাকে জাগ্রত অভিষ্টদায়িনী দেবীরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বহুশতাব্দী ধরে এই দেবী কোটি কোটি নর-নারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা গ্রহণ করছেন। মানুষের মনের উপর এঁর প্রভাব এত প্রগাঢ় যে, এঁর সম্বন্ধে কোনকিছু বলতে গেলেই মানুষ তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। এত প্রবাদ ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট না করে পারে না।

বর্তমান আমি এই দেবী ও এঁর মন্দিরকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার কোরব। পূর্বেই বলেছি, এই মন্দির খুব সম্ভবত হিন্দু মন্দির নয়, বৌদ্ধদের সংঘারাম ছিল এককালে, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের যুগে ব্রাহ্মণগণ রাতারাতি এই

---

১ Hamilton's East India Gazetteer , Vol. II. P. 682.

বৌদ্ধ সংঘরামকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেছেন। দেবীর সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলি বিশেষরূপে পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে এই সত্য। আমরা এইগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করার আগে কিংবদন্তীগুলো উদ্ধৃত করব।

এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির যে কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, মহারাজাধিরাজ স্বয়ং তাম্রধ্বজ কর্তৃক এই দেবী ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাহিনীটি এই—

"নরপতি তাম্রধ্বজের নিয়োজিত ধীবরপত্নী প্রত্যহ রাজসংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত। সে একটি বনমধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সলিল গ্রহণ কবিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটি দেবীমূর্তি রহিয়াছে, তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।" তামালুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৬ ও ১৭ পৃঃ।

ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন, "নূতন রাজা কালুভূঞা নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারম্ভ করেন, ঐ ঠাকুর বর্গভীমা নামে বিরাজ করিতেছেন। এই ঠাকুর প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুরীতে জগন্নাথদেব প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেরূপ গল্প আছে, ইহা ও অবিকল সেই জাতীয় গল্প। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ দেব উড়িষ্যার দক্ষিণ জঙ্গল

প্রদেশে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারানুসারে একরূপ গল্প রচনা হইয়াছে, আর তমোলুক সমুদ্রকূলবর্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের মনের ভাব ও স্থানের অবস্থানুসারে গল্প অন্যরূপ বাঁধা হইয়াছে। জগন্নাথ দেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন, এবং এক ব্যক্তির বাটীতে পাওয়া যায়, আর এখানকার বর্গভীমা দেবীকে একজন ধীবরের বাটীতে পাওয়া যায়। জগন্নাথ দেব কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবী পাথরের, প্রথমতঃ উভয়কেই নীচ জাতীয় লোকে গোপনে পূজা করিত, তাহার পর রাজগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কৃত দেবতাদ্বয়কে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে যাত্রী আসিতে লাগিল, এবং এই নূতন ঠাকুরদ্বয় প্রকাশ হইবার পরেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পুঁথি বাহির করিয়া নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" Hunter's Orissa, Vol. I.P.311.

ভুরিশ্রেষ্ঠের ইতিহাস লেখক ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, ভুরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণরাজ বংশের অষ্টম পুরুষ রাজা শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের ভ্রাতা রাজা শ্রীমন্ত নারায়ণ রায় দেবী বর্গভীমার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়ে প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধ্বংস হয়ে যায়। এই পুস্তকে লেখা আছে—

"শ্রীমন্ত বাঙ্গালার সুলতানের অল্পবিস্তর পৃষ্ঠপোষকতায় সুকৌশলে ও বীর্যবলে উড়িষ্যা রাজকে পর্যুদস্ত করিয়া মেদিনীপুরের পূর্বসীমা হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উড়িষ্যাপতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে একাধিক বার বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সুসজ্জিত নৌবহর দামোদর ও রূপনারায়ণ নদে ভাসমান থাকিয়া শত্রুর গতিরোধ করিত। তিনি তমলুকে বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।" রায়বাঘিনী, অভিনব সংস্করণ, পৃঃ ৫১-৫২।

আবার কাহারো কাহারো মতে ধনপতি সওদাগর নাকি এই মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

"দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট একখণ্ড পারসিক ভাষায় লিখিত দলিল রহিয়াছে, ইহাকে তাঁহারা "বাদসাহী পঞ্জ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন (খ্রীঃ ১৫৬৭-৬৮) দুরন্ত কালপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি দেবীকে সন্দর্শন করত প্রীত হইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন।"[২]

কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আজ থেকে চারশত বছরেরও আগের কথা। হুগলী জেলার দামোদর নদের তীরে এক গ্রামের এক অভিমানী ছোট-ছেলে মায়ের ওপর রাগ করে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়ে বসেছিল ঐ দামোদরেরই তটভূমির জনহীন একটি স্থানে স্থাপিত এক চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের কাছে। ঘুম নেমে আসে চোখে। চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক।

'রাজু ঘরে ফিরে আয়!'

স্বপ্নের মধ্যেই এক আকুল কণ্ঠের এই আহ্বান শুনতে পেয়ে

---

১ "Another legend relates, how a famous merchant, named Dhanapati, the Lord of Wealth, when sailing down the Rupnarayan in his ship, anchored at Tamluk. While here he saw a man carrying a golden jug, who told him that a spring in the neighbouring jangle had turned his
that a spring in the neighbouring jungle had turned his
brass vessel into a golden one, and pointed out the well. The merchants according bought up all the brass vessel, in the market transmuted them into the precious metals sailed to ceylon, where he sold them to the natives and returning, built the great Tamluk temple. The skill and ingenuity displayed in the construction of the temple still attract admiration."

A Statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 64

২ তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৭ পৃঃ।

ঘুম ভেঙে গেল বালকের। ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারে, মিথ্যা নয় এই স্বপ্ন। সত্যিই একটা ব্যাকুল মায়ার স্বর যেন চণ্ডী দেউলের চারদিকে ছুটোছুটি করে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'রাজু ঘরে ফিরে আয়!'

দেউলের দুয়ার হতে ছুটে যেয়ে মায়ের আঁচল ধরেছিল সেই বালক। তার নাম রাজু, চারশত বছর আগের হুগলী জেলার ভুরস্মুটের এক ব্রাহ্মণকুমার—রাজীবলোচন রায়।

কে জানে কেমন করে সেই রাজীবলোচনই আবার একদিন কোন্ দুঃস্বপ্নের অভিশাপে কার ওপর রাগ করে আর কিসের অভিমানে 'কালাপাহাড়' হয়ে গেল। মন্দিরের শিখর ভূপাতিত করে, দেউলদ্বারের কপাট চূর্ণ করে, দেবশীলা দীর্ণ করে আর নীলাচলের দারু-ব্রহ্ম দগ্ধ করে উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছিল যে ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড়, সে-ই ত ছিল দামোদর তটের এক গ্রামের এক হিন্দু মাতার আঁচল ধরা অভিমানী ছেলে রাজু। নবাব দুহিতার প্রেমে মুসলমান হয়েছিলেন, আর সুলেমান কররানির সেনাপতি হয়েছিলেন।

একদিন অভিযানে চলেছেন কালাপাহাড় উড়িষ্যার অভিমুখে। সে অভিযানের পথে দেউলের দুয়ার আর দেবশিলা চূর্ণ করে এগিয়ে চলেছেন কালাপাহাড়। এই ভাবেই এক সন্ধ্যায় রূপনারায়ণের তটে যে স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন কালাপাহাড়, সেই স্থানের নাম তমলুক।

কালাপাহাড়ের শিবির জেগে উঠেছে রূপনারায়ণের তটে। মন্দিরচূড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন কালাপাহাড়। আর কতক্ষণ! রূপনারায়ণের বুক থেকে বহু শতাব্দীর শ্রদ্ধায় লালিত মন্দির-চূড়ার সে ছায়ার জীবন আর কতক্ষণ?

একাকী এগিয়ে চললেন কালাপাহাড়। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের দেবীগৃহের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়।

বেলা বাড়ে। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে ওঠে চতুর্দ্দিক। রূপনারায়ণের বুক থেকে হু-হু করে ছুটে আসে শীতল বাতাস। চোখের পাতায় ঘুম টেনে আনে। তারপর, তারপর সেদিনের তমলুকের পাঠান সৈন্যের শিবির তখন কল্পনাও করতে পারে না যে, দেবী বর্গভীমার সম্মুখে এক শীতল সুচ্ছায়ের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

কে জানে, কি স্বপ্ন দেখে অমন করে চমকে উঠেছিলেন কালাপাহাড়? ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। উৎকর্ণ হয়ে আর চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন কালাপাহাড়।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখেই একবাব দেবী বর্গভীমার দিকে তাকালেন। মনে হয়, হাসছেন দেবী বর্গভীমা। সেদিন সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য ধ্বংসোম্মাদ কালাপাহাড় গ্রাম্যবালক রাজু হয়েই গিয়েছিলেন।

দূরে নিক্ষেপ করলেন লৌহ-লগুড়। কাগজের ওপর নিজের পাঞ্জার ছাপ এঁকে দিয়ে দেবী বর্গভীমার উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধাব বাণী লিখলেন। দেবী বর্গভীমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

কালাপাহাড়ের সেই শ্রদ্ধার দলিল আজও দেখিয়ে দিতে পারেন দেবী বর্গভীমার মন্দিবের পুরোহিত। মূর্তিনাশক কালাপাহাড় জীবনে প্রথম ও একমাত্র যে মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেও ধ্বংস করতে পারেননি, সেইমূর্তি আজও তমলুকের মন্দিরে আরতির আলোকে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠে[১]।" "কিংবদন্তীর

---

১। কালাপাহাড়ের জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতদ্বৈধ আছে। তিনি নাকি জালাল সাহের সময় বর্তমান ছিলেন (১২৬০-১২২৩)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বৃহৎ বঙ্গ" দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাঁজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালা-পাহাড়ের জীবন চরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

দেশে,"—'সুপান্ত'। প্রলাপ পত্রিকা—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১ (১৯৫৪) থেকে সংগৃহীত।

বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দীর সময় বাংলাদেশে বর্গীর অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। সেই সময় বর্গীগণ তমলুকেও এসে লুণ্ঠন আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ১১৩ পৃষ্ঠা ও Imperial Gazetteer of India, Vol., III, P. 515 পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ( বর্গী ) নিম্ন বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নরপিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর, শান্তিপ্রিয় জনগণ সমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, এবং ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সেই হৃদয় বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তমলুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোনপ্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল।"

এবার আমরা একটি অত্যাধুনিক কাহিনীর কথা আলোচনা

---

তাঁহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়, তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে ( থানা মান্দা ) তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাদের উপাধি ভাদুড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশ জাত ( 'জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুওর"—কৃত্তিবাস)। কালপাহাড়ের পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল ভুঁইয়া। অপর পক্ষে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে" পেঁড়ুয়াগড়ের রাজা অমরেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন…।" পৃঃ ১৪৭।

করব। এটি একটি সত্য ঘটনা। 'হিন্দু' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় শ্রীযুত ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় "শ্রীশ্রীবর্গভীমা মা" নামে একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করেছেন। উক্ত 'হিন্দু' পত্রিকাটির ৩৯৭-৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাত্র আমার কাছে আছে। উক্ত পৃষ্ঠা কটিতেই এই কাহিনী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমগ্র পত্রিকাটি না থাকার জন্য উহা কত সালে প্রকাশিত ও কত বর্ষের তা সঠিক ভাবে কিছু জানান সম্ভব হোল না। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

"একদিন মনের যখন এই রকম অবস্থা সেই সময়ে আমার পড়ার ঘরে আমার এক বন্ধু এসে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে সে বলে উঠলো "হাঁরে, দেবদেবী মানিস? আমি কিন্তু ভাই এখন মানি।" মহা নাস্তিক বন্ধুটির মুখে একথা শুনে আমি বিশেষ বিস্মিত হলুম। বন্ধুটি যা বললে তা এই—রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছিল এক চমৎকার দেবীমূর্তি হাতছানি দিয়ে যেন তাকে ডাকছেন আর মন্দিরে যাবার সব পথগুলির নির্দ্দেশও যেন তিনি বন্ধুটিকে দিয়ে দিলেন। পরদিন বন্ধুটি সেই স্বপ্ন-কল্পিত পথ ধরে সেই দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল, এবং কি জানি কেন, সেই মূর্তি দর্শনের পর থেকে বন্ধুটির মনে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তার মুখে শুনলাম দেবীমূর্তির নাম বর্গভীমা এবং উহা তমলুক সহরের নিকটেই অবস্থিত। আমার ভবঘুরে মন বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠলো। বন্ধুকে নিয়েই সেই রাত্রে চললুম বর্গভীমা দেবী দর্শনে।

ট্রেন চলেছে তার সামনের অন্ধকার কেটে টুকরো টুকরো করে, অবিশ্রান্ত গতিতে—আর লাইনের দু'ধারে চলেছে ক্ষেতের পর ক্ষেত, আবার ক্ষেত—এর সীমা নাই শেষ নাই—ক্ষেত আর ক্ষেত—আর তার সারা গায়ে ছড়িয়ে গেছে ঘন জমাট অন্ধকার।

এমনি ভাবেই উৎসাহে ও আনন্দে চলেছি। অন্ধকার রাতের

মায়া আমার চোখে কি মোহন তুলির ছোঁওয়া দিয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে পান করে চলেছি রাতের নিস্তব্ধতার রূপ। তারপর যখন চমক ভাঙলো তখন দেখি রূপনারায়ণের পুলের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। আজকের রঙীন চোখে আমার কাছে জগৎটা লাগছে বেশ মিঠে, রূপনারায়ণ নদের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখে মনে পড়লো বহুদিন আগে লিখিত আমার কবিতার দুইটি ছত্র—

"যবে আসি যাই, তোমা পানে চাই, অপলকে থাকি চেয়ে,
পুলকিত তনু, তোমার চরণে, উচ্ছাসে পড়ে নুয়ে।"

পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে বাসে করে তমলুক উপস্থিত হলুম। সেখান থেকে পদব্রজেই "বর্গভীমা" দেবীর মন্দিরে যেতে হয়। পাথরে খোদাই করা দেবীর চতুর্ভুজা ছোট মূর্তি চিত্তাকর্ষক ভক্তি উদ্রেককারী। পর্তুগীজেরা যখন বাণিজ্য করতে তমলুকে আসেন সেই সময়েও এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে মহিষাদলের রাজবাড়ী মায়ের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেছেন, প্রতিমা দর্শনে আমাদের মনে যে অভূতপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হয়েছিল, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পূজারী ঠাকুর আমাদিগকে সযত্নে দেবীর চরণামৃত ও প্রসাদ দিলেন। অদূরে দেখলুম একব্যক্তি অতি সঙ্কোচে মন্দির আঙিনার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। পূজারী ঠাকুরের দৃষ্টি সেদিক এড়ালো না, তিনি তাহাকে ডেকে ঠাকুর দর্শন করতে বললেন। অতি বিনীত কণ্ঠে উত্তর এল—"আমি যে নীচ জাত—চাঁড়াল,—আমার কি ঠাকুর দালানে উঠে, ঠাকুর দেখতে আছে?" পূজারী বললেন, "খুব আছে ভাই, মায়ের সব ছেলেই সমান।"

উপরিউক্ত কাহিনীগুলিকে নিছক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোন কোন কাহিনী যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্বশেষ কাহিনীটির মধ্যে

কোন অলৌকিতা নাই, তবে দেবী স্বপ্নে নাস্তিককে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন মাত্র এবং দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাসী করে তুলেছেন। এ কাহিনীটির মূলে হয়ত কিছু সত্য আছে কিন্তু কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান নাই। ভক্তগণ দেবী যে জাগ্রত এ কাহিনী থেকে এই সত্য প্রচার করতে পারেন মাত্র।

প্রথমোক্ত কিংবদন্তটি মেছুনির মরা মাছ বাঁচানোর গল্প। এতে স্পষ্টই মনে হয় যখন দ্বাদশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত থেকে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই সংঘারামটি সমুদ্রের তীরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে! কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগেই এখান থেকে বৌদ্ধগণ চলে যান। ব্রাহ্মণদের প্রতাপ ও প্রাধান্য তখন অপ্রতিহত। তাঁদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ আগে থেকেই জানতেন এখানে এক-কালে বৌদ্ধ-সংঘারাম ছিল। তখন তাঁরা কোন নীচ-জাতীয় লোককে অর্থদ্বারা বশীভূত করে তৎকালের রাজার নিকট উক্ত স্থানের অলৌকিক মাহাত্ম্য শোনায়। রাজা এতে সহজেই আকৃষ্ট হন এবং দেবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ভক্ত হয়ে পড়েন, তৎকালে রাজাকে দেশবাসিগণ দেবতা জ্ঞানে পূজা করত এবং রাজাদেশকে দেবতাদেশ মনে করে তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। অতএব ব্রাহ্মণগণ এই সুযোগে বৌদ্ধ-মন্দিরকে হিন্দু-মন্দিরে পরিণত করেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দিরও এককালে এইরূপ বৌদ্ধ-মন্দির ছিল। এই বৌদ্ধ-মন্দিরকে ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে রাতারাতি হিন্দু-মন্দিরে পরিণত করেন, সে কাহিনী পুরী অঞ্চলে আজো কোথাও কোথাও শোনা যায়। প্রবীণ পাণ্ডাগণকে বেশী কিছু উৎকোচ দিলে আজো নাকি তারা বুদ্ধ-মূর্তিকে একটি গোপন প্রকোষ্ঠে দেখিয়ে থাকেন। আসলে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা —বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক। এ সম্পর্কে প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত গান আছে, তা হোল—

"পুন তা ত্যজিয়া বুদ্ধ অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিন॥"

(চণ্ডীদাসের পদাবলী। রমণীমোহন মল্লিক, ২য় সংস্করণ পৃঃ ৬০। নীলরতন মুখোপাধ্যায় সংস্করণ, পৃঃ ১৮।)

বর্গভীমার মন্দির সম্পর্কে আজ থেকে ৬৬ বছর পূর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের সারসংগ্রহ। রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয় বলেন—

"বর্গভীমার মন্দিব পূর্বে বৌদ্ধ-মন্দির ছিল; ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উহা কালীব মন্দিবে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মহাসমারোহে ঐ মন্দির মধ্যে কালীমূর্তি সংস্থাপিত করেন। এখনও সেইখানে কালীমূর্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুস্তকসমূহে এই মন্দিরেব বর্ণনা করিয়াছেন। সার উইলিয়াম হাণ্টার বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, ইহা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার বিরচিত। এই মন্দির অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে গঠিত; কিরূপে সেই সকল প্রস্তর অত উচ্চে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেস্থানে এই মন্দির সংস্থাপিত, .সস্থান সহর অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড় ও বানের সময় বহুসহস্র সহরবাসী সেখানে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।"

(সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩০৪। পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০)

রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের মতও আমাদের মতের স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। মন্দির সম্পর্কে আরো তথ্য দিয়েছেন "তমলুক মঙ্গল"

রচয়িতা গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর পুস্তিকায়। তিনি লিখেছেন—

"ভীমাদেবীর কথা কি আর স্বয়ং জগদ্ধাত্রী মাতা,
ষট্‌ সংবাদে উক্ত আছে নয়ক তাহা কথার কথা।
তোমার অধিষ্ঠাত্রী তিনি উচ্চ পীঠে আছেন বসি,
যাঁর কৃপাতে বেঁচে ছিল বিপদগ্রস্ত মুনি-ঋষি।"

তারপর লেখক পাদটীকায় লিখেছেন—"মন্দিরটি কতদিনের তাহা কেহই জ্ঞাত বা শ্রুত বলিয়াও বলিতে পারেন নাই। আকৃতি দেখিলে এই মন্দির বৌদ্ধ যুগের বলিয়াই বোধ হয়। বাং ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ৪।৩৭ ঘণ্টার সময় যে ভূমিকম্প হইয়া ৪।৫৭ মিনিট স্থায়ী ছিল তদ্দারায়, বিলাতী শিক্ষিত ইংরাজ শিল্পী নির্মিত ইংরাজ রাজ্যের প্রধান রাজধানীস্থিত মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের গৃহের শীর্ষদেশের চূড়া ও সেণ্টপল গীর্জার চূড়াদি, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার নির্মিত অট্টালিকা ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দু-শিল্পী নির্মিত এই বহু পুরাতন মন্দিরের কোন অংশের অনিষ্ট হয় নাই। কেবল ১২৭৩ সালের ভীষণ ঝটিকায় চূড়ার চক্রটি পড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহা সুবর্ণ নির্মিত হইয়াছে। যাঁহারা অশিক্ষিত বলিয়া ভারতের শিল্পীগণের উপর খড়গহস্ত ও গৌরাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার ভিন্ন পছন্দ করেন না সেই মহানুভবগণ এই বিষয় অনুধাবন করিলে নিশ্চিতই লজ্জিত হইবেন।"

( তমোলুক মঙ্গল, পৃঃ ১৪-১৬ )

এবার বর্গভীমার মন্দিরের বর্ণনা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই মন্দিরের অবস্থান ও নির্মাণের কৌশল দেখলে মনে হয় প্রাচীনকালে এই মন্দিরটি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সংঘরামের অংশবিশেষ ছিল।

মন্দিরের "বাইরের গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের ( Band size ) মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ, এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান

বা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুগণ একা একা নির্জনে উপাসনা করিতেন ; এবং সম্ভবতঃ প্রধান বিহারে শিষ্যগণকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত উপদেশ প্রদান করিতেন। পরে হিন্দুগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া পূর্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র বিহার ( Side Rooms ) ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহারও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্রবিহারের উপর পশ্চিম-দ্বারী করিয়া এক মন্দিররূপে নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থিত এবং উক্ত বেদীর উপরেও মন্দিরটি ৫০ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়।" ( তমোলুক ইতিহাস, পৃঃ ১০৭-১০৯ )

"যেস্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ৩০ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ প্রস্তুত করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর ৯ ফিট ভিতবিশিষ্ট তেহারা ( Three folds form one compact wall ) প্রাচীব ( অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরে ইষ্টক এবং মধ্যে প্রস্তর দ্বারা ) প্রস্তুত পূর্বক ৬০ ফিট উচ্চ করিয়া খিলানাকারের গোল ছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে।"

A statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 65.

তমলুকের ভূ-প্রকৃতি সমতল। সমুদ্রের সন্নিকটে এই নিম্নভূমি সমুদ্রেরই দান। এর কাছাকাছি কোথাও কোন পর্বতাদি নাই। এমতাবস্থায় এই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড হয় স্থলপথে না হয় জলপথে জাহাজে করে তবেই এই স্থানে নীত হয়েছিল, এতে আর আশ্চর্যের কিছু নাই। তবে এই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড যে কিরূপে অত উর্ধ্বে উত্তোলন করে তা' যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, তা' ভাবতে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম হণ্টার সাহেব বলেন—

"Among the objects of note at Tamluk are a temple of great sanctity and of much architectural interest, dedicated to Bargabhima."

Imperial Gazetteer of India, Vol. V.IP. 381.

এই মন্দিরেয় সম্মুখে আর একটি ছোট মন্দির আছে। এর নাম যজ্ঞ-মন্দির। এই মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। কথিত আছে, একটি পতিপুত্রবিহীনা বৃদ্ধা সূত্র প্রস্তুত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্দারাই ইহা প্রস্তুত হয়।

( তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, পৃষ্ঠা ১৯ )

যজ্ঞমন্দির ও মূল মন্দির একটি খিলানদ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহাকে জগমোহন বলে। এছাড়া সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদির জন্য একটি ছাদবিশিষ্ট প্রশস্ত দালান আছে, ইহাকে নাট্যমন্দির বলে। এরপর সম্মুখে দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা ছিল। এই নহবৎখানা এখন আর বর্তমান অবস্থায় নাই। সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে পাকশালার গৃহাদি ও উত্তরে কুণ্ড পুষ্করিণী আছে। এবং দেবীর নীচে, সোপানাবলীর উত্তরে, ভূতনাথ ভৈরব ও তাঁর মন্দির আছে।

মোটামুটিভাবে এই হোল মন্দিরের বর্ণনা। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় ইহা এককালে একটি ছোটখাট বৌদ্ধ সংঘারাম বা সংঘারামের অংশবিশেষ উপসনালয় ছিল।

বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামে অনেক পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে গৃহে বাস করতেন তাকে বিহার বলে। বিহারগুলি সাধারণত একচাল বিশিষ্ট হোত। "সুপন্ন বঙ্ক গেহ।" গড়ুর পাখীর ডানার ন্যায় বাড়ী। আর এইরূপ কতকগুলি গৃহ বা বিহার শুধু বিহার হলেই চলবে না। বিহারের সংলগ্ন 'আরাম' ( বাগান ), 'চেতিয়' ( ভোজনাগার ), 'জন্তাগার' ( স্নানকক্ষ ), 'উপস্থানশালা' ( সভাগৃহ ), 'অগ্নিশালা' ( রন্ধনাগার ), 'কোষ্ঠক' ( ভাণ্ডার গৃহ ),

'বর্চ্চঃকুটি' (পায়খানা), 'পরিবেন' (প্রথমে এর অর্থ ছিল কতকগুলি বিহার অর্থাৎ কক্ষের সমষ্টি। পরে অর্থ হয়েছিল প্রকোষ্ঠ, কলম্বো নগরের "বিদ্যোদয় পরিবেন" অথবা 'মিলিন্দ পঞ্চহো" গ্রন্থে বাণত" সংঘেস্থ পরিবেন।"

উপরিউক্ত সমস্ত গৃহের সমষ্টিকে একসাথে "সংঘরাম" বলে। সাধারণভাবে অর্থ দাঁড়ায় এই—আজকাল আমরা আশ্রম বলতে যেমন সমস্ত কিছুকেই অর্থাৎ লাইব্রেরী, ক্লাসরুম, অফিস, উপাসনালয়, ভোজনালয় প্রভৃতি আশ্রমের সমস্ত অঙ্গগুলিকেই বুঝি। সেকালে তেমনি "সংঘারাম" বলতে একটি সুবৃহৎ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বৌদ্ধমঠকে বুঝাত। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'সংঘারাম' বড় ছোটও ছিল।

এখন এই সিদ্ধান্তের মূলে আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, বর্গভীমার মন্দিরও একটি ছোটখাট "সংঘারাম"। এখনো যদি কোন দর্শক যেয়ে মনোযোগ সহকারে দেখেন, তবে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে মূল মন্দিরের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট গৃহ বা বিহার ছিল। কালের কপোল তলে আজ তার অনেকগুলিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবুও দু'চারটির অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বর্তমানের মূল মন্দিরটিতেই থাকতো বুদ্ধের প্রতিমূর্তি এবং খুব সম্ভব হয়ত প্রধান আচার্যও এইখানে বাস করতেন। ঐটিই হয়ত ছিল 'উপস্থানশালা'। ঐ স্থানেই আশ্রমের সমস্ত শ্রমণগণ মিলিত হয়ে সমবেতভাবে উপাসনা করতেন এবং ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আর মন্দিরের চারপাশে যে ছোট ছোট গৃহগুলি ছিল, তাতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ থাকতেন এবং 'সংঘারামে"র অন্যান্য বিভাগগুলিও থাকত। মূল মন্দিরের উত্তরে কুণ্ড বা পুষ্করিণীর দিকে ভাল করে দেখলে মনে হয়, পূর্বে ঐ পাশে আরো কিছুটি অংশ ছিল যেখানে আশ্রমের অন্যান্য বিভাগগুলি ছিল।

এত উঁচু করে এই মন্দিরটি নির্মাণের একমাত্র কারণ বোধহয় বার বার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে এটিকে রক্ষা করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহানগরী সমুদ্রের জল প্লাবনে ধৌত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাহা ১৭৩৭ কিংবা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা ও জল প্লাবনের অনুরূপ বলে অনেকের ধারণা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক মহাশ্মশানের মত বিরাটভাব পরিগ্রহ করে। এই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে তমলুক সমভূমিতে পরিণত হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৪০০ গৃহের মধ্যে মাত্র ২৭টি অবশিষ্ট ছিল। বাকি সমস্তগুলি জলপ্লাবনে সমুদ্রগর্ভে ভেসে গিয়েছিল। 'Imperial Gazetteer of India Vol. VIII. P. 514 Manshman—History of Bengal, 8th Edition, P. 104. )

এই বৌদ্ধ মন্দিরটি পূর্বে সমুদ্রের ধারে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে ভগবৎ আরাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন প্রাতঃকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ শয্যাত্যাগ করে নীলাম্বুধির বিরাট শান্তরূপ অবলোকন করে ধ্যাননিমগ্ন হতেন। খুব সম্ভবত এর দরজা তখন পূর্বদিকেই ছিল। পরবর্তীকালে যখন এই মন্দিরটিকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করা হোল তখন রাজবাড়ীর দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দুয়ারী করা হলো। কারণ, রাজা যেন প্রতিদিন উঠেই এই দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে পারেন। অন্য কারণ হোল পূর্বদিকে একেবারে গা ঘেঁসেয়ে সমুদ্র থাকার জন্য যাতায়াতের কোন জায়গাই ছিল না! আমরা ছোটবেলা দেখেছি রূপনারায়ণ নদী এই মন্দিরের একেবারে ধার দিয়ে প্রবাহিত হোত। বর্তমানে প্রায় আধ মাইল দূরে চর পড়ে সরে গিয়েছে। আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক 'তমলুকের ইতিহাস' লেখক সেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখেছেন—

"কথিত আছে, ভীম তরঙ্গাঘাতে পাছে দেবীমন্দির বিনষ্ট

হইয়া যায়, সেই জন্য নদীর বেগমান স্রোতঃ মন্দিরের নিকটবর্তী হইয়া মস্তক অবনত করতঃ নীরবে মন্দিরের গাত্র স্পর্শ করে। ইহা অত্যধিক আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবীর এতাদৃশ অনুগ্রহ সত্ত্বেও কালে তাম্রলিপ্তের শৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প, বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিদ্যা-সভ্যতা সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" ( তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ১০২ )

জানিনা এ দেবীর অলৌকিক কেরামতি কিনা, তবে আজ পর্যন্ত যদি ভীম তরঙ্গ রূপনারায়ণে প্রবাহিত হোত, তা'হলে অতীতের এই ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও হয়ত বর্তমান থাকত কিনা সন্দেহ।

কোন কোন ঐতিহাসিক কিন্তু এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁদের মতে স্বয়ং তাম্রধ্বজই এই দেবীমূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখেছেন—

"আরও অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা বর্গভীমা দেবীর ও তাঁহার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্ব সূচিত হয় মাত্র। বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই দেবীমন্দির বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন যে, বৌদ্ধযুগের পর এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে—তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।" ( তমলুকের ইতিহাস—পৃষ্ঠা, ১০০ )

বর্গভীমাকে অনেকে চণ্ডীগ্রন্থোক্ত ভীমা দেবী বলে মনে করেন। ৫১ পীঠের মধ্যে তমলুকের বর্গভীমাও একটি পীঠস্থান এই ধারণা আজো অনেকের আছে। কিছুদিন আগে পি. এম বাকচি-র পঞ্জিকাতে তমলুকের এই দেবীকে একটি পীঠদেবী বলে উল্লেখ দেখেছিলাম। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই দেবীর মূর্তি একটি প্রস্তরের সম্মুখভাগ খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। এই মূর্তির গঠন উগ্রতারা মূর্তির অনুরূপ। প্রতিকৃতিটি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত। এরূপভাবে খোদাই করা প্রতিমূর্তি সচরাচর বড় একটি দেখা যায় না। এই দেবীর ধ্যান ও পূজাদি যোগিনী মন্ত্র ও নীল-তন্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়।

মার্কাণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যে লেখা আছে—"ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" এই শ্লোক থেকে মনে হয় ইহা বোধহয় বর্গভীমা দেবীর সম্পর্কেই লিখিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র শ্লোকটি পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় ইহা হিমাচল-বাসিনী কোন ভীমাদেবীর উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হোল—

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৬৬ ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥"

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ, মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, পৃষ্ঠা, ১৪৫

(পুনর্বার যখন আমি মুনিদিগের রক্ষার জন্য হিমাচলে ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে ক্ষয় বা নাশ করিব, তখন মুনি সকল নম্রমূর্তি হইয়া আমার স্তব করিবেন; এই জন্য আমার ভীমাদেবী এই নাম বিখ্যাত হইবে।)

সতীরবাম গুলফা যেখানে পড়েছিল সেখানে ভীমারূপা এক দেবীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই দেবী তমলুকের নয়। বিভাসেই এই তীর্থ অবস্থিত। এ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র রায় "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে লিখেছেন—

"বিভাসেতে বাম গুলফা ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০ ॥"

(সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও নূতন কলিকাতা ইলেকৃট্রিক মেসিন যন্ত্রে বাংলা ১৩১৪ সালে মুদ্রিত। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা, ১৪) কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তমলুকের এই দেবী সম্পর্কে লিখেছেন—

"গোকুলে গোমতীনামা তাম্রলিপ্তে (তমলুকে) বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।"

( অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত "প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ৭ ও ৩০ পৃষ্ঠা। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী।" )

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশত বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ( যাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা = ১৪৬৬ ) মুকুন্দরামের এই উক্তি থেকে মনে হয় কবি হিমাচলবাসিনী ভীমাদেবী থেকে স্বতন্ত্র বুঝাবার জন্য তিনি 'বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাই বলে তিনি তমলুকের ভীমাদেবীকে ৫১ পীঠের এক পীঠ বলে কোথাও বলেন নি।

আমার নিজগ্রাম বরগোদায় দেবী বর্গীশ্বরী আছেন। প্রবাদ ইনি নাকি তমলুকের বর্গভীমার ভগ্নি। একটি সুবর্ণময় নৌকার দু'পাশে দু'জন দেবী আরোহণ করে আছেন। বরগোদা তমলুক থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে একটি সুবৃহৎ ঢিপি আছে। অনেক প্রাচীন নিদর্শন এখান থেকে আমি আবিষ্কার করেছি। পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গীগণ এসে জঙ্গলের মধ্যে দেবীকে দেখতে পান। প্রবাদ, বর্গীরা নাকি এই দেবীর পূজা করে তবেই লুণ্ঠন করতে বেরুতেন। বর্গীদের আরাধিত ঈশ্বরী তাই বর্গীশ্বরী নাম। তমলুকের রাজা এই দেবীর পূজার্চনার জন্য কয়েক বিঘা জমি ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন। দেবীর কোন মন্দির পূর্বে ছিল না। মাটির বাড়ীতেই দেবী থাকিতেন। বর্তমান গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ একটি ছোট পাকার মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। এই দেবীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম বরগোদা হয়েছে। তাই বলে বর্গীশ্বরী শুধু বরগোদারই আরাধ্যা দেবী নন। আশপাশের সাত গ্রামের অধিবাসীগণ এই দেবীকে তাঁদের আরাধ্যাদেবী বলে দাবী করে থাকেন। পূর্বকালে এই স্থানের সাথে তমলুকের বিশেষ ভাবে সংযোগ ছিল বলে অনুমিত হয়। 'বড়খাল' বলে একটি বৃহৎ খালের চিহ্ন আজো এই স্থানের সন্নিকটে

আছে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। যাই হোক বর্গভীমা ও বর্গীশ্বরীর মধ্যে যে একটি বিশেষ রহস্য নিহিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্গীশ্বরীর মধ্যে যে একটি বিশেষ রহস্য নিহিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্গীশ্বরীর মূর্তিব পাশে একটি অশ্বপৃষ্ঠে বীরপুরুষের মূর্তি খোদাই করা আছে। অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটি অকালে সবিশেষ জানা সম্ভব হোত। তবুও এই মূর্তিটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

## ॥ তাম্রলিপ্তে জৈনধর্ম ॥

বৈদিক যুগেব শেষভাগ ভারতের ধর্মজগতে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল। বৈদিক ধর্ম তখন অত্যন্ত জটিল, নীরস ও সাধাবণেব দুর্বোধ্য অনুষ্ঠান বহুল কর্মবিধিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় সমাজের উপর প্রভুত্ব করে এসেছিলেন, তাঁদের সে প্রভুত্ব ক্রমে হীনপ্রভ হয়ে উঠেছিল। তৎকালে ভারতের এই বেদবিরোধী ধর্মবিপ্লবের নায়ক ছিলেন ক্ষত্রিয়। সুতরাং একে একাধারে ক্রিয়াসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের এবং ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় সমাজের বিদ্রোহ বলা যেতে পারে।

বেদবিবোধী যে দু'টি প্রধান ধর্মমত তৎকালে ভারতে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান। তাম্রলিপ্তে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধপ্রভাবের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এবার জৈন ধর্মের কথা আলোচনা করব। জৈনদের মতে ঋষভদেব থেকে পর পর চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রায় সকলের সাথেই বাঙালীর সংযোগ ঘটেছিল। জৈন ধর্মের শেষ দুই তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। পার্শ্বনাথ কাশীর রাজবংশে খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। পার্শ্বনাথই জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এই পার্শ্বনাথ

স্বামী ৭৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মানভূম জেলাস্থিত সমেত শিখরে ( বর্তমান পরেশনাথ পাহাড় ) মোক্ষ লাভ করেন। পার্শ্বনাথের পর যে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয় তিনি মহাবীর নাম পরিচিত। মহাবীরের আসল নাম ছিল দয়াবতীর বর্ধমান। ইনি বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রকূলে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভবতঃ ইনি বুদ্ধদেবের থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

এই মহাবীর সম্পর্কে প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে বর্দ্ধমান মহাবীর রাঢ় প্রদেশে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর প্রতি বড় অসদ্ব্যবহার করেছিল, কোন সময়ে বাংলা দেশে যে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করে তা' সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না। দিব্যাবদানে অশোকের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর জৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পতিত বুদ্ধদেবের চিত্র এঁকেছে শুনে তিনি নাকি পাটলিপুত্রের সমস্ত জৈনগণকে হত্যা করে ছিলেন। এই গল্পটির মূলে কতদূর সত্য আছে তা' সঠিকভাবে জানা যায় না। এই থেকে অশোকের সময়ে উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায় বর্তমান ছিল এরূপ অনুমান করা অসম্ভব।

অশোকের সময় বাংলা দেশে জৈন প্রভাব না থাকলেও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে বঙ্গে জৈনধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্র মতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর ( চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু ) শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠিত করেন কালক্রমে তা' চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। এর তিনটির নাম তাম্রলিপ্তিক ( তমলুক ), কোটীবর্ষীয় ( দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওকোট পরগণা ), ( পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় মালদহ ও বগুড়া জেলা ) এবং চতুর্থটির নাম দাসীকর্বটিয় ( সম্ভবতঃ মানভূম জেলা )[১]। এই তিনটি যে বাংলার

১ বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ, পৃষ্ঠা, ৪০৬।

তিনটি সুপরিচিত নগরীর নাম থেকে উদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নাই। কল্পসূত্রোক্ত এই শাখাগুলি কাল্পনিক নয়, সত্য সত্যই ছিল। কারণ, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং উত্তরবঙ্গ ( পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ ) ও দক্ষিণবঙ্গে ( তাম্রলিপ্ত ) যে খুব প্রাচীন কাল থেকেই জৈন সম্প্রদায় প্রসার লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে যে জৈন প্রভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বা তার পূর্বে ঐ জায়গায় একটি জৈন বিহার ছিল। হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকেও জানা যায় তাঁর সময়ে বাংলা দেশে দিগম্বর জৈনের সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে যে জৈনদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এককালে প্রবল আকার ধারণ করেছিল, তা' কয়েকটি জৈনমূর্তি থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। মেদিনীপুর জেলার বরভূমে ঋষভনাথের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এতে কেন্দ্রস্থলে মূল মূর্তির দুই পাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি ; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। ( বাংলা দেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠাঃ ১৬১ )

এছাড়া আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত উত্তররায়বাড় গ্রামে বীরবর রাজা সুরেশচন্দ্র রায় সাহিত্য বিনোদ মহাশয়ের প্রাচীন গড়ে একটি মন্দিরে আজো অবিকল অনুরূপ ভাবে দণ্ডায়মান একটি মূর্তি নিজে দেখে এসেছি। এই মূর্তি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়েছি।

তমলুকের নিভৃত পল্লীতে অনুসন্ধান করলে আরো বহু জৈনমূর্তি পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাম্রলিপ্তিয় সম্প্রদায় তৎকালে বিস্তৃত তাম্রলি রাজ্যের জৈনধর্মকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিলেন, এ অনুমান মিথ্যে নয়।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহিষাদলের আগষ্ট বিপ্লবের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—" ...এই আক্রমণে তিনি সবচেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিলেন, সরকারপুষ্ট মহিষাদলের রাজার কাছ থেকে এবং ধনিক শ্রেণীদের কাছ থেকে। তাই ধনিকশ্রেণীর উপর তাঁর এক বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হয়। জাতীয় সরকার গঠিত হলে তাঁর নির্দেশক্রমে ধনীদের ওপর একটা স্বতন্ত্র কর ধার্য হয়। সুশীলচন্দ্রের চেষ্টায় নতুন করে আবার আজাদ-সরকার গঠিত হয়। এবং ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি এই আজাদ সরকার চলতে থাকে। ইংরেজ-সরকার তাঁর গ্রেফ্‌তারের জন্য পরওয়ানা জারি করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরতে পারে না। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি স্বয়ং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং আজাদ সরকার ভেঙ্গে দেন।

যদিও স্বেচ্ছায় তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তবুও পুলিশ এই দুর্বিনীত বিপ্লবীর শাস্তির বহর এতটুকু কমাবার বাসনা দেখায় না। এই দুর্বিনীত বিপ্লবীকে চরম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয় এবং তার ফলে সাড়ে-সাত বৎসর তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।" পৃঃ ২৭

আগষ্ট আন্দোলন দমন করতে সরকার নারীর উপর যে কিরূপ পাশবিক অত্যাচার করেছিল তা' দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর" প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—" পুলিশের অত্যাচারের নিকট নারী ও শিশু বাদ পড়ে নাই। আসামী গ্রেপ্তার করিবার সন্ধানে আসিয়া পুলিশ বদ্ধগৃহে গহনা-পত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, বহু শত গৃহে পুলিশ আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। নির্য্যাতনের যেদিকটি সবচেয়ে কুৎসিত তাহা হইল নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার। নলিনীকান্ত রাহা নামক জনৈক পুলিশ অফিসারের প্ররোচনায় সৈন্য ও পুলিশ মহিষাদল ও অন্যান্য স্থানে নারীদের ধর্ষিত করে।

এই সমস্ত ধর্ষিতা নারীরা যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা হইতে অত্যাচারের জঘন্য দিকটি আরও বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ এত নির্ম্মম হইয়াছিল যে অন্তসত্বা নারীও তাহাদের কবল হইতে রেহাই পায় নাই। এমন কি পুলিশের বারংবার ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। নারীদের উপর অত্যাচার চালাইয়া বৃটিশ সরকারের পদলেহনকারী দেশীয় লোকেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। মহিষাদলেই ৭৪ জন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়।...ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করিত পুলিশ ও সৈন্যেরা শীতের রাত্রিতে গ্রামবাসীদের পুষ্করিণীতে উলঙ্গ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দিত, উঠিতে চেষ্টা করিলে বেওনেটের খোঁচা দিত, চাবুক দিয়া প্রহার করিত। পুলিশের অফিসারদের রুলের গুঁতা সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িত। তখন রুলটি মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া সবেগে ঘুরাইয়া দিত। এই অত্যাচারের পদ্ধতিটি আবিষ্কার করিয়াছিল জনৈক ইউরোপীয় অফিসার। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ৬ শত সৈন্য মহিষাদল থানার মাস্মুড়িয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম ঘেরাও করিয়া গৃহস্থদের বাড়ী আক্রমণ করে ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ঐ দিনেই সৈন্যেরা ৪৬টি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। মহাত্মা গান্ধী এই সমস্ত ধর্ষিতা নারীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে একটিও ধর্ষিতা নারী পরিত্যক্ত হয় নাই। তাহাদের যথাযথ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা প্রশংসার বিষয়।" পল্লীজীবন পত্রিকা, ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ৪০শ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ। ১৩৬১ সাল, ইংরেজী ১৯৫৪।

এই অধ্যায়ের আমরা আর বেশী বিস্তৃতি করব না। আরম্ভেই বলেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রস্তুত করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের পরিকল্পনা করা ছাড়া কোন মতেই সম্ভব

নয়। পরিশেষে আমরা মেদিনীপুরবাসীদের প্রতি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মহাত্মাজী ও জহরলাল নেহেরু যে পত্র দিয়ে অভিনন্দন করেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করে এই অধ্যায় শেষ করব।

**॥ মহাত্মা গান্ধীর চিঠি ॥**

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের প্রতি

আপনাদের দেশে না যাইয়া যতদূর সম্ভব আমি আপনাদের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছি। আপনারা যেরূপ সাহস ও ধৈর্য সহকারে নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানইতেছি। এইরূপ সহিষ্ণুতার ফলেই নবজীবনসম্পন্ন নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। বৈষয়িক সম্পত্তির দ্বারা পরাধীনতার ক্ষতিপূরণ হয় না। অতীব আনন্দের কথা এই যে, আপনারা স্বাধীনতা ত্যাগ না করিয়া বৈষয়িক সম্পত্তি ত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। আশা করি, আপনারা লবণ তৈয়ার কর্তব্য বিস্মৃত হইবেন না।

এম, কে, গান্ধী

এলাহাবাদ ২-২-৩

মেদিনীপুর সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলালের চিঠি

স্বাধীনতা আমরা একদিন লাভ করিবই—তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রামের ধূলিজাল যখন বিদূরিত হইবে, তখন আমরা অনেক ছোটখাটো ঘটনার কথা ভুলিয়া যাইব কিন্তু ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ ভারতের নারীরা যে বীরত্ব ও ত্যাগ দেখাইয়াছেন, আমরা কদাপি সেই বীরত্ব ও ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণগুলি ভুলিতে পারিব না। এবং মেদিনীপুর জেলায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারিব না।

এলাহাবাদ, জওহরলাল নেহেরু

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

১৩৩৮ সালের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এই দু'টি পত্র সংগ্রহ করে দেওয়া হোল। পৃষ্ঠাঃ ১৮১ ও ১৮২।

## দশম অধ্যায়

# তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর, একথা আমি এই পুস্তকের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমি তমলুক ও এর আশপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর কথা আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করে আসছি, তা' যে মিথ্যে নয় একথা প্রমাণিত হবে। তৎকালে তাম্রলিপ্তের সাথে যোগাযোগ ছিল সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত। রোম, গ্রীস, ইরাণ, মিশর-এর সাথে ত এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ অপ্রতিহত ছিলই। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলে রাখছি যে সব নিদর্শন ও আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করব, তার অনেকগুলিই আজো তমলুক ও তার আশপাশের গ্রাম সমূহে বর্তমান আছে এবং সেগুলি উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তাম্রলিপ্তে যেসব প্রাচীন নিদর্শন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তার সর্বপ্রথম উল্লেখ আমি যেখান থেকে পেয়েছি, তা' এইস্থানে উদ্ধৃত করছি। তৎকালের বিখ্যাত মাসিক "সাহিত্য" পত্রিকায় "প্রাচীন তাম্রলিপ্ত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা আছে—

"১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রূপনারায়ণ পূর্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হয়। সেই সময় ভূগর্ভ হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্তি ( Terra cotta ) বাহির হইয়াছিল। সে সকল স্থানীয়

পাঠাগারে সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার উইল্‌সন ও মহকুমার প্রধান কর্মচারী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার মধ্যে কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সচ্ছিদ্র, সে সকলের উপর কিছুই লিখিত ছিল না—কেবল পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এই সকল মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটি বৃহৎ সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তরাজগণের সময়ের—তাহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। গুপ্তরাজারা লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ও কলিকাতায় অন্য অনেক প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ একটি ক্ষুদ্রতর স্বর্ণমুদ্রায় লিখিত অক্ষর গুলি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে মোগল সম্রাটদিগের সময়ের কতকগুলি মুদ্রাও ছিল। আরঙ্গজীব তাম্রলিপ্ত নগরে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাও এখন নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

সেই সময় যে সকল মৃৎমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে একটি মারের—মার বৌদ্ধদিগের মতে কতকটা খ্রীষ্টানদিগের শয়তানের মত; একটি বুদ্ধ জননী মায়াদেবীর—হস্তিদন্তের আকারে বুদ্ধদেব ইহারই গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বুদ্ধ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে, বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃহত্যাগী মন সংসারে বদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে যে সকল বিলাস চতুরা সুন্দরী দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যেও দুই জনের মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল।" পৃঃ ৪৩০, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১৩০৪।

উপরে আমরা যে অংশটি উদ্ধৃত করলাম, এই অংশটি ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল গুপ্তের "প্রাচীন তাম্রলিপ্ত" প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অংশ। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এটি সংক্ষিপ্ত

আকারে প্রকাশ করেছিলেন। উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত যে সচ্ছিদ্র মুদ্রাগুলির উল্লেখ লেখক করেছেন, কোন কোন ঐতিহাসিক ঐ মুদ্রাগুলিকে তমলুকের আদিম রাজাদের বলে অনুমান করেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—"সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রুত সংঘর্ষ হইয়াছিল।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ১১০১।

এছাড়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র কতকগুলি "পুরাণ" নামক মুদ্রা তমলুকে পেয়েছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রাগুলি বহু প্রাচীন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে সম্রাট কণিষ্কের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। "এছাড়া কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্ত-রাজন্যের মুদ্রা দেখিলে তমলুকের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ১১০২।

তমলুকে আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব লিখেছেন,—"তমোলুক যে বৌদ্ধ বন্দর ছিল, তাহার আজ পর্যন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়; এবং জনৈক ইউরোপীয়ান্ কর্মচারী ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন যে 'তমলুক বাস্তবিকই বৌদ্ধ বন্দর ও তথায় পূর্ব্বাঞ্চলের বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল, এবং অনেক সুন্দর মঠ ছিল।'[১]

তমোলুক ইতিহাস লেখক ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় তাঁর ইতিহাসে একস্থানে লিখেছেন—"বাস্তবিকই নদের ভাঙ্গনে ও পুষ্করিণ্যাদি খনন কালে ১০।১৫ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে বহুসংখ্যক কূপ, প্রস্তর নির্মিত ভগ্নবিশিষ্ট স্তম্ভাদি বৌদ্ধদিগের সমকালীন প্রাচীন স্বর্ণ,

---

১ "—Even at this day the ancient Buddhist port ( Tamluk ) bears traces of its origin. In 1781 an English official reported to Government, 'that Tumluk was originally a Buddhist town and a large emporium of eastern trades and had many fine monasteries.'—Mr. Vansittart's report, Mr. H. Y. Baybey's M. S. Memorandum, P. 128. O. R.—Hunter's orissa. Vol. I. P. 310

রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এবং মৃত্তিকা নির্মিত বুদ্ধদেবের ও তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রতিমূর্তি আদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ইহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। ঐ সকল মুদ্রা ( coins ) এসিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরীক্ষায় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ-রাজাদের মুদ্রা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বেহাটের ( Behat ) মুদ্রার অনুরূপ।" [১] পৃঃ ৬৮

নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধ কুমার ভৌমিক মহাশয় তাঁর রচিত "মেদিনীপুর কাহিনী" পুস্তকে "অবলুপ্ত তাম্রলিপ্ত" প্রবন্ধে আর একটি বৌদ্ধযুগের মৃৎফলক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সে কাহিনীটি তাঁর কথাতেই প্রকাশ করছি—একটি বিশেষ পোড়ামাটির ফলকে প্রকাণ্ড গাছের ছবির সঙ্গে আছে চারটি বিরাট হাতী আর গাছের উপর আছে তু'টি বাঁদর; জাতকের কাহিনীর এ এক মূর্ত অভিব্যক্তি:

এক সময় বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের পাশে গভীর বনে ছয় দাঁত-ওয়ালা বিরাট এক শ্বেতহস্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দাঁতের আধিক্যে আর চেহারার গুণে ঐ অঞ্চলের সমস্ত হাতীগুলোর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব করার সুযোগ ঘটে। ঐ সময় বোধিসত্ত্বের তু'জন স্ত্রী ছিল—একজনের নাম মহাসুভদ্দা অন্যজনের নাম চুল্লসুভদ্দা। তু'জন স্ত্রীকে বোধিসত্ত্ব খুব ভালবাসতেন। তু'সতীনেও ছিল বেশ ভাব—কিন্তু শেষে কোন কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হ'ল। ছোট স্ত্রী চুল্লসুভদ্দার ধারণা হ'ল, 'স্বামী বুঝি বড় স্ত্রী অর্থাৎ মহাসুভদ্দাকে বেশী ভালবাসেন।' এই সন্দেহে তার মনে অকারণ খেদ জন্মাল—নষ্ট হয়ে গেল তার স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, ভক্তি আর শ্রদ্ধা। কিভাবে স্বামীর উপর প্রতিহিংসা নেওয়া যায়

---

১ From the proceedings, Asiatic Society of Bengal, for August, 1882.

এই ভেবে চিন্তে সে সারা হ'ল। শেষে একদিন সে মারা গেল। পরের জন্মে সে এক অপূর্ব সুন্দরা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। কাশীরাজের সঙ্গে তার হ'ল বিবাহ। চুল্লসুভদ্দা এখন কাশীরাজের রাণী। বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপে, তার গত জন্মের অনুশোচনার প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টায় সে একদিন এক দুর্দান্ত ব্যাধকে ডেকে পাঠাল—'তাকে যেতে হবে হিমালয়ের পাদদেশের গভীর অরণ্যে —সেই শ্বেতহস্তীকে বধ করে তার উজ্জ্বল ছয়টি দাঁত আনতে। তার হাতে দিল ধারাল করাত যাতে করে সে দাঁতগুলো কাটবে।'

রাণীর আদেশ। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে ব্যাধ ছুটল ঐ গভীর জঙ্গলে—সঙ্গে তীর-ধনুক, আর দাঁত কাটার জন্য করাত। অপূর্ব শ্বেতহস্তী দেখে ব্যাধ বিমুগ্ধ হ'ল—কিন্তু কি বা তার উপায়? তাকে ঐ দেবোপম হস্তীকে বধ করে তার ঐ সুন্দর ছয়টি দাঁতকে কেটে নিয়ে যেতে হবে রাণীকে দেওয়ার জন্য। অনেক চিন্তা করে ব্যাধ শেষে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করল ঐ হাতীর উদ্দেশ্যে। শরাহত হাতী একবার চেয়ে দেখল—দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যাধ, হাতে করাত আর তীর-ধনুক। ইচ্ছা করলে সে ঐ ব্যাধকে শুঁড়ে তুলে আঘাত করতে পারত। কিন্তু ব্যাধের গায়ে ছিল সন্ন্যাসীর পবিত্র গৈরিক বস্ত্র। হাতীটি নিরস্ত হ'ল। সে ধীরে ধীরে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে। ব্যাধ অকপটে সব কথাই খুলে বলে। রাণীর আদেশে বাধ্য হয়ে তাকে একাজ করতে হয়েছে। তখন ধীরে ধীরে বোধিসত্ত্বের চুল্লসুভদ্দার কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল তার বাসনাকে—তার প্রতিহিংসাকে। প্রতিহিংসার জন্যেই ত সে আজ কাশীরাজের রাণী। আর ব্যাধের হাতে এই তীক্ষ্ণ করাত। ব্যাধের অবস্থা দেখে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়ে করাতটা চেয়ে নিলে— তারপর ধীরে ধীরে একের পর এক সবগুলি দাঁতই কেটে দিলে ব্যাধের হাতে। হাতীর মৃত্যু হ'ল সেখানে। অবাক বিস্ময়ে ব্যাধ চেয়ে থাকে—তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

মহারাণীর হাতে দাঁতগুলো দিয়ে ব্যাধ দূরে দাঁড়ায়। রাণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল অতীত জন্মের কথা—মনে পড়ল তার বোধিসত্ত্বকে—তার ভালবাসা-প্রেম-স্মৃতিকে। ব্যাধ ধীরে ধীরে সব কথাই খুলে বলে—কেমন করে সে গৈরিক বস্ত্র পরে হাতীকে প্রতারিত ক'রে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছে, কেমন করে মৃত্যুপথ-যাত্রী শ্বেতহস্তী শুঁড়ের সাহায্যে ব্যাধের হাতের করাত কেড়ে নিয়ে এক এক করে ছয়টি দাঁত কেটে দিয়েছে। তারপর, রাণী আর ঠিক থাকতে পারলে না। তাঁর দু'চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়ে—শেষে তিনিও গড়িয়ে পড়লেন সিংহাসনে।

এইখানেই কাহিনীর শেষ।

তমলুকে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে সেই ছ'দাঁতওয়ালা হাতীর করুণ আত্মবিসর্জনের ছবি মূর্ত হয়ে রয়েছে—ঠিক অনুরূপ এক ছবি আছে সাঁচি স্তূপে। পৃঃ ১১—১৫

প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ও অনুসন্ধানীদের গবেষণা কার্যের সুবিধার্থে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ব সার্কেলের পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে বর্তমান তমলুক সহরের নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে খনন কার্য চালান হয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি-সংস্কৃতির বহু লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

দু'মাস ধরে খনন কাজ চালানোর ফলে তমলুকে নিওলিথিক যুগের প্রস্তর নির্মিত নানাপ্রকার দ্রব্য, মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির নানাবিধ জিনিষ, ঢালাই করা তামার মুদ্রা, বিচিত্র খোলামকুচি, মূল্যবান প্রস্তরের বিভিন্ন রকমের গুটিকা, নানাপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, দেশী বিদেশী নানাপ্রকার মৃৎপাত্র, খেলনা, জীবজন্তুর মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

গৌরবময় তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে কিরূপ ছিল তার কিছুটা পরিচয় এই সকল দ্রব্য থেকে জানা যাবে।

এই খননের ফলে একটি মাত্র গহ্বর থেকে প্রাচীনতম যুগের কিছু

পরিচয় পাওয়া গেছে। ঐ যুগের অবসান ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। বুঝা যায় যে, সে যুগে আধাপোড়া মাটির ও প্রস্তরের দ্রব্য ব্যবহৃত হোত।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে মৌর্য ও সুঙ্গ যুগ। উহা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই যুগে সুন্দর সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোড়ামাটির দ্রব্য ও মূর্তি ব্যবহৃত হোত। মৌর্যযুগে যে উৎকৃষ্ট কাল পালিশ করা দ্রব্য ব্যবহৃত হোত তার সাথে ঐগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুঙ্গ যুগের শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তার চমৎকার নিদর্শন হচ্ছে ঐ সব পোড়া মাটির দ্রব্য। এ পর্যন্ত ভারতে যেসব উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির দ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলির তুলনায় ঐ সকল দ্রব্যের কয়েকটি কোনক্রমে হীন নহে, বরং অনেকাংশে সমতুল্য। দুটি পরিখার মধ্যে যে কয়েকটি তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি এই দ্বিতীয় যুগের বলে অনুমিত হয়।

তাম্রলিপ্ত সংস্কৃতির তৃতীয় যুগ হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ। এই যুগে তাম্রলিপ্তি বন্দরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্য সাগরীয় দেশ সমূহের সাথে ভারতের বাণিজ্য চলত। এই যুগে রোম দেশীয় কতকগুলি বন্দুক খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হোত। তমলুকে খননের সময় এই বন্দুক প্রচুর পাওয়া গেছে। রোম দেশীয় একটি পিচকারীও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমান তমলুক সহরের দক্ষিণাঞ্চলের দু'টি পরিখা খনন করে জানা যায় যে, সেখানে খ্রীষ্টযুগে লোকে বসবাস আরম্ভ করে এবং অনুমান হয় এই যুগে তাম্রলিপ্তির দক্ষিণাঞ্চলে নূতন উপকণ্ঠ গড়ে উঠেছিল। একটি পরিখায় পাকা ঘাটযুক্ত পুষ্করিণী এবং আর একটি পরিখায় একটি কূপ ও গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই যুগে মূল্যবান প্রস্তরের জপমালা ব্যবহৃত হোত।

তাম্রলিপ্ত সংস্কৃতির চতুর্থ যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর যেসব পোড়ামাটির

দ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলিতে কুষাণ ও গুপ্তপ্রভাব রয়েছে। একটি চমৎকার পোড়ামাটির মূর্তির শুধু নিম্নাংশ পাওয়া গেছে। এর গঠন সৌন্দর্য মনোরম। এখানকার গুপ্তযুগের পরবর্তী ইতিহাস সন্ধান করা অসুবিধাজনক।

তাম্রলিপ্তির প্রথম যুগের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি পুষ্করিণী খননের ফলে সে যুগের নিদর্শনগুলি আর পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় লোকেরা পুষ্করিণী খননকালে পাল ও সেন ভাস্কর্যের যে সব নিদেশ বিক্ষিপ্তভাবে পাচ্ছেন, তা থেকে অজ্ঞাত যুগের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শেষ যুগের ( অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দার ) ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐ যুগের নানা তথ্য জানা যায়। এইযুগে স্থানীয় বাজা ও লবণ কারখানার মালিকগণ অনেকগুলি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বর্তমান তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সম্বন্ধে এই হোল সরকারী রিপোর্ট। ১৩৬২ সালের 'হিমাদ্রী' ও "নীহার" পত্রিকা থেকে এইসব অংশ সম্পাদিত হোল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নিদর্শনের কোন ফটো জনপ্রিয় পত্রিকা সমূহে আজো প্রকাশিত হয়নি। যদি কোন রসিক পাঠক এগুলি দেখতে চান, তা' হলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। পূর্ব সার্কেলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত আছে। এই বিভাগ থেকে যতদূর জানি আজ পর্যন্ত কোন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়নি বা গবেষণার সূত্রপাতও করা হয়নি। পরিতাপের বিষয় এই তমলুকের অধিবাসীগণকে এইসব নিদর্শন দেখানোরও বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত তখন করা হয়নি।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যাঁর গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি ১৩৬০ সালের দিকে এসেছিলেন "তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে" অধ্যাপনা করার জন্য। সেই সময় তিনি বর্তমান তমলুক ও এর আশপাশের

বিভিন্ন স্থানে নিজে যেয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে নূতন আলোকপাত হয়েছে। তাঁর আবিষ্কার একদিকে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি তথ্যবহুল। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টির ফলে সামান্য পোড়ামাটির মূর্তিটিও বিরাট ইতিহাস বহন করে এনেছে। আর সেই সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, বাংলার সুপ্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত আজ মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ভূগর্ভে নিহিত।

তিনি অসংখ্য প্রাচীন মৃন্ময়মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সব মূর্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এই মূর্তিসমূহের অধিকাংশই পোড়ামাটির (terracotta) এবং কয়েকটি কাঁচা মাটির (clay)। এইগুলি দেখলে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের শিল্পকলা কতদূর উৎকর্ষলাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে এই বন্দরে যে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম এবং অনুভূতিপ্রবণ সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতের খুব কমস্থানেই এই ধরনের সভ্যতার তুলনা মেলে।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত কয়েকটি নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

"যক্ষিণী—শুঙ্গযুগ। ভগ্নমূর্তিদ্বয়ের সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিমুখ বিশিষ্ট মূর্তি। সম্ভবতঃ কোন বৃহৎ মৃৎকুম্ভের মুখাবরণী। মূর্তির যুগল মস্তকে রোমানধরণের শিরস্ত্রাণ পরা। মূর্তিটি দ্বিমুখ বিশিষ্ট প্রাচীন রোমান যুদ্ধদেবতা জানুসের (Janus) অনুরূপ। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন মিশর, গ্রীস, এবং রোমের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মূর্তিটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১ম থেকে ২য় শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি। মূর্তির আঙ্গিক বিচারে মনে হয় কোন শক যোদ্ধার

প্রতিমূর্তি। যোদ্ধার বলিষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ আকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপবিষ্ট গ্রীক মূর্তি। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম—২য় শতাব্দী। চতুষ্কোণ মৃৎফলক। মৌর্যযুগ। চিত্রের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ কোন পৌরাণিক (হিন্দু অথবা বৌদ্ধ) অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান।" যুগান্তর, ১০ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬০।

এই মূর্তিগুলির উপর দাশগুপ্ত মশাই যে আলোচনা করেছেন, তা' এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন। এই আলোচনা থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক প্রাচীন উল্লেখের সত্যতা প্রমাণিত হয়। "তাম্রলিপ্তের শিল্পবস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এককালে এই বন্দর যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলনভূমি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তমলুকের বৈদেশিক মূর্তিগুলি প্রমাণ করছে যে, প্রাচীন বাংলার সংগে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বৈদেশিক সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিক বন্দরের যে বিপুল খ্যাতির কথা জানতে পারি তারই পরিপূর্ণ সমর্থন করে তমলুকের অসংখ্য প্রত্নবস্তু। প্রাচীন বাঙালী নাবিকগণের সপ্তসাগর অতিক্রমের কথা আজ অলীক কল্পনা মাত্র নয়। প্রায় দুই হাজার বছর আগে বাংলার সঙ্গে সুদূর ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, তা' আজ নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তমলুকের পোড়ামাটির মূর্তি ও মৃৎপাত্র সমূহ বিভিন্ন যুগে নির্মিত। শিল্পরীতির বিচারে এইগুলিকে মৌর্যপূর্ব যুগ, মৌর্যযুগ, শুঙ্গযুগ, কান্ব-সাতবাহন যুগ, কুষাণযুগ, গুপ্তযুগ, পালযুগ এবং মধ্য-যুগের নির্দেশ করা হয়েছে। মৃন্ময় মনুষ্য—মূর্তিসমূহের মধুর লালিত্য এবং সূক্ষ্মভাব-মাধুর্য সহজেই লক্ষণীয়। তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি প্রাচীন বাঙালীর অতুলনীয় সংস্কৃতি গরিমাকেই প্রমাণিত করে। এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমকালীন উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা

থেকে কতকটা ভিন্ন।······বহু হারানো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই রূপনারায়ণ নদীর উপত্যকায়। প্রাচীন ট্রয়, ক্রীট, বোখাস্‌কোই এবং বাবিলনের মত হয়ত এরও তথ্য লিখিত হবে স্বর্ণাক্ষরে।" যুগান্তর, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬০।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারা সুপ্রাচীন পুণ্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়) এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) থেকে এমন কয়েকটি আদিম আঙ্গিকাবিশিষ্ট মৃন্ময় মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সৃষ্টিকাল মৌর্যপূর্ব যুগ বলে মনে করা হয়। তমলুকের দু'টি ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্তির বিচিত্র শিলাশৈলী সহজেই আমাদের উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুল্লির এক শ্রেণীর প্রাগৈতিহাসিক পোড়ামাটির মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৌর্যশুঙ্গ যুগ এবং তৎপরবর্তী কালে বাংলার উৎকৃষ্ট শিল্প-রীতির অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড়, বানগড়, তমলুক, তিলদা, (মেদিনীপুর), পোখরান ইত্যাদি স্থানে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপটি সম্ভবত প্রাচীন যবদ্বীপের লোরো জোংগ্রাং, চণ্ডি সেবু এবং বোরোবুদরের বৌদ্ধ হর্ম্যরাজির গঠন পদ্ধতিকে প্রভাম্বিত করেছিল।

তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটির মূর্তিসমূহ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এইখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের মূর্তি এবং মৃৎপাত্রসমূহ প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্টই আলোকপাত করেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আবিষ্কৃত গ্রীক, রোমান এবং মিশরীয় ধরণের শিল্পবস্তু সমূহ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করবে যে, স্মরণাতীত যুগে বাংলার সঙ্গে বহির্ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সমুদ্রপথে এই ধরণের ব্যাপক যোগাযোগের দৃষ্টান্ত ভারতের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না।

সম্প্রতি তমলুকের এগার মাইল দূরবর্তী রঘুনাথবাড়ি গ্রাম থেকে বড় আকারের দু'টি বিচিত্র পোড়ামাটির মনুষ্য-মূর্তি আবিষ্কৃত

হয়েছে। মূর্তি দু'টির মুখগহ্বর উন্মুক্ত, নাসিকা উন্নত। ললাট থেকে বিস্তৃত। এবং মূর্তির শিরোভূষণ অতিশয় উল্লেখযোগ্য, কারণ এর আকৃতি তালপত্রের ন্যায় বৃত্তাকার। রঘুনাথবাড়ির মূর্তিদ্বয়ের সঙ্গে সুদূর মধ্য-আমেরিকার আজটেক মূর্তির অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য এই সাদৃশ্যের দ্বারা কোনরূপ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও সম্ভব নয়। বিস্মৃত বঙ্গের কাহিনী, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৬২

রঘুনাথবাড়ীতে আবিষ্কৃত আদিম আঙ্গিকাবিশিষ্ট এই যে প্রাচীন মনুষ্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যার সাথে মধ্য-আমেরিকার আজটেক মূর্তির সাদৃশ্য আছে—এটি বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই পুস্তকে পূর্বেই বলেছি যে, বাংলার সাথে সুদূর আমেরিকার বাণিজ্যিক যোগাযোগও বর্তমান ছিল। এ সম্পর্কে টিটিকাকা হ্রদের নিকট আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সাথে বিশেষ সাদৃশ্য আছে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির। সেখানে গণেশমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব রঘুনাথবাড়িতে আবিষ্কৃত এই মূর্তিটি থেকে যদি অনুমান করি যে, এককালে তাম্রলিপ্তের সাথে সুদূর আমেরিকারও বাণিজ্যিক যোগাযোগ হয়েছিল, তা'হলে কি অন্যায় হবে সে অনুমান। তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল সুবৃহৎ। এ কথা হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। রঘুনাথবাড়ি ছিল এককালে প্রাচীন গৌরী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর ধারেই ছিল কাশীজোড়া রাজ্যের রাজধানী হরশঙ্কর। এখনো কাশীজোড়া রাজার অনেক কীর্তি কাহিনী ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সুন্দরনগর গ্রামের আশপাশে দেখা যায়। কাশীজোড়া এককালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সামন্ত রাজ্য ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে তমলুকের সামন্ত রাজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব। গৌরী নদী ছিল

বর্তমান তমলুক শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এবং এটি কংসাবতীর একটি শাখা। রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাম্রলিপ্তের কাছেই। অতএব প্রাচীন তাম্রলিপ্ত থেকে যে এই সব মূর্তি কাশীজোড়া রাজ্যে এসেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাশীজোড়ার নাম ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর "শীতলামঙ্গলে" পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমি "তাম্রলিপ্তের সাহিত্য ও সাহিত্যিক" অংশে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। এছাড়া রঘুনাথবাড়ির আশপাশের গ্রামে আজো অনুসন্ধান করলে এরূপ বহু পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'তমলুকের নিকটবর্তী তিলদায় সম্প্রতি এক আশ্চর্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি পোড়ামাটির ক্ষুদ্র মৃৎ-ফলকে অঙ্কিত আছে কয়েকটি হেলেনীয় অক্ষর। একজন বৈদেশিক পণ্ডিত এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন "EURUEON", অর্থাৎ 'প্রত্যূষের পূর্বের বাতাস।' কে জানে কোন প্রাচীন হেলেনীয় নাবিক তার নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার জন্য কোন দেবালয়ে এইভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল কিনা! লিপির পাঠ যদি সত্যই "EURUEON" হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক নাবিক হিপ্পালাস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত ভারত মহাসাগরের মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে। মৌসুমী বায়ু আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই হেলেনীয় বণিকদের পক্ষে ভারতীয় বন্দরসমূহে পদার্পণ করা সম্ভব হয়েছিল। তিলদায় প্রাপ্ত মৃন্ময় গ্রীক অনুশাসনটি সমগ্র ভারতে একক। এই ধরণের পুরাবস্তু সম্ভবত ভারতের আর কোনও স্থানে ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। মহাস্থানগড়, বাণগড়, ময়নামতী, পোখরান, তাম্রলিপ্ত, তিলদা, রঘুনাথবাড়ী ইত্যাদি নানাস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে উপলব্ধি করা গিয়াছে যে, বাঙালীর প্রকৃত ইতিবৃত্ত রচনা করতে হলে বহু অবজ্ঞাত স্থানে বিজ্ঞান সম্মত

ভাবে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং খননকার্য চালান প্রয়োজন।' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৬২।

তিলদা অতি প্রাচীন গ্রাম। এককালে এইস্থান গভীর সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল। পরে স্থলভাগ জেগে উঠে। তিলুদহ বা তৈলদহ থেকে অপভ্রংশ হয়ে তিলদাতে পরিণত হয়েছে। তিলদায় ময়না রাজাদের প্রাচীন গড় ছিল। এককালে ময়না রাজাও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত হোত। যথাস্থানেই এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে। মোহনা থেকেই ময়না রাজ্যের উৎপত্তি। যাই হোক এই তিলদা ময়না থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তিলদা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। জলচক গ্রামটিই বড়। এই গ্রামে অনেক বড় বড় দীঘি আছে। দীঘির নামগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন—মাধবসাগর, দরপাসাগর, সখীপুকুর, খেজুরিয়া পুকুর, রামভদ্রা, নাটেশ্বরী, স্বর্ণচারা, দেউলপুকুর ইত্যাদি। তিলদা গ্রামে এছাড়া আরো বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অধ্যাপক দাশগুপ্ত মশাই আবিষ্কার করেছেন। সেগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এছাড়া বহু সুবণ মুদ্রাও উক্ত গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকগুলি সুবণমুদ্রা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্বণকার শশী পোদ্দার কিনে গালিয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন। তিলদার রামচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে আজো একটি রজত মুদ্রা গচ্ছিত আছে। এই মুদ্রাটিকে ভ্রমবশতঃ তারা রামচন্দ্রের মুদ্রা মনে করে সিংহাসনে রেখে নিত্য পূজা করেন। মুদ্রাটির একপাশে ধনুর্বাণ হস্তে সমুদ্রগুপ্তের মূর্তি অঙ্কিত আছে। অপর পার্শ্বে পদ্মের উপর লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়ান মূর্তিটির পাশে কয়েকটি লিপি খোদাই করা আছে। অপর পার্শ্বেও দু'তিনটি অক্ষর আছে নীচের দিকে। অক্ষরগুলির লেখার ছাঁদ দেখে মনে হয় "ব্রাহ্মী অক্ষর।" মুদ্রার সীমারেখায় যে অক্ষরগুলি খোদিত আছে, সেগুলি বড় অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। বাম পায়ের নীচে

যে ৩।৪টি অক্ষর মুদ্রিত আছে তা' খুব সম্ভবত ফ-ব-চ-ঃ কিংবা গ-ব-চ। ঠিক অনুরূপ একটি স্বুবর্ণ মুদ্রা দাশগুপ্ত মশাইও আবিষ্কার করেছেন। এই প্রসংগে তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করে উদ্ধৃত করছি।

"স্বুবর্ণ মুদ্রা। গুপ্তযুগ। প্রথম পৃষ্ঠে ( obverse ) গরুড়ধ্বজের সম্মুখে ধনুর্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রাজমূর্তি। রাজার বামহস্তের নিম্নে কয়েকটি 'ব্রাহ্মী অক্ষর'। বর্তমান লেখকের পাঠ-অনুযায়ী অক্ষর কয়েকটি 'গ-ব-চ' অথবা 'গো-ব-চ'। মুদ্রার বিপরীত পৃষ্ঠে ( Reverse ) প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীনা দেবী ( লক্ষ্মী ) মূর্তি। দেবীর পশ্চাতে প্রভা মণ্ডল ( Nimbus ) এবং হস্তে পদ্মের লীলায়িত মৃণাল। মুদ্রার সীমারেখায় কয়েকটি অতি অস্পষ্ট অক্ষরের সমাবেশ।

বর্তমান স্বর্ণমুদ্রার শিল্পশৈলী দেখে মনে হয় যে এইটি গুপ্তসম্রাট বুধগুপ্তের ( আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ ) অনতিকাল পরে অঙ্কিত হয়েছিল। মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠের পাঠোদ্ধার যদি সঠিক হয় তবে হয়ত এইটিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজা গোপচন্দ্র কর্তৃক অঙ্কিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। গোপচন্দ্রের নাম আমরা জানতে পারি ফরিদপুর এবং মল্লসারল-এ ( বর্ধমান জেলা ) প্রাপ্ত দুইটি অনুশাসন থেকে।[১] বর্তমানে আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রাটি যদি সত্যই গোপচন্দ্রের হয় তাহলে এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কারণ, ইতিপূর্বে এই রাজার অন্য কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি।" দেশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১।

---

১ B. C. Sen : Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengel," P. P. 249 ff. দ্রষ্টব্য।

গোপচন্দ্র আনুমানিক ৫২৫ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এই গ্রামে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৃৎপাত্রের টুকরা আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি যুগল নরনারীর মিথুন-মূর্তি বিশিষ্ট একটি মৃৎপাত্রের টুক্‌রা। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী। এই ধরণের মৃৎপাত্র সমগ্র ভারতে একক। মূর্তিদ্বয়ের বস্ত্রের কুঞ্চন সমূহ সমসাময়িক প্রস্তরমূর্তি সমূহের অনুরূপ শিল্পশৈলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মিথুন-মূর্তির সংগে প্রায় সমসাময়িক যুগে নির্মিত পাহাড়পুরের যুগল মূর্তির কতকটা সাদৃশ্য আছে।

তমলুকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর কিছু নিদর্শন আছে রাজবাড়ীতে। এগুলি সংগ্রহ করেছেন স্বর্গীয় ষড়েন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র সুব্রত কুমার রায় মহাশয়। তাঁর সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে ভগ্ন অশোক-চক্র, মাটির খেলার মেষ, খেলার গাড়ী, মৃৎ নির্মিত সিংহের ভগ্ন নিম্নদেশ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মাটির খেলার মেষটি খুব সম্ভবত মৌর্য অথবা সুঙ্গ যুগের। তাম্রলিপ্তের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যুগে সুন্দর সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোড়ামাটির খেলনা ও মূর্তি ব্যবহৃত হোত, ভগ্ন অশোক চক্রটির গঠন বিশেষ লক্ষনীয়। খুব সম্ভবত এই চক্রটি খেলার পোড়া মাটির গাড়ীতে চাকা হিসেবে ব্যবহৃত হোত। আর একটি প্যাঁচ কাটা সংরক্ষিত জলাধারের অংশ বিশেষের ছবিও এই পুস্তকে মুদ্রিত হোল। এই পাত্রটির গঠন প্রণালী দেখে মনে হয়, প্রাচীনকালে থার্মফ্লাক্স জাতীয় মাটির পাত্র ও ব্যবহৃত হোত। তমলুকে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই পোড়ামাটির। মাটির দ্বারা তৎকালের অধিবাসীগণ এমন সব জিনিস নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা দেখলে ও গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। মাটি দিয়ে তাঁরা পাথরের অভাব ভুলে ছিলেন। মৃৎপাত্রগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মৃৎপাত্র আছে, যেগুলিকে দু'বার পোড়ান হয়েছে এবং পর পর দু'বার পোঁচ দিয়ে অনুর প্রতি অনুর ফাঁক মেটান হয়েছে। এই শ্রেণীর

মৃৎপাত্র প্রথম তৈরী করে তাকে রোদে অল্প মাত্রায় শুকনো করে একবার আগুনে ধীরে ধীরে রস শুকিয়ে আধপোড়া করা হোত। তারপর বিশেষ ধরণের সমুদ্রোপকূলের পলিমাটির স্তরকে ছেঁকে পুরু করে সেই পুরু গোলা মাটি পাত্রের উপরে বেশ মসৃণ করে প্রলেপ দেওয়া হোত। তারপর আবার তাকে আধ ছায়া ও কখন বা কড়া রোদে শুকিয়ে পুনরায় পোড়ান হোত। এই প্রক্রিয়াতে নির্মিত পাত্র যেমন সুন্দর হোত তেমনি উত্তম বলেও তৎকালে বিবেচিত হোত। এই বিশেষ ধরণের পাত্রগুলিতে সাধারণত জলীয় পদার্থ রাখা চলত। কলসী, গাড়ু, গ্লাস প্রভৃতি পাত্র এই শ্রেণীর নির্মিত। লম্বা ও উপরে নীচে বিশেষ ধরণের সংকীর্ণ গোলত্বের ব্যবধানে ঠিক থার্ম ফ্লাস্ক জাতীয় এক প্রকারের পাত্র আছে। এগুলির নির্মাণ প্রণালী ও উপরিউক্ত প্রক্রিয়াতে সম্পাদিত। গ্রীস দেশে প্রাপ্ত অনুরূপ পাত্রের সাথে এই পাত্রগুলির বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়।

আর এক শ্রেণীর কালো মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে। এগুলি নির্মাণ পারিপাট্যে বিশেষ উন্নত নয়। তমলুকের উকিল শ্রীযুত প্রবোধ নায়ক মহাশয় তাঁর বাড়ীতে একটি কূপ খনন কালে ২২ ফুট নীচে কয়েকটি উল্লিখিত ধরণের মৃৎপাত্র পেয়েছেন। আর একটি পোড়ামাটির বিশেষ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান যক্ষিণী মূর্তির ভগ্নাংশও তাঁর কাছে আছে। এই মূর্তিটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর বলে অনুমতি হয়।

আর এক শ্রেণীর মাটির হাঁড়ি পেয়েছি। এই হাঁড়ি বা জালাটির নিম্নাংশ ঠিক লাটুর মত। দেখলেই ভাবতে হবে এই সূঁচালো জালাটিকে কেমন ভাবে বসিয়ে রাখা হোত। কিন্তু ঠিক অনুরূপ ধরণের জালা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এই জালাগুলিকে তখন মাটিতে বিড়ার পরিবর্তে গর্ত করে রাখা হোত। মৃৎপাত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা

করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে এগুলি মৃৎপাত্র নির্মাণের প্রথম যুগে তৈরী। এইরূপ মৃৎপাত্র সম্পর্কে একটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি—"মাটির বড় বড় জালাগুলির তলা লাট্টুর মত ক্রমশঃ সুরু হইয়া গিয়াছে।...একটা বাড়ীতে দেখিলাম বড় একটি ঘরের মেঝেতে গামলার ধরণের গর্ত করিয়া ইট দিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। গর্তের কেন্দ্রগুলি সরু, পরিধির দিকে বেশ চওড়া। এইগুলি জালা বসাইবার জায়গা তাহা বোঝা যায়।" প্রবাসী, ৩১ শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৮।

তৎকালে শুধু জালা নয় ছোট ছোট হাঁড়ি, কলসিরও নিম্নাংশ অনুরূপ ভাবে লাটিমের মত করে তৈরী হোত এবং সেগুলি রাখার জন্য একটি পৃথক ঘরে ছোট ছোট গোল গর্ত করে তাতেই বসান থাকত। এই মৃৎপাত্রটি তমলুক পদুমবসান অঞ্চলে একটি খাদ কাটার সময় পাওয়া গিয়েছে।

তমলুক থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান লেখকের নিজ গ্রাম বরগোদায় দেবী বর্গেশ্বরী আছেন। একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দেবী বর্গেশ্বরীর মন্দিরের কাছেই একটি বড় উচ্চ ঢিপি আছে। এই ঢিপিটিকে গাঁয়ের লোক বর্গীগাদা, কোটগড়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন। বড় ঢিপিকে গ্রাম্য বাংলা ভাষায় 'বড়ো কুদা' বলে বা 'বড় কুদা' বলে। 'কুদা অর্থে ঢিপি। খুব সম্ভবত এই 'বড় কুদা' শব্দটি কালে কালে অপভ্রংশ হয়ে বরগোদায় পরিণত হয়েছে। ( বড়কুদা>বোরকুদা>বোড়(ক)গাদা> বড়গাদা>বোরগাদা>বরগোদা )। সে যাই হোক, এই স্থানের সঙ্গে প্রাচীন কালে বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই মন্দিরের একটু উত্তরে বড় খাল বলে একটি হাজা-মজা খালের চিহ্ন আজো আছে। এই খালটিই এককালে তমলুকের সাথে সংযুক্ত ছিল। এর কোন কোন অংশ 'নাকচিরার খাল' নামেও আজো পরিচিত। উক্ত বর্গেশ্বরীর ঢিপি এককালে বিরাট ছিল।

এইস্থান প্রাচীনকালে যে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, তা' দেখলেই স্পষ্টই অনুমিত হয়। এখান থেকে আমি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পেয়েছি। যেগুলির সাথে তমলুক ও ২৪ পরগণার বেড়াচাপায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সাথে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। একটি সংরক্ষিত জলাধারের উপরিঅংশ পাওয়া গেছে। তা' দেখে মনে হয় এটি একটি বড় কুজোর ভগ্নাংশ। নির্মাণশৈলী বিশেষ উন্নত ধরণের। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র তৈরী হোত সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশ সমূহে। কারণ, এদেশে সান্নিকটবর্তী কোন পাহাড় পর্বত নাই। যার ফলে মাটির জিনিসপত্র নির্মাণে বিশেষ উন্নত প্রক্রিয়ার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এই শ্রেণীর পাত্রে জল চুইয়ে পড়ার কোন ভয় ত ছিলই না, অধিকন্তু বাইরের উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে পাত্রমধ্যস্থ জলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। সোজা কথায় জল ঠাণ্ডা থাকত এবং রন্ধন করা খাদ্যদ্রব্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত টাটকা সংরক্ষণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়া আরো একটি প্রস্তরীভূত হাড় পাওয়া গিয়েছে। আর একটি মৃন্ময় দণ্ডায়মান মূর্তির নিম্নাংশ। এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতিতে নির্মিত। হাঁটুর কাছ থেকে পা' পর্যন্ত নিম্নাংশটুকুতে কাপড় পরিধানের যে প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তা' বেশ উন্নত ধরণের। মূর্তিটির দাঁড়াবার কৌশল পুরুষের অনুরূপ। পায়ে কিন্তু মেয়ের মত মল আছে। কাপড়ের পাড়ের বাহারও লক্ষণীয়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ২১শ অধ্যায়ে অলঙ্কার সম্পর্কে অনেক কথা আছে। এই শাস্ত্র থেকে জানা যায় পুরুষরাও নানারকমের অলংকার ব্যবহার করত।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে পাই—

> "মরগ অমজ্জীয়জুঅং চরণে সে লম্ভিসা বঅস্সাহিং।
> ভীএ নিঅম্বফলএ নিবেসি থা পঞ্চরাঅ মণিকঞ্চী।
> ছিন্না বশআ বলিও করকমল পট্টনাল জুঅলম্মি।"

—বস্তরা চরণে নূপুর পরাইয়া দিল। নিতম্বফলকে পদ্মরাগ-মণির কাঞ্চী নিবেসিত হইল। করকমলে বলয়, কণ্ঠে মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণে কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

পায়ের গহনা ছিল, মল, বেঁকি, নূপুব, নেউর, কেয়ূর, পাশুলি, আনটবিছা, গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, সঞ্জাব, তোড়া, খলখলি, ছরা, ঝুমুর, ও চরণচাপ প্রভৃতি।" প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ১০০ ও ১০১

কাপড়ের কথা বলছিলাম। ভারতীয় শিল্পাদর্শ অনুযায়ী 'দৈহিক গঠনের সঙ্গে বস্ত্র অলংকাব শিরোভূষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের সংযোগে পূর্ণাঙ্গ আকার সৃষ্টি করতে না পারা পর্যন্ত মূর্তি বা চিত্রশিল্পের পূর্ণতা লাভ করে না।' 'ভারতীয় মূর্তিতে বস্ত্র অলংকার ইত্যাদি নির্মাণ কৌশলের অনুগত ও গঠননিষ্ঠ। কাপড়ের প্রক্ষিপ্ত অংশ, নানা অলংকার, শরীরের চাল এবং গঠনের নতোন্নত ভাব, শরীরের আকার আয়তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।' এই রীতি অনুযায়ী যদি বর্গেশ্বরীতে প্রাপ্ত মৃৎ মূর্তিটি বিচার করি তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এটি ভারতীয় শিল্পরীতির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে গুপ্ত ও পাল যুগে ভারতীয় শিল্পরীতি যতটা উন্নতি লাভ করেছিল, এই মূর্তিটি সেদিক থেকে বিচার করলে ততটা উন্নত নয়। তাই বলে মূর্তিটি হাতে তৈরী নয়। ছাঁচে চাপ দিয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। সম্ভবত কোন প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য খচিত করার উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। পুরাণপ্রসিদ্ধ কোন দেবতার মূর্তি বলে অনুমিত হয়।

তমলুকে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত একটি কূর্মমূর্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মূর্তিটি যদিও মাটির তৈরী, তা'হলেও এত জীবন্ত যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কূর্মমূর্তিটি যেন জলের উপরে ভেসে আছে এমনিভাবে তৈরী। পৃষ্ঠদেশ কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে উন্নত নয়। কিছু শিল্পকাজও আছে। মূর্তিটির পিছন দিকে দু'টো লেজ ছিল।

একটি ভেংগে গেলেও অপরটি বর্তমান আছে। এরূপ কূর্মমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। সম্ভবত এটি খেলনা রূপে ব্যবহৃত না হয়ে পূজিত হোত। 'ধর্মমঙ্গলে'র আদর্শে তৈরী নয়। যদি তা' হোত তা'হলে, মুখ বেরিয়ে থাকত না এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম একপৃষ্ঠে অঙ্কিত থাকত। খুব সম্ভবত এই মূর্তিটি গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমতি হয়।

এইবার তমলুক ও এর আশপাশের গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি বিষ্ণু-মূর্তি নিয়ে আলোচনা করব। যাদও তমলুকে খুব বেশী পাথরের নির্মিত মূর্তি পাওয়া যায়নি, তা'হলেও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে অনেক প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আজো আবিষ্কৃত হবে। তমলুক অঞ্চলে এ পর্যন্ত আমি ছ'টি বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান পেয়েছি। এই মূর্তি গুলির সব কয়টিই বেশ প্রাচীন। জিষ্ণুহরির মন্দিরে দু'টি নন্দীগ্রাম থানার শ্রীগৌরী গ্রামে একটি, কল্যাণচক গ্রামে প্রাচীন তেঁতুল গাছের তলায় একটি, শ্যামসুন্দরপুরে ঝিলিঙ্গেশ্বরীর মন্দিরে একটি ও নন্দীগ্রাম থানার নন্দপুর গ্রামে আর একটি—মোট এই ছ'টি।

এই ছ'টি মূর্তির সবগুলিই পালযুগে নির্মিত বলে অনুমতি হয়। তবে জিষ্ণুহরির মন্দিরে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তি দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ। এই দু'টি মূর্তিকে এতদিন বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ একটি হরি ও অপরটি অর্জুনের মূর্তি বলে অনুমান করে এসেছেন। আসলে কিন্তু দু'টি মূর্তি বিষ্ণুর। এবং একটির থেকে অপরটি বেশ প্রাচীন। তমলুকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পালযুগের শিল্পরীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তা' না হলে তমলুকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—এই চারি শতাব্দীর নির্মিত মূর্তি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে মোটামুটি ভাবে পালযুগের শিল্প নামে অভিহিত করা হয়। যদিও এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অন্যান্য

রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন, তবুও এই চারিযুগের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণাক্রান্ত এবং পাল রাজ্যেই এর অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটেছে।

এই যুগে শিল্পের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র দেবদেবীর মূর্তি। বাস্তব জীবন ও সমাজের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্মশাস্ত্রাদিতে দেবদেবীর যে ধ্যানমন্ত্র আছে সর্বতোভাবে তাকে অনুসরণ করেই শিল্পীকে ছানি, হাতুড়ি ধরতে হয়েছিল। সেইজন্য, এই যুগের শিল্পীর স্বাধীনতা খুব কম ছিল—একরকম ছিল না বললেই চলে। অষ্টধাতু ও কালো কষ্টিপাথর,—সাধারণত ইহাই ছিল মূর্তি নির্মাণের প্রধান উপাদান। অন্যান্য ধাতু যদিও ব্যবহৃত ছিল, তা' সংখ্যায় অতি অল্প। পালযুগের চারশত বৎসরের শিল্পের অনেক বিবর্তন হয়েছিল কিন্তু এই বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই। অধিকাংশ ভাবেই মূর্তির নির্মাণকাল মোটামুটিভাবে জানাও যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর করে সময় নিরূপণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই।

এই যুগে মূর্তিগুলি একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল থেকে কেটে বের করা হোত। মূল মুর্তিটি কেন্দ্রস্থলে এবং পারিপার্শ্বিক মূর্তিগুলি ও অলংকারাদি এবং পার্শ্বচিত্র দুইপাশে, উপরে ও নীচে খোদিত করা থাকত। প্রথমে মূর্তিগুলির গভীরতার এক অর্দ্ধমাত্র পাষাণে উৎকীর্ণ হোত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গভীরতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শেষে মূল মূর্তিটি প্রায় সম্পূর্ণ আকার লাভ করে। এইরূপ ভাবে মূর্তিকে প্রকটিত করার জন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ পাথর কতকটা একেবারে কেটে বাদ দেওয়া হোত। আবার প্রথম প্রথম মূল মূর্তিটিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ও দর্শকের প্রায় সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্রমশ পারিপার্শ্বিক মূর্তিগুলি ও নানাবিধ কারুকার্যে বিভূষিত পার্শ্বচিত্র অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। পরিশেষে সুদক্ষ শিল্পীর হাতে পড়ে মূলমূর্তিগুলির শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু সবশেষে

কোন কোন জায়গায় এই সব পারিপার্শ্বিক মূর্তি ও অলংকারের প্রাচুর্য এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে মূল মূর্তিটিই গৌণ হয়ে পড়ে। 'অনেকেই মনে করেন যে এই দুইটি পরিবর্তনই খুব সম্ভব প্রধানত কাল-প্রবাহের ফলে ঘটিয়াছে; অর্থাৎ উৎকীর্ণ মূর্তির অতিরিক্ত গভীরতা এবং পারিপার্শ্বিক মূর্তি ও চালচিত্রে অলংকারের অতিরিক্ত ও অযথা বাহুল্য শিল্পীর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতার প্রমাণ। কিন্তু ইহা যে একটি সাধারণ সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় না রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের নামাঙ্কিত লিপিযুক্ত বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তির সহিত রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ সদাশিব মূর্তির তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ২০৬—২০৭।

পালযুগের শিল্প নির্মাণের সময় বিজ্ঞাপন প্রসংগে একজন প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক এমনিভাবে মন্তব্য করেছেন,—"নবম শতাব্দে দেহের কমনীয়তা, সুডৌল গঠন ও শান্ত সমাহিত মুখশ্রী; দশম শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ; একাদশে ক্ষীণ তনু, সুকোমল ভাব-প্রবণতা, মুখমণ্ডলের অপার্থিব দিব্যভাব ও দেহের ঊর্দ্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা; এবং দ্বাদশে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখশ্রী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা ও বসন ভূষণের প্রাচুর্য;—ইহাই এই চারিযুগের বাংলার শিল্পের প্রধান লক্ষণ।" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলার ইতিহাস।

শিল্পের গঠন প্রণালী দেখে এরূপভাবে ভাগ করা সম্ভব হলেও পালযুগের মূর্তি শিল্পের সময় বিজ্ঞাপন করা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার স্থান এখানে নেই। তবে আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য পালযুগের শিল্পরীতি সম্পর্কে মোটামুটি এটুকু জানলেই চলবে।

এই শিল্পরীতির আলোকে আমরা জিষ্ণুহরির মন্দিরে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিদ্বয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। মন্দিরের বামপাশে

রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরে খোদিত। বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ মূর্তির মত এটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, তারপর চক্র। বাম হাতে গদা এবং পদ্ম। পার্শ্বচিত্রগুলি অপরটি থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের। দু'পাশে মাথার কাছে দুটি মালা হাতে দু'জন দেবদূত যেন উড়ে আসছেন। মাথার মুকুটটিও বিশেষ ধরণের। কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে হার, বাহুতে অঙ্গদ ও বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত। চক্ষুদ্বয় রজত দ্বারা নির্মিত। এইরূপ রজত নির্মিত চক্ষুদ্বয় অন্য কোন বিষ্ণুমূর্তিতে সচরাচর দেখা যায় না।

দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষিত মূর্তিটিও বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে গদা ও পদ্ম এবং বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম। এটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। বামপাশে রক্ষিত মূর্তিটির সাথে এই মূর্তিটির বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। এর চক্ষুদ্বয়ও রজত নির্মিত। কোমরের দু'পাশে পাথর কেটে ছ্যাঁদা করা। দু'টি মূর্তিই এইরূপ। পূজক ব্রাহ্মণ কটিদেশের ছ্যাঁদা দিয়ে গলিয়ে মূর্তি দু'টিকে কাপড় পরিয়ে রেখেছেন। এর ফলে মূর্তির নিম্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। মূর্তি দু'টির জন্য বিশেষ কোন সিংহাসনের ব্যবস্থা নেই।

দক্ষিণ পার্শ্বের বিষ্ণু মূর্তিটির মুখমণ্ডলের অপার্থিব সদাহাস্য-মুখরিত দিব্যভাব ও দেহের ঊর্দ্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা দেখে এটিকে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। বাম পাশের মূর্তিটির শান্ত সমাহিত মুখশ্রী ও অলংকারাদির ব্যবহার দেখে নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর নন্দীগ্রাম থানায় শ্রীগৌরীগ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটির ছবি 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্তে' অধর চন্দ্র ঘটক মহাশয় প্রকাশ করেছেন। শ্রীগৌরী গ্রামে এক পুষ্করণী খনন কালে প্রায় তিনফুট উচ্চ ও এক ফুট প্রশস্ত চতুর্ভুজ এই

বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া যায়। বসন ভূষণের প্রাচুর্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় এটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল।

তমলুকে পুষ্করণী খননকালে মৃৎনির্মিত একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ছাঁচে তৈরী এই মূর্তিটির শিল্প কর্ম অতি নিকৃষ্ট। এটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর নির্মিত।

এবার আমরা একটি শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করছি। এই শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য খ্যাতির কথা। শিলালিপিটি হোল নিম্নরূপ :

অথ কস্মিংশ্চি [ ৎ স ] ময়ে বণিজো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তামলিপ্তি [ ম ] যোধ্যায়া যযু পূর্বস্বণিজয়া ॥
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সনাবাসং বিয়াস্মবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চক্রুরিহ স্থিতিং ॥
স্থবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি যৈর্ধনং।
বিত্তপম্পর্ধয়েবা সেদে পর্যন্ত মুপাতিতং ॥

হাজারিবাগ জেলার তুধপানি পাহাড়ে এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর বাঙালীর ইতিহাসে ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় লিপি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। অষ্টম শতকে লিপি খোদাই কালে বলা হচ্ছে —"অথ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে" অর্থাৎ কোন এক সময়ে। তা'হলে অনুমান করতে মোটেই ভুল হয় না যে ঘটনাটি ঘটেছিল তারও অনেক আগে। তিন ভাই তারা এসেছিল অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তিতে বাণিজ্য করতে। তারপর কিছুদিন পরে ফিরে এলো নিজের দেশে প্রচুর মণি, মাণিক্য নিয়ে। এই হোল শিলালিপির মূল বক্তব্য।

তমলুক থেকে প্রায় ৮।৯ মাইল দক্ষিণ দিকে কল্যাণচক গ্রাম। এই গ্রামের সন্নিকটে মহিষাদলের প্রাচীন রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরীর রাজধানী ছিল। কল্যাণচক গ্রাম এই কল্যাণ রায়ের নামানুসারে হয়েছে বলে মনে হয়। এই গ্রামে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষ আজো আছে। এই বৃক্ষের তলায় একটি বেশ বড় বিষ্ণু মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে "মহারাজতলা" বলে অভিহিত করে। তারা এই মূর্তির পূজাও করেন। মূর্তিটির গঠনপ্রণালী খুব উন্নত নয়। অমসৃণ কালোপাথরে এ'টি নির্মিত। মূর্তিটি বেশ বড়। মূর্তিটির নির্মাণকাল অনুমান করা সম্ভব নয়। এই মূর্তিটির মুখশ্রী, পার্শ্বচিত্র ইত্যাদি কতকটা যেন অসমাপ্ত বলে ধারণা হয়। খুব সম্ভবত মূর্তিটি পালযুগের প্রথমদিকে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

গোমাই গ্রামের সন্নিকটে শ্যামসুন্দরপুরে ঝিলেঙ্গেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে যে বিষ্ণুমূর্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে, সেটি পূর্বে কোন মন্দিরে নিত্য পূজিত হোত বলে মনে হয়। এই মূর্তিটির নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত সরল ও সাবলীল। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী। মুখমণ্ডলের দিব্যভাগ বিশেষ লক্ষণীয়। মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর নির্মিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। নন্দীগ্রাম থানায় নন্দপুর প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ দীঘি আছে। এই গ্রামে অনেক প্রস্তরনির্মিত মূর্তি ছিল বলে অনুমিত হয়। একটি পুকুর থেকে কয়েকটি মূর্তি কিছুদিন হোল আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব সম্ভবত বিধর্মী মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মূর্তিগুলিকে পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে যে বিষ্ণুমূর্তিটি ভগ্ন অবস্থায় আছে, সে মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন, কেউ জোর করে ভেংগে মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দীঘিতে নিক্ষেপ করেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়, এ থেকে মনে হয়, এই প্রাচীন গ্রামে

অতীতে নিশ্চয়ই কোন ধর্মদ্বেষমূলক বিপ্লব হয়েছিল যার ফলে দেব-দেবীর উপর আক্রমণ করে এইগুলিকে নষ্ট করা হয়। এই মূর্তিটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। নির্মাণ প্রণালী উচ্চাঙ্গের।

শিল্পের দিক থেকে যদি বিচার করি, তা, হলে এগুলিকে সমভঙ্গ মূর্তি বলা যেতে পারে। প্রাচীন শিল্পে সমভঙ্গ মূর্তি সবচেয়ে অধিক। সমভঙ্গ মূর্তি স্তম্ভের ন্যায় ঋজু এবং স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল। হাত পায়ের প্রক্ষেপ থাকলেও মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া রাখাই সমভঙ্গ মূর্তির লক্ষণ। সমভঙ্গ মূর্তির আবেদন সম্মুখবর্তিতায়। এজন্য দর্শক নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সমভঙ্গ মূর্তির ঋজুতা অনুভব করে থাকেন। শিল্পসমালোচকদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'আত্মিক বা দৈহিক শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশিত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে সমভঙ্গ মূর্তি। সমভঙ্গ মূর্তিতে চাঞ্চল্য নেই বলেই এই মূর্তিতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গৌণ। মিশরীয় মূর্তি, প্রাচীন ( আর্কাইক ) যুগের গ্রীক মূর্তি, ( ক্লাসিক ) গ্রীক যুগের অ্যাপেলো মূর্তি মৌর্য যুগের যক্ষ ও যক্ষী, মথুরার বুদ্ধ মূর্তি, বেলগেলোর তীর্থঙ্কর—অধিকাংশই সমভঙ্গ মূর্তির পর্যায়ভুক্ত। আধুনিক কালের শিল্পে ভাব না থাকলেও, সমভঙ্গ মূর্তির অভাব নেই।' ভারতীয় মূর্তিও বিমূর্তবাদ, বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়।

তমলুকের ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি গ্রাম বঁহিচাড়। এই গ্রামের শ্মশানের কাছে পদ্মপুকুরিয়া বা সীতাপুকুরের ধারে একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে। অনুরূপ আরে দু'টি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড ওরি সন্নিকটে হরিপদ প্রামাণিকের পুকুরে আছে। আর একটি একফালি খালের মধ্যে আছে। এই প্রস্তর খণ্ডগুলি যেমন বৃহৎ তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদ্মপুকুরের পাড়ে 'রাইস মিলে'র কাছে যে প্রস্তরখণ্ডটি পড়ে আছে তাতে নীচুর দিকে কয়েকটি মূর্তি খোদিত আছে। উপরের দিকেও আছে কিন্তু মাটিতে

ঢেকে থাকার জন্য সম্যকরূপে পরিলক্ষিত হয় না। এই তিনটি মূর্তি একই রকমের। কৃষ্ণের মত ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে মূর্তিগুলি দণ্ডায়মান। একহাত পার্শ্বে লম্বিতভাবে আছে, তাতে গোলাকৃতি একটি বলের মত বস্তু ধৃত। অন্য হাতটি মস্তকে সন্নিবেশিত। এইরূপ মূর্তি কোন দেবতার নয়, তা' দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মূর্তিগুলি কিসের, তা, বলা বড় কষ্টকর। প্রস্তর-খণ্ডের অবস্থা দেখে মনে হয়, কোন বৃহৎ স্তম্ভ বা দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ। একপাশে এমনভাবে খাঁজকাটা আছে যে যেন ঐ ধরণের খাঁজ অন্য প্রস্তরের সাথে মিল করার জন্যই ব্যবহৃত হোত। বহিচাড় গ্রামটি একটি মজাহাজা নদীর উপর অবস্থিত। ইতিপূর্বে কংসাবতীর যে শাখা গৌরীনদা নামে রঘুনাথবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল বলে উল্লেখ করেছি, ইহা সেই নদীর অংশ। খুব সম্ভবত কোন দুর্গ বা প্রস্তর নিামত বাড়ীর কারুকার্যখচিত স্তম্ভের অংশ হওয়াই স্বাভাবিক। তমলুকে প্রস্তর নির্মিত দুর্গ ছিল একথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি।

পরিশেষে একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তির কথা বর্ণনা করে এই অধ্যায়ের শেষ করব। এই মূর্তিটি যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি অভিনব! ময়না রাজবাড়ীর লোকেশ্বর শিব মন্দিরের মধ্যে মূর্তিটি সংরক্ষিত আছে। একটি কম্বলাসনের উপরে পদ্মাসনে বসে আছেন এক সাধক। হাত কিন্তু তাঁর ছ'টি। দু'টি হস্ত মস্তকে সন্নিবিষ্ট। তাতে দু'টি ঘট। তারপরের দু'টি হাত দু'পাশে ঋজুভাবে অবস্থিত। তাতেও দু'টি ঘট। অপর দুই হস্ত বক্ষদেশে পর পর অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় আছে তাতেও একটি ঘট। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কম্বলাসন পর্যন্ত প্রলম্বিত। প্রতি বাহু ও মনিবন্ধে রুদ্রাক্ষ শিবের মত মালা পরিহিত। শিরদেশে মুকুট। আলোক দিব্যস্বত্ব মুখশ্রী, দেখলে সহজেই ভক্তির উদ্রেক হয়। মূর্তিটি একটি অখণ্ড প্রস্তর থেকে কেটে বের করা হয়েছে। এটি যে কিসের মূর্তি আজো নির্দ্ধারিত

হয়নি। সমগ্র অখণ্ড বঙ্গদেশে এরূপ অভিনব বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তি ইতিপূর্বে আর আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মূর্তিতাত্ত্বিকদের কাছে এই মূর্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই মূর্তির মধ্যে অনেক তথ্যই নিহিত আছে।

তমলুক অধিবাসীদের নিকট খোঁজ করলে আরো বিচিত্র ধরণের মূর্তি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তমলুকে আজো কোন গভীর দীঘি বা পুষ্করিণী খননকালে বিচিত্র ধরণের মৃৎপাত্র ও মূর্তি পাওয়া যায়। যদি সরকারের পক্ষ থেকে এই সহরে একটি ছোট সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থা করা যেত, তা'হলে ভ্রমণকারীদের ত বটেই তমলুকবাসীদেরও ভাল হোত। কারণ, তমলুকে প্রাপ্ত বহু জিনিস ইতিপূর্বে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদি প্রাচীন তাম্রলিপ্তের রাজবাড়ীটি সংস্কার করে তাতেই এই ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে খুব ভাল হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# মন্দির শিল্পে তাম্রলিপ্ত

মন্দির শিল্পে তাম্রলিপ্ত বন্দব কতদূর উন্নত ছিল, তা' আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। এই বন্দরে যে কিরূপ ধরণের মান্দর ছিল, তার কোন বিবরণ প্রাচীন পুঁথিপত্তর বা ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আজো জানা যায়নি। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন-সাঙ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। একমাত্র তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্তে তৎকালে ৫০টি পৌত্তলিকদের মন্দির ছিল, এই মন্দির যে কত উন্নত শিল্পশৈলীর পরিচায়ক, তার কোন বিবরণ তিনি লিখে যাননি। তবে একথা অনুমান করা যায় যে, তখন তাম্রলিপ্তে যখন ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করতেন এবং অধিকাংশ লোকের অবস্থা ভালই ছিল বলে হিউয়েন সাঙ বলেছেন, তখন মন্দিরগুলি নিশ্চয়ই আকাশস্পর্শী ও নানা ভাস্কর্য খচিত ছিল। ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলে পরিগণিত হোত। কিন্তু আজকের তমলুকের বুকে অতীত তাম্রলিপ্তের সেই প্রধান গৌরব মন্দিরগুলির একটিও বর্তমান নেই। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন ধর্মাবলম্বীদের কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সেই সব মন্দিরের প্রায় সমস্তগুলিই তমলুকের ভূগর্ভে চিরতরে সমাহিত হয়ে আছে ও রূপনারায়ণের প্রবল স্রোতে কিছু ধ্বসে পড়ে চির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতীতের ক্ষীণ সাক্ষী নিয়ে একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে দেবী বর্গভীমার মন্দির। বাকি আর যে সব মন্দির বর্তমান তমলুকে আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কোনটিরই বয়স ৩।৪ শত বছরের বেশী নয়। যাইহোক, আমরা এই মন্দিরগুলি নিয়েই বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

**বর্গভীমা মন্দির ॥** এই মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। তাই এখানে এই মন্দির সম্পর্ক বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে এই মন্দির যে সাড়ে চারশ' বছরের প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সামনের অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মন্দিরে উল্লেখযোগ্য কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন নেই। মূল মন্দিরটি প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ এবং ভিত সহ এই মন্দিরের উচ্চতা ৮০ ফিট। মূল মন্দিরের ভিতরের অংশটি একটি বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী বলে ভ্রম হয়। উড়িষ্যার শিল্পরীতিতে রেখদেউলের অনুকরণে নির্মিত। "তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণে" ও "কিংবদন্তীর দেশে" যে কালাপাহাড়ের পাঞ্জার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, আমি অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস পেলাম না। অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গেল যে, অধিকারীদের কোন এক শরিক নাকি পাঞ্জাটিকে অর্থের লোভে বিক্রী করে দিয়েছেন। কতদিন আগে কোথায় এবং কাকে বিক্রী করেছেন, তার কোন সন্ধানই আজ পর্যন্ত করতে পারিনি।

যাই হোক, দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো তমলুকবাসীদের অটুট আছে। এবং প্রতিদিন বহু যাত্রীর সমাবেশে এই স্থান মুখরিত থাকে।

**জিষ্ণুহরির মন্দির ॥** এই মন্দির সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করেছি। এই মন্দির সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ইহা নাকি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির এবং এই দুইজনের মূর্তি একত্রে আছে। কিন্তু পূর্বেই আমরা বলেছি দুই বিগ্রহই বিষ্ণুর। এই পুস্তকে মূর্তিদ্বয়ের আলোকচিত্রও প্রকাশিত হোল। এর থেকে পাঠকগণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্তিদ্বয় জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত।

প্রথমত জিষ্ণু এবং হরি বা নারায়ণ এই তিনটি শব্দ একই অর্থ বাচক। দ্বিতীয়ত বিশ্বকোষে যে তথ্য লিখিত হয়েছে তাতে এই অর্থ স্পষ্টই বোঝায় যে, রাজা ময়ূরধ্বজ অর্জুন এবং হরির মূর্তি দু'টি একসংগে অর্থাৎ একই আধারে না নির্মিত করে পৃথকভাবে নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্বকোষের কথা অনুযায়ী আমরা দুটি পৃথক মূর্তিই পাচ্ছি কিন্তু তা' পৃথক দু'টি মূর্তি নয়—একই মূর্তি দু'টি—অর্থাৎ দুটিই বিষ্ণু। এমতাবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জৈমিনীর মহাভারতোক্ত কাহিনী মিথ্যে কিংবা সত্য হলেও তমলুক রত্নাবতীপুর নয় কিংবা যদি তাই হয়, তা'হলে আসল মূর্তিদ্বয় হয় রূপনারায়ণ গর্ভে মন্দিরসহ ধ্বসে গেছে না হয় এই দুটি বিষ্ণুমূর্তি অন্য কোথাও পাওয়া গিয়েছিল এবং এই প্রাপ্ত মূর্তি দু'টিকেই কৃষ্ণ-অর্জুনের মূর্তি বলে চালান হচ্ছে। আমি নিজে দু'দিন ঘুরে তিন দিনের দিন যখন মূর্তি দু'টি দেখি এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের মূর্তি বলে আমায় বললেন। এতে আমি ভিন্ন মত পোষণ করতে তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন—"জানেন, এ মূর্তি কত প্রাচীন।" প্রাচীনতা অস্বীকার করছি না কিন্তু যখন ধরে ধরে বুঝালাম তখন তিনি বললেন, আপনি যাই বলুন এ মূর্তি দু'টি কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুনের। আমি আর তর্ক করলাম না, বুঝলাম, জনসাধারণকে কি ভীষণভাবে ঠকান হচ্ছে। তাই বলে এতে ব্রাহ্মণের যে দোষ আছে সে কথা বলছি না, ব্রাহ্মণ তাঁর পূর্ববর্তী পূজকদের কাছ থেকে যা শুনে আসছেন আজো তাই বিশ্বাস করেন এবং ভক্তদেরও বিশ্বাস করান। ভক্তরা প্রতিমূর্তি দেখেই সন্তুষ্ট, তাঁরা পূজো দেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেন।

ঐতিহাসিক সেবানন্দ ভারতী তাঁর পুস্তকে লিখেছেন—"পরম বৈষ্ণব রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্বদা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে

একটি মন্দির নির্মান করিয়া একখণ্ড প্রস্তরে উভয়ের মূর্তি খোদিত করাইয়া স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণ গর্ভে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্তমান মন্দির তমলুক-রাজগণ কর্তৃক চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে।"—তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ১০৩।

এখানে কিন্তু সেবানন্দ ভারতীর কথানুযায়ী মনে হচ্ছে একই প্রস্তরখণ্ডে কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের প্রতিমূর্তি খোদিত ছিল। তা'হলে সেই মূর্তি গেল কোথায়? হয় সেই অতি প্রাচীন মূর্তি আমার পূর্ব অভিমত অনুযায়ী রূপনারায়ণ গর্ভে ভেসে গেছে, না হয় ভারতী মশাই মূর্তি না দেখেই নিজের মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষোক্ত ধারণাই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। তারপর নূতন মন্দির নির্মান সম্পর্কে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন, তা' অন্য মতের সাথে মিলে না। একস্থানে পাই—"ইঁহার প্রাচীন মন্দির বহুকাল হইল নদের গর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে মন্দির বর্তমান আছে, তাহা ৪।৫ শত বর্ষ পূর্বে এক গোপাঙ্গনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে।'—A Statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 66.

এমতাবস্থায় আমরা কোনটিকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করব। মন্দিরটি চার-পাঁচ শত বছরের প্রাচীন হতে পারে, কিন্তু সেই অতি প্রাচীন মন্দিরের আসল রূপও আজ আর নেই বলে মনে হয়। এই মন্দির সংলগ্ন চাঁদনীটি হাওড়া জেলার নবগ্রামের জমিদার স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র বাবু সতীশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক বাংলা ১৩২৭ সাল নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভবত ঐ সময় মূল মন্দিরটিও সংস্কৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই মন্দিরটির গঠন প্রণালীও উৎকল মন্দির শিল্পের অনুরূপ।

ভারতী মহাশয়ের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তমলুকের দক্ষিণ রাউতাড়ি গ্রামে বার্ষিক প্রায় চারি-পাঁচ হাজার টাকা আয়ের

সম্পত্তি থেকে প্রত্যহ একমণ চাল অন্নভোগ প্রদত্ত হোত এবং ৩৬৫/০ বিঘা জমি থেকে প্রতিদিন ক্ষীরভোগও দেওয়া হোত। এক্ষণে এই সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হস্তগত হয়েছে এবং সেবা পূজাদি নিয়মিত চলছে।

**রামজীর মন্দির**॥ এই মন্দির খাটপুকুরের ধারে আজো বর্তমান আছে। ইহা রাজা আনন্দনারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্তৃক নির্মিত। এই মন্দিরে রাম-সীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। বিগ্রহটি বড় সুন্দর। রাণী এই মন্দিরের সেবা-পূজাদি পরিচালনের জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। ১২৮৭ সালে ১৪ই পৌষ বুধবার কাগগেছে নিবাসী ভগবতী দীক্ষিত মহাশয়কে নিষ্কর ভূমি দান করেন। এই মন্দিরের নির্মাণ প্রণালীও উৎকল শিল্পের অনুরূপ। কারুকার্য বিহীন অনাড়ম্বর ভাবে নির্মিত উক্ত মন্দিরটি দেখতে সত্যই অপরূপ।

**জগন্নাথজীর মন্দির**॥ খাটপুকুরের পাড়ে জগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরটি নির্মিত। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী বাংলা এবং উড়িষ্যা এই দুই দেশের শিল্প-সমন্বয়ে গঠিত। অনেকাংশে ইহা বাংলা শিল্প রীতির অনুরূপ। এই মন্দিরের সম্মুখভাগ বিষ্ণুপুরের অনেক মন্দিরের মত এবং পোড়ামাটির নানা কারুকার্য খচিত। মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং এই মন্দিরের তিনটি চূড়ো। দারুময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপিত। তমলুকের ষটচত্বারিংশৎ রাজা শ্রীমন্তনারায়ণ রায় মূর্তি স্থাপন পূর্বক মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ চাঁদনি হাওড়া জেলার নবগ্রামের জমিদার মৃত রামমাধব দত্ত মহাশয়ের পৌত্র সতীশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক বাংলা সন ১৩২৭ সালে নির্মিত।

**মহাপ্রভুর মন্দির**॥ পরম বৈষ্ণব, কীর্তনীয়া ও পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বাল-চৈতন্যের মূর্তি স্থাপনকর্তা ও রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্তৃক বহু পরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব

যখন নীলাচল গমন করেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে নরঘাটের নদী পেরিয়ে একটি সোজা রাস্তা দিয়ে পুরী গমন করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত পথটি তৎকালে বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল। তাম্রলিপ্ত দিয়ে পুরী যাত্রা সম্পর্কে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে মুরারী গুপ্তের কড়চা অন্যতম। উক্ত কড়চার একস্থানে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্গুরু।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নান দদর্শ মধুসূদনঃ॥"

মহাপুণ্যক্ষেত্র তাম্রলিপ্তে জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য পদার্পণ করে ব্রহ্ম-কুণ্ডে স্নান করলেন এবং পরে শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করেন।

লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলের একস্থানে পাই—

তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমোলোকে উত্তরিল মহাপুণ্যক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত মন॥"[১]

আজিও তাম্রলিপ্তায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারক-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি পাদ পরিক্রমা নরঘাট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বৈষ্ণবগণ সংকীর্তন ও মহোৎসব করিতে করিতে মহাপ্রভুর প্রথম আগমন হৃদয়ে স্মরণ করেন। এই পরিক্রমা ২৪ বছর হোল নিয়মিত ভাবে চলে আসছে।

মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। আর এই কিংবদন্তীর পিছনে লুকিয়ে আছে একটি শোকাবহ ঐতিহাসিক

---

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১৫০। লোচন দাস ঠাকুর। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। ৩৮।২, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টিম—মেসিন-প্রেস হইতে শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭, শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন ১৩০৮।

কাহিনী। জয়ানন্দের মতে মহাপ্রভু আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে ( ১৫৩৩ খৃঃ ) বেলা তিনটার সময় স্বর্গলোকে গমন করেন। আসলে মহাপ্রভুর তিরোধান কিরূপভাবে হয়েছিল, তা' এখনো নিশ্চিতভাবে স্থির হয়নি। এই প্রসংগে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন—"তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাহার তিরোধান হয়—এই সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে "মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে" এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতন্য উছ্‌ট খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুণ্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে ( ১৫৩৩ খৃঃ ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচন দাস বলেন রাত্রি আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের ন্যায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্যের পার্শ্বচরগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহের আর কোন

চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পূর্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এক কোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকেব একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমাধি কার্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত কবিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোনে গৌরাঙ্গের প্রস্তরনির্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যের সেই পদচিহ্ন থাকাব কোন কাবণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলাস্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা বিগ্রহে তাঁহার চিন্ময় দেহ মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৭৩৯—৭৪০।

এই মতের স্বপক্ষে আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—

······পাণ্ডাগণের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যকে লইয়া সমুদ্র তীরে গমন করে এবং কৌশলে তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে।" বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৪৯

বিভিন্ন বৈষ্ণব লেখকগণের এই সমস্ত বিভিন্ন মত দেখে মনে হয় সত্য সত্যই মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল। তৎকালে বড় বড় বৈষ্ণবাচার্যগণও সে কথা জানতেন। বাসুদেব ঘোষ যখন শ্রীচৈতন্যের এই মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, তিনি তখন অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। শোকাবেগ চাপতে না পেরে তিনি পুরীর পথে আকুল আবেগে উন্মত্তের মত ছুটে চললেন। অবশেষে রূপনারায়ণ পার হয়ে এলেন তমলুকে। রাত্রিতে এক প্রাচীন বকুল গাছের তলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে থাকলেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী ঘোষ দম্পতী নাকি পুত্রশোকাতুর ছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য রাত্রে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তোমায় আর যেতে হবে না।। আমি প্রতিদিন তোমায় পুত্ররূপে এসে দেখা দেব। তুমি এখানেই আমার সেবা-পূজার বন্দোবস্ত কর।' স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাসুদেব আর অগ্রসর হলেন না। তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ হৃদয়ে চেপে বালক শ্রীচৈতন্যের মূর্তি নির্মাণ করে তাঁরি সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাসুদেব ঘোষ প্রতিষ্ঠিত সেই বালক চৈতন্যের মূর্তি আজো মহাপ্রভুর মন্দিরে আছে।

এখন এই আলোচনা প্রসংগে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু সম্পর্কে আমার দু'একটি অভিমত এখানে প্রকাশ করতে চাই। আশা করি তা অপ্রাসংগিক হবে না। জয়ানন্দের কথামত যদি ধরি তিনি পায়ে ইটের আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিলেন, তা'হলে তাঁকে তাঁর পার্ষদগণ না নিয়ে যেয়ে পাণ্ডারাই বা নিয়ে গিয়ে গুণ্ডিচাগৃহে কেন তুললেন? বিশেষ তখন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তথায় বর্তমান ছিলেন। আর যদিই বা গুণ্ডিচাগৃহে তাঁকে স্থান দেওয়া

হয়েছিল, সেই গৃহে পার্ষদগণকে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না কেন? চৈতন্যের সেরূপ অবস্থায় ভক্তগণেরই ত যাওয়া উচিত সর্বাগ্রে। এবং তাঁরা গিয়েও ছিলেন। কিন্তু তখন গুণ্ডিচাগৃহের দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধদ্বার দেখে পার্ষদগণের মনে কি কোনরূপ সন্দেহ এক বারের জন্যও উঁকি দিল না। বিশেষ তাঁরা পাণ্ডাদের প্রথম ব্যবহার ভালভাবেই ত জানতেন। যদি তর্কের খাতিরেও ধরেনি তখন পাণ্ডাদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল তাই তাঁদের মনে জাগলেও কোন প্রতিবিধান করতে পারেননি। তাই যদি হয়, তা'হলেও ত তাঁরা গিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে অন্তত একটা সংবাদও দিতে পারতেন। কারণ প্রতাপরুদ্র নিজেই ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্তশিষ্য। আর যদি ধরেওনি পাণ্ডাদের কোন দোষ ছিল না, তা'হলেও প্রশ্ন হচ্ছে তিরোধানের পর ভক্তদেব মহাপ্রভুর নশ্বর দেহ-পার্শে যেতে দেওয়া হলো না কেন? সেন মহাশয়ের মন্তব্য অনুযায়ী তা'হলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, নিশ্চয়ই পাণ্ডাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল। এবং ধীর-স্থিরভাবে বিচার করলে জয়ানন্দের কাহিনীকেও সত্য বলে মনে হয় না। আসলে সেন মহাশয় যে পাণ্ডাদের কাছে পুরীতে শুনেছিলেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, একাহিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে। তবু প্রশ্ন উঠে যদি সত্যই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, তা'হলে সে কথা চৈতন্য জীবনীকারগণ চেপে গেলেন কেন? এর একমাত্র উত্তর হতে পারে যে, যদি তখন তাঁরা এই নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী প্রচার করতেন, তা'হলে হয়ত সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ ক্ষেপে গিয়ে একটা ভীষণ বিপ্লব করতেন, তাতে চৈতন্যের প্রেমধর্মের অবমাননা হোত এই ভয়ে ভক্তগণ অত্যন্ত সংযতভাবে মহাপ্রভুর অতিমানবতা প্রচার করেছিলেন। আর জয়ানন্দ নিজের প্রখর বুদ্ধি দিয়ে এমন কাহিনী তৈরী করেছেন যে যদি তিনি অতি মানব না ছিলেন, তা'হলে তাঁর মৃত্যুর পর মৃতদেহ গেল

কোথায়? পাণ্ডারা ত দ্বার রুদ্ধ করেই ছিলো। মৃতদেহ কোথাও নিয়ে যায়নি, সাধারণ লোক সহজেই একথা বিশ্বাস করলো এবং সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যখন তিনি নাকি বিলীন হয়ে গিয়েছেন—একথা প্রচারিত হোল।

বাসুদেব ঘোষের বালক চৈতন্যের বিগ্রহ স্থাপন সম্পর্কে যে কিংবদন্তী তমলুকে প্রচলিত আছে, এ কাহিনীর মূলে মহাপ্রভুর শোকাবহ মৃত্যুর যে একটি ক্ষীণ সূত্রও সংযুক্ত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাইহোক, এই মহাপ্রভুর সেবাপূজাদি নির্বাহ করার জন্য স্থানীয় রাজা ও জমিদারগণ প্রচুর জমি দান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তমলুক, কাশীযোড়া, ময়না, দরো, জলামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি রাজা ও জমিদারগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে বাসুদেব ঘোষ তদীয় শিষ্য মাধবীদাসকে সেবাদির ভারার্পণ করেন এবং তীর্থ-পর্যটন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মোহান্ত দ্বারা এই মন্দিরের কার্য-নির্বাহ হতো। বর্তমান ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী মহাপ্রভুর ভূ-সম্পত্তি সরকারের হাতে গিয়েছে।

এইসব মন্দির ছাড়া তমলুকে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। রাজবাটী সংলগ্ন রাধাবিনোদ ও রাধারমণ মন্দির কোম্পানীর আমলে আনন্দনারায়ণ রায় কর্তৃক সংস্কৃত হয়েছিল। এ ছাড়া তমলুকে প্রতি বৎসর বারোয়ারী পূজাও হয়, এই জন্যে তাদের পৃথক পৃথক দেউল আছে। এদের ব্রহ্মবারোয়ারী ও গঙ্গাবারোয়ারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে রামকৃষ্ণদেবের একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরের রামকৃষ্ণ বিগ্রহ বড় সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক।

তমলুক রাজগণের অন্যতম বংশধর বহিচবেড়ে গড়ে আরো

কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে রাধাবল্লভ জীউ, গোপীনাথ, শ্যামচাঁদ, শীতলা, মহাদেব প্রভৃতি মন্দিরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাবল্লভ জীউর মন্দির সুবৃহৎ ও বিশেষ কারুকার্যখচিত। এই মন্দির বর্তমানে জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী নবরত্ন মন্দিরের অনুরূপ।

রজক পল্লীতে 'নেতা ধোপানী'র পাঠ আছে। কিন্তু এর কোন মন্দিরাদি নেই। নেতা ধোপানীর পাঠের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

## দ্বাদশ অধ্যায়

# তাম্রলিপ্তের সামন্ত রাজ্য সমূহ

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ছিল ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ।[১] হন্টর সাহেব বলেছেন, "তমলুক রাজ্য পূর্বে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং সমুদ্রও তৎকালে তমলুকের নিকটবর্তী ছিল। এখন সমুদ্র তমলুক হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়াছে। অতএব তমলুকের পশ্চিমস্থ ময়নাগড়ের রাজগণের পুরাতন রাজ্যাংশ —সবঙ্গদেশ বা সবং পরগণা বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট করিতে হইলে, ২৪ পরগণার অন্ততঃ বাতলা সহর পর্যন্ত সীমা ধরিতে হয়।"

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বাংলা দেশের পূর্বতন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের একতম "সমগ্র দক্ষিণ-বাঙ্গলা-ব্যাপী" বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সমস্ত অভিমত থেকে মনে হয় প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল সুবিশাল সাম্রাজ্য। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সামন্ত-নৃপতিগণ তৎকালে সকলেই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত-নৃপতি নামে অভিহিত হতেন। তাম্রলিপ্তের সামন্ত রাজ্য-সমূহের মধ্যে প্রধান হোল—(১) হিজলী ও সুজামুঠা (২) মহিষাদল (৩) পটুবপুর (৪) তুর্কী (৫) কাশীজোড়া ও (৬) ময়না।

এই ছ'টি সামন্ত রাজ্য যে এককালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ আজো পাওয়া যায়নি। তবে এই রাজ্যগুলি বিভিন্ন সময়ে যে তাম্রলিপ্তরাজের অধীনে এসেছিল, সে

---

১ "The Kingdom of Tamlmk was then about two hundred and fifty miles in circumference."—Documents Geographiques, P. 450. and Julien's 'Hiouen Thsang,' Vol. III, P. 83.

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি নিম্নে এই ছ'টি রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করছি।

**হিজলী ও সুজামুঠা**—এই রাজ্যের আদি রাজাগণের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি। যতদূর জানা যায় এই বংশের প্রাচীন রাজা মুকুন্দদাস। এই রাজার পূর্বে কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়নি। রাজা মুকুন্দদাসের অধস্তন ২১শ পুরুষ রাজা হরিদাসের সময় গৌড়েশ্বর হিজলী রাজ্য আক্রমণ করে পরাভূত হন। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের "গৌড়ের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করে জানা যায়, বাংলার সুলতান "সিকন্দর সসৈন্যে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।" ২য় খণ্ড পৃঃ ৬০। সিকন্দর শাহ ১৩৫৯ থেকে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে রাজত্ব করেছিলেন। অতএব হরিদাস ঐ সময়ের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬০০ শত বছর পূর্বে রাজা হরিদাস হিজলীতে রাজত্ব করে ছিলেন। উক্ত বংশের ২৩শ রাজা গোবর্দ্ধন দাস ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান কর্তৃক পরাজিত হন ও সুজামুঠার অধিরাজ বলে পরিচিত হন। "হিজলী অতি পূর্বে তমলুকের সঙ্গে মিলিত থাকিলেও ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অন্যূন ৭।৮ বৎসর কাল পরাক্রান্ত নৌবল-গর্বিত স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ( হিজলী রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও রাজবংশলতা পণ্ডিত ভগবতীচরণ প্রধানকৃত "আর্যপ্রভা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফীচের বর্ণনা থেকে জানা যায়—পাঠান অধিকারের পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।[১]

---

১ It was a kingdom of itself, and the king a great friend to strangers, afterwards it was taken by the king of Patan which was their neighbours." I Horton Ryley's Ralph Fitch, P. 113.

সম্ভবতঃ রাজা হরিদাস হিজলীর স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজা হরিদাস সম্পর্কে "হিজলীর মসনদ্-ইআলা" প্রণেতা করণ জাতীয় ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন —"মাহিষ্যগণ তাঁহাদের সামাজিক পুস্তকে ইহাকে স্বসম্প্রদায়স্থ সুজামুঠা রাজবংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহাদেব মতে হরিচরণ দাস হিজলীর আদি রাজা 'মুকুন্দ দাস' হইতে একবিংশতিতম এবং সুজামুঠা রাজবংশে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুকুন্দদাসের বংশীয় ৩৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "মাহিষ্য বিবৃতি" কার প্রতি একশত বৎসরে তিন পুরুষ বংশবিস্তৃতি গণনা করিয়াছেন। এই গণনা ঐতিহাসিক সম্মত। সিকন্দরের আক্রমণ কাল হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরে ১৫ জন রাজাব বাজত্বক্রম এই মতই সমর্থন করে। তাহা হইলে মুকুন্দ হইতে হরিচরণ দাস পর্যন্ত ২২ জন রাজার রাজত্বকাল সাত শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে 'হিজলীর রাজা মুকুন্দ দাসে'র রাজত্ব আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিদ্ধান্ত হয়।" হিজলীর-মননদী-ই-আলা, পৃঃ ৩৬

করণ মহাশয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে বিভিন্ন প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন মুকুন্দদাস সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লোক হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন—"আমরা মসনদ্-ই-আলার পূর্বে করণ জাতীয় হিন্দু এবং কয়েকটি মুসলমান রাজাকে হিজলীতে আধিপত্য করিতে দেখিতেছি।" পৃঃ ৪১।

বিভিন্ন স্বজাতিপ্রিয় ঐতিহাসিকগণের এইসব মন্তব্য থেকে রাজা মুকুন্দ সম্পর্কে সঠিক কিছু অভিমত প্রকাশ করা অসম্ভব।

---

১ আর্যপ্রভা, পৃঃ ১১৩, মাহিষ্য বিবৃতি, পৃঃ ২১৪, মাহিষ্য তত্ত্ব-বারিধি পৃঃ ১৩৪ প্রভৃতি।

এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নিরপেক্ষ গবেষণা করা ছাড়া কিছু মন্তব্য করা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না। তবে যতদূর জানা যায় হিজলীরাজ গোবর্দ্ধন দাসের সময়ে পাঠানবীর মছন্দলী অত্যন্ত শঠতা করে এই রাজ্য অধিকার করেন। তিনি গোবর্দ্ধনকে হিজলীর একাংশ দিয়ে সুজামুঠার গড়ে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এবং "রণঝাঁপ" উপাধি প্রদান করেন। হণ্টর সাহেব এই গোবর্দ্ধন রণঝাঁপকে গোবর্দ্ধন 'রণ্জ' বলেছেন। রণঝাঁপ উক্ত পাঠান মছন্দলীর সেনাপতি ছিলেন। রাজা গোবর্দ্ধনের সময় থেকে দক্ষিণ বঙ্গে মুসলমান শক্তি প্রবল হয় এবং হিজলীর মহাপরাক্রান্ত ভূপাল বংশ সুজামুঠার রাজা বলে গণ্য হন। সুজামুঠা রাজ্য চারটি পরগণা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এইগুলি হোল—(১) শূজামুঠা, (২) মহম্মদপুর, (৩) অমর্শি, (৪) ভূঞ্যামুঠা। ( Grants' Analysis—PP. 365-366. Firminger.

সেবানন্দ ভারতী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মতে—"ইতিহাস প্রসিদ্ধ মসনদ্-ই-আলি ঈশা খাঁ এই হিজলী রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়া সমগ্র ভাটী প্রদেশের অধিপতি হন ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের গৌরব হানি করেন।" পৃঃ ১৪০

এই হিজলী রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় অসীম ধৈর্য সহকারে অনুসন্ধান করে "হিজলীর-মসনদ-ই-আলা" নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রামাণ্যতা ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত। হিজলী ও তাঁর বাণিজ্যিক খ্যাতি সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এই পুস্তক পাঠের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হিজলীরাজ্য প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্য ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি বৌদ্ধযুগে হিজলী রাজ্যের কোন চিহ্নই ছিল না। হিজলী দ্বীপ সম্ভবত ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র থেকে জেগে

উঠেছিল এবং তার অনেক পরে মনুষ্য বাসযোগ্য হয়েছিল। বিরুলিয়ার জানা বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় তৎকালে এ সব অঞ্চলে ঘন অরণ্য ছিল এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম ঐ অরণ্যে এসে উপস্থিত হন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে মনে হয় হিজলী অঞ্চল সমগ্র না হলেও কিছুটা অংশ খুব সম্ভবত তমলুক রাজ্যের অধীন ছিল। তাই বলে সেবানন্দ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গণের মতানুযায়ী হিজলী রাজ্য তমলুকের সামন্ত রাজ্য ছিল, একথা স্বীকার করতে হলে আরো প্রমাণের প্রয়োজন।

**মহিষাদল**—মহিষাদল-এর অনেক অংশ সমুদ্রগর্ভে ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর এই ভূখণ্ড সমুদ্রোপকূলে তমলুকের দক্ষিণ পাশে জেগে উঠে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ময়নাগড়ের রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের জনৈক মাহিষ্য সেনাপতি মহিষাদল রাজ্য স্থাপন করেন। মাহিষ্য-তত্ত্ববারিধি, পৃঃ ১৩৮ এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানী আশুতোষ জানা মহাশয় লিখেছেন—"মহিষাদলের শেষ মাহিষ্য রাজার নাম উদয়নারায়ণ রায়। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় রাজা কল্যাণ রায়ের পুত্র। মহিষাদলের বর্তমান রাজা ব্রাহ্মণ, ইঁহারা উদয়নারায়ণের নিকট হইতে জায়বন্ধক সূত্রে রাজত্ব প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত জায়বন্ধক-গৃহীতা ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারী গোপনে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে নিজ নামে এই রাজ্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। তাহার বংশধরগণই এখন মহিষাদলের রাজা। রাজা উদয়নারায়ণ উদয়সাগর নামে নিজ নামে এক দীঘি খনন করান। এই দীঘির নিকটবর্তী রাজবাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। রাজা উল্লিখিত বিদেশীয় ব্রাহ্মণ মহাজনের নিকট অর্থ লইতেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণ পরিণামে এই রাজ্য দখল করেন ও রাজার সর্বনাশ সাধন করেন। রাজা উদয়নারায়ণের বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন ও সামান্য ভূখণ্ডের আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন।" মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি, পৃঃ ১৩৮

এ সম্পর্কে ভগবতীচরণ প্রধান মহাশয় লিখেছেন—"ময়না গড়াধিপতির জনৈক সেনানী "রায় চৌধুরী" উপাধিধারী হইয়া এই সমস্ত ভূভাগের বিভিন্ন পরগণার চৌধুরীবর্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তমলুকরাজের সামন্তরাজরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে কিরূপে এই মহিষাদল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা অধুনা স্থির করা বড় দুষ্কর। তবে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে সুলতান সুজা বাংলাদেশের মসনদে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময়ে যে মহিষাদলের সিংহাসনে সেই মাহিষ্য জাতীয় "রায় চৌধুরী" বংশীয় রাজা কল্যাণ রায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। "দশ শত ষাট সালের (১৬৫৩ খৃঃ) দানপত্র তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।" ১৫ পৃঃ, মহিষাদল-রাজবংশ (দানপত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)।

সুলতান সুজার রাজত্বকালে (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) জনার্দ্দন উপাধ্যায় নামক একজন সামবেদী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ গেঁওখালীতে আসেন ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তৎকালে ঐ সকল অঞ্চল জনবসতি শূন্য অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ অরণ্য সমাকীর্ণ অঞ্চল তিনি তৎকালের নবাব দরবারে সনন্দ প্রার্থনা করেন। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তিনি মহিষাদল রাজ্যের যে অংশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, সেই অংশের সামুদ্রিক গরান-অঞ্চল অপসারিত করে নতুন জনপদের পত্তন করেন এবং পরে উপরিউক্ত উপায়ে কল্যাণ রায় চৌধুরীদের জমিদারী গ্রহণ করে মহিষাদল রাজ্যের আয়তন বর্ধিত করেন। "অনন্তর বহুতর যত্নে প্রজা সংস্থিতি করিয়া রাজোপাধি ধারণ করেন; এবং গড়রঙ্গীবসানে রাজধানী স্থাপন করেন। তদনন্তর দুর্যোধন উপাধ্যায়, রাজারাম উপাধ্যায় ও শুকলাল উপাধ্যায়, ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে যুবরাজ আনন্দলাল উপাধ্যায় রাজ্যাধিকারী হইয়া অনেক রাজ্য বিস্তার করেন; এবং সন্তানাদি

না হওয়ায় কুটুম্বপুত্র মতিলাল পাঁড়েকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ( বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ বৎসরে, যাহাকে সাধারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া থাকে ) মানবলীলা সম্বরণ করেন। ( আনন্দলালের এই মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ আছে। তিনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন ( Bayley, Memoranda of Midnapore. ) গ্র্যান্টের রাজস্ব-বিবরণী পাঠে জানা যায় আমলী ১১৩৫ থেকে ১১৭২ সাল ( ১৭২৮—১৭৬৫ খ্রীঃ ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আনন্দলালের পত্নী জানকীর নামে মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়েছিল ( Fifth Report, Vol, II, P. 365 )। সুতরাং আনন্দলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উক্ত বছরেই রাণী জানকী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবাস্ত গুমগড় পরগণা ছিল না—ইহা পরে গৃহীত হয়েছিল। বেলীর উক্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দই প্রকৃত বলে মনে হয়। ( হি-ম-ই-আ পৃঃ ৯৪ )

মতিলাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক হেতু তাঁহার ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী রাণী জানকী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালোচনার পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপালজীর নবরত্ন মন্দির, রামবাগের ৺রামজীর মন্দির, বৃন্দাবনে ৺জানকীরমণের মন্দির ও নন্দীগ্রামে ৺জানকীনাথের মন্দির এবং অতিথিশালা আজ পর্যন্ত তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে, অতি সুনিয়মেই ঐ সমস্ত দেবসেবা নির্বাহ হইত। ইঁহারই রাজত্বকালে কোম্পানি বাহাদুরের দশসালা বন্দোবস্ত হয়, এবং সেই বন্দোবস্ত কালীন তাঁহার নামের সহিত "রাণী" উপাধি সংযুক্ত ছিল। এই পুণ্যবতী রাণীর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর হইলে তাঁহার স্বামীর পোষ্যপুত্র রাজা মতিলাল অল্পদিনের মধ্যে বসন্তরোগে অন্ধ হওয়ায়, তাঁহার সেবা সূত্রে রাজা সুরপ্রসাদ গর্গ রাজপদাভিষিক্ত হয়েন, ইনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া লোকান্তর গমন করিলে ইঁহার স্ত্রী

রাণী মন্থরা ও ইহার পর রঘুমোহন গর্গ, ভবানীপ্রসাদ গর্গ ও কালীপ্রসাদ গর্গ রাজাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অকালমৃত্যু নিবন্ধনে কেহই অধিকদিন রাজকার্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই, তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে রাজা জগন্নাথ গর্গ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজাসন উপবেশন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পুনঃপুনঃ রাজপরিবর্তন বশতঃ রাজ্যে অরাজকতা ও অশান্তি. এবং জমিদারীতে নামজারি আদি না করায় জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর জমিদারী খাস করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করেন। পরে রাজা জগন্নাথ আপনাকে রাণী মন্থরা দেবীর উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নামজারি করিয়া জমিদারী দখল করেন। তদনন্তর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইলে ত্বদীয় পুত্র রামনাথ গর্গ রাজা হন। কিন্তু রামনাথ গর্গের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে তাঁহার মাতা রাণী ইন্দ্রানী রাজকার্য নির্বাহ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামনাথ গর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্মিণী রাণী বিমলা দেবী মাহেশের ঘাটে সহমরনেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্তচিতায় দগ্ধীভূত হন। তৎকালীন দেওয়ান তামোলুক নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। রাজা রামনাথ গর্গের উইলসূত্রে রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ রাজা প্রাপ্ত হন। (বিমলাদেবীর পুত্রগণ নাবালক। তাই কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের দ্বারা পরিচালিত) ইনি এক প্রকাণ্ড রথ নির্মাণ করিয়া বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজব্যয়ে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়া মহান উপকার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের স্কুল, ডিস্পেন্সারী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং শিল্প বিদ্যালয়ে সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।" (তমোলুক পত্রিকা—মহিষাদল রাজবংশ।)

এঁর তিন পুত্র—ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গ ও রামপ্রসাদ গর্গ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ গর্গের, ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গের

মৃত্যু হয়েছে, মধ্যম রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গেরও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেহত্যাগের (২২ শে জানুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ) দুই দিন পূর্বে মৃত্যু হয়। ইনি কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের সাহায্যার্থে এককালীন বত্রিশ হাজার টাকা দান করে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র—সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপাল প্রসাদ গর্গ। সতীপ্রসাদ দানশীল রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। ইনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা, লেডি কার্জনের আফিল মতে লেডি ডফরিন ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা ও বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সাহায্যার্থে ১০০০৲ টাকা দিয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার দুইপুত্র—কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ ও কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ। দেবপ্রসাদ গর্গ সঙ্গীতপ্রিয় কলারসিক রাজকুমার। গোপাল প্রসাদ গর্গের পুত্রহলেন—কুমার ভবানী প্রসাদ গর্গ ও কুমার ভূপাল প্রসাদ গর্গ। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় মহিষাদল "মহিষাদল রাজকলেজ' স্থাপিত হয়েছে। কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ একবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কুমার ভবানীপ্রসাদ গর্গ ছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বহুদেশ পর্যটনও করেছিলেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় ইনিই কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই বছর (১৯৬৪) দেহত্যাগ করেছেন।

**কতুবপুর**—আইন-ই-আকবরীতে এই রাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ এই রাজ্যে ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভূপাল রাজা দলজিৎ সিংহ ও ভিখারীসিংহ অত্যন্ত ক্ষমতা-শালী হয়ে উঠেন। সেই সময় এই রাজদ্বয় বিহার প্রদেশের গয়াজেলা পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। বিহার প্রদেশে নালন্দা গ্রামে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনও এই রাজধানীর

ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। অতি প্রাচীন কালে এই রাজ্যও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত-রাজ্য ছিল। মুসলমান শাসনকালে এই রাজ্য প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে। শুনা যায় এই রাজবংশ এখনও বর্তমান আছে এবং অতি দীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন চণ্ডভীম অমরকেতু (দেব) জানা, বীর অমরকেতুর বীরত্ব কাহিনী স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত হবে। সেনাপতি অমরকেতুর ভগ্নি সুগন্ধাকে কতুবপুর রাজ হরিদেব সিংহ বিবাহ করেন। অমরকেতু স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য পুরীর রাজা কর্তৃক "চণ্ডভীম" উপাধি প্রাপ্ত হন। অমরকেতু চণ্ডভীমের অধীন ৫০ হাজার পদাতি, ২ হাজার ঘোড়সোয়ার, ৫ শত হাতি ও বহু বরকন্দাজ ছিল। এই বীরের শক্তি প্রভাবে কতুবরাজা অসীম পরাক্রমশালী ত হয়েছিলই অধিকন্তু নিরুপদ্রবে সুশাসিত ও হোত।

**তুর্কা**—তাম্রলিপ্ত রাজকুমার যখন উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তুর্কারাজা এই অভিযানে নিজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে যোগ দেন। তাম্রলিপ্তের কোন রাজকুমার যে উড়িষ্যা জয় করেছিলেন তা' সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে কলভিন সাহেব যে অনুশাসন পত্র আবিষ্কার করেন, তা' থেকে জানা যায় একাদশ শতাব্দীর শেষভাবে গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অনন্তবর্মা বা কোলাহল কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন এবং কলিঙ্গ বিজয় করেন। এই অনন্তবর্মার সাথে তুর্কা রাজা উড়িষ্যা বিজয়ে যোগ দিয়েছিলেন কিনা, তা সঠিক ভাবে জানা যায় না, এই রাজ্যের অধিপতিগণের উপাধি 'গজেন্দ্র-মহাপাত্র'। এই রাজের বংশধরগণ পুরীর কাছে বর্তমান আছেন। ইঁহারা উপবীত ধারী ও বীরজাতি বলে পরিগণিত। তুর্কার রাজগণ ও মুদ্দার গজপতি রাজবংশ একই বংশ। ইঁহাদের শরীরে একই

শোণিত প্রবাহিত। মুসলমান শাসন কালে এই রাজবংশ খুব ক্ষমতাপন্ন জমিদার বলে পরিগণিত ছিলেন। খণ্ডরুই গড়ে এই রাজবংশ এখনো অত্যন্ত দীনভাবে বর্তমান আছেন। তমলুকে এই বংশের একশাখা বর্তমান বসবাস করছেন। 'আর্য প্রভা'তে এই বংশের বংশলতা প্রকাশিত হয়েছে।

**কাশযোষ বা কাশীজোড়া**—এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সুপষ্টরূপে জানা যায়নি. বিক্রমবিজলের 'বিক্রমসাগর" নামক দেশবিবরণ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ধনদত্তের পত্নী শিবানীর গর্ভে কুলিশ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত, স্বর্ণরেখা তীর—বর্তী বালিশ ( বালেশ্বর বা বালিশাহী ) ও কাশযোষ ( কাশীজোড়া ) এই তিনটি প্রদেশের শাসন কর্তা ছিলেন। এই কুলিশ দত্তের অধস্তন একত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্রলিপ্ত রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের বিস্তৃত কোন বিবরণ আজো পাওয়া যায়নি। এরপর পরশুঘার নামক চিত্রগুপ্ত বংশীয় এক অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ কায়স্থ তাম্রলিপ্ত ও কাশীজোড়া প্রদেশের রাজা হন। তিনি নাকি সনাঢ্য বংশীয় এক ব্রাহ্মণকে অপমান করার ফলে তাঁর বংশ নির্বংশ হয়। একাহিনী পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করেছি।

এরপর কাশীজোড়া রাজতক্তে আমরা যাঁকে রাজারূপে পাচ্ছি তিনি হলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব গঙ্গানারায়ণ রায়। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিমাঞ্চলের সরন্দদেশ। পুরীতে জগন্নাথ দেব দর্শন কামনায় আগমন করেন। কিন্তু নিজের কার্যদক্ষতা ও যুদ্ধনৈপুণ্যে পুরীর দেবরাজের সুনজরে পড়ে আর তিনি দেশে ফিরতে পারলেন না। দেবরাজ তাঁকে সৈনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। এরপরের উড়িষ্যার ইতিহাস ঘটনাবহুল ও যুদ্ধবিগ্রহে বিপর্যস্ত। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে কালপাহাড়ের উড়িষ্যা বিজয়। এই হিন্দু বিদ্বেষী বীরের নৃশংস অত্যাচারে সারা বাংলা ও উড়িষ্যার বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন মুকুন্দদেব।

দেবরাজ ও মুকুন্দদেব একই ব্যক্তি কিনা জানা যায়না। যাইহোক এই কালাপাহাড়ের গতিরোধ করার জন্য গঙ্গানারায়ণকে দেবরাজ সসৈন্যে প্রেরণ করেন। গঙ্গানারায়ণ এই যুদ্ধে কোথাও কোথাও অনেকটা কৃতকার্য হন, ফলে দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে জায়গীর স্বরূপ কাশীজোড়া পরগণা গঙ্গানারায়ণকে প্রদান করেন। তখন কাশীজোড়া পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ থেকে গঙ্গানারায়ণ পরিবারও আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে নিয়ে এসে, কাশীজোড়ায় রাজ্যস্থাপন করেন। কিছুদিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনী ভূঞা রায়কে জমিদারী প্রদান করে শ্রীক্ষেত্রধামে গিয়ে বসবাস করেন এবং তথায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যামিনীভানু রায় ভূঞা নবাবদরবারে গমন করেন এবং তাঁর সাহায্যে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে রাজগির সনন্দ নিয়ে কাশীজোড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর রাজা যামিনী ভানু রায় জঙ্গল কেটে শুরা নামক গ্রাম স্থাপন করেন ও তথায় একটি বৃহৎ সরোবর খনন করান। এই সরোবর জানুদীঘি নামে আজিও বর্তমান আছে পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে। এই জানুদীঘি সরোবর প্রতিষ্ঠা কালে উড়িষ্যার যাজপুর থেকে দুটি সপুত্রক ব্রাহ্মণ আনীত হয়েছিল। উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও তদ্বংশীয়গণ মেদিনীপুরে "গৌড়াদ্য-ব্যাস" ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশে 'ব্যাস-বৈদিক' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন। ( গদাধর ভট্টের কুলজী )

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে যামিনী ভানু রায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র প্রতাপ নারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট থেকে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। এবং ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরীর দেবরাজের দ্বারা রাজটীকা ও শ্বেতছাত্রাদি প্রাপ্ত হন। হরশঙ্কর গ্রামে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। এই গ্রামের নিকট দিয়ে গৌরী নামে কংসাবতীর একশাখা প্রবাহিত ছিল। আজিও এই নদীর চিহ্ন দেখা যায়। হরশঙ্কর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও

র্তমান আছে। প্রতাপনারায়ণ প্রতাপপুর গ্রাম স্থাপন করেন। এই স্থানও পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হলে তৎপুত্র হরিনারায়ণ রায় রাজা হন এবং কৃষ্ণরায় নামক কুলদেবতা স্থাপন করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হরিনারায়ণের মৃত্যু হলে স্বদীয়পুত্র লছমীনারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। রাজ্যের বহু জঙ্গল কাটিয়ে বহু গ্রাম স্থাপন করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু জাতির লোকজন আনিয়ে নিষ্কর ভূমি দান পূর্বক তাঁদের বাসস্থান দেন। রাজ্যেব এইসব উন্নতি করার জন্য নবাব সরকারে নিয়মিত খাজনা দিতে পারতেন না। ফলে নবাব অত্যন্ত পীড়াপীড়ি কবেন তখন তিনি নবাব দরবারে হাজির হন। কোন উপায় না পেয়ে স্বধর্ম ত্যাগ পূর্বক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই ধর্মগ্রহণের ফলে কাশীজোড়া বাজ্য রক্ষা পায় এবং বাজা বাকি করের দায় থেকে রেহাই পান। দেশে প্রত্যাবর্তন করে চাঁচিয়াড়া গ্রামে গড় নির্মান করেন এবং তথায় গৌরী নদীর তীরে একটি সুবৃহৎ মসজিদও নির্মাণ করান। এই মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১১০/০ বিঘা জমিও দান করেন। মসজিদটি চাচিয়াড়া গ্রামে আজো বর্তমান আছে। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে লছমি-নারায়ণের মৃত্যু হলে তৎপুত্র দর্পনারায়ণ রায় রাজা হন। কিছুদিন বাজত্ব করার পর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং চাঁচিয়াড়া গড়ে এসে বসবাস করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। অতঃপর দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র জিতনারায়ণ রায় বাজা হন। ইনি কিছুদিন রাজত্ব করার পর নবাব দববারে কর প্রদানে অক্ষম হয়ে কারারুদ্ধ হন। নানকসাহা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহায়তায় কারাগার থেকে মুক্তি পান। অতঃপর উক্ত নানকসাহা পুরী গমন করেন এবং তথায় জগন্নাথ দেব দর্শন করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় চাঁচিয়াড়া

গ্রামে সঙ্গত স্থাপন করেন এবং তথায় জগন্নাথ বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। জঙ্গল কেটে ফকিরগঞ্জ নামক গ্রাম বসিয়ে নিজ নামে জিতসাগর নামক একটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন এবং নানকসাহাকে বাস করান ও নিজে নানকপন্থী ধর্ম গ্রহণ করেন। জিতসাগর আজিও পুরুষোত্তমপুরের নিকটে বর্তমান আছে, ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জিতনারায়ণের মৃত্যু হয়।

কাশীজোড়া রাজ্যে এরপর রাজা হন জিতেনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র নরনারায়ণ রায়। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করেই ময়না রাজার সাথে যুদ্ধ করেন এবং ময়না রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নিজ রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। রাজ্যমধ্যে জয়পাটনা গ্রামে জয়চণ্ডী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে অনন্তবাসদেব, দেড়াচক গ্রামে গোবর্দ্ধনধারী ও খসরবন গ্রামে গোপালজীর মূর্তি স্থাপন করেন এবং তাঁদের সেবাদি সুবন্দোবস্তের জন্য ভূসম্পত্তিও দান করেন। নরনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলি আজিও উক্তগ্রাম সমূহে বর্তমান আছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়।

নরনারায়ণের পুত্র রাজনারায়ণ রায় অতঃপর কাশীজোড়ার রাজা হন। ইনিও পিতার মত অত্যন্ত শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হয়েই জঙ্গল কেটে রাজবল্লভপুর গ্রাম নিজনামে স্থাপন করেন ও তথায় নিজ বাসোপযুক্ত একটি গড় নির্মাণ করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথজীর মূর্তি স্থাপন করে রঘুনাথবাড়ী গ্রাম প্রকাশ করেন। এই গ্রামে রঘুনাথ জীউর মন্দির নির্মান করে প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরিদাস বাবাজী নামক এক বৈষ্ণবকে মহন্ত পদে অভিষিক্ত করে কতক জমিদারী দান করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহাপুর রাজার সাথে যুদ্ধ করে সাহাপুর অধিকার করেন। এই সাহাপুর বাস্থলী দেবীর সেবার জন্য ৩৬০/০ জমি দান করেন। কতক সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকেও দান করেন। রাজনারায়ণ

রায়ের রাজত্ব কাল বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেমন বীরযোদ্ধা ছিলেন, তেমনি ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার রাজত্ব কালেই "শীতলামঙ্গলে"র অমর কবি নিত্যনন্দ চক্রবর্তীও "সারদামঙ্গলে"র কবি দয়া রামদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরনারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি স্বজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে আনয়ন করেন এবং বিভিন্ন জাতীর লোকদিগকে নিষ্কর ভূমি দিয়ে নিজ রাজ্যে বাস করান। রাজবল্লভপুর ছিল তৎকালে বিশেষ উন্নত গ্রাম। এই গ্রামে বিভিন্ন শিল্পীর বাস ছিল। এখানে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য উৎপাদন হোত। তাই তিনি এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করে সুন্দরনগর আখ্যা দেন। এই গ্রাম আজিও বর্তমান আছে। সুন্দরনগর গ্রামের সন্নিকটে জোড়াপুকুর নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর উৎসাহে মছলন্দ শিল্প পরিচালিত হোচ্ছে। ইঁহারই রাজত্বকালে কাশীনাথ বর্মা রেশম ব্যবসা করে প্রভূত উন্নতি করেন। কাশীনাথ দামোদর বর্মমান পূর্বপুরুষ। কাশীনাথ বর্মার নামানুসারেই কলকাতার উত্তরে কাশীপুর স্থানটির নামকরণ হয়। এখন যে স্থানে কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাকটারী অবস্থিত সে স্থানেই ইংরাজদের সুতার গুদাম ঘর ছিল। (নগেন্দ্রনাথ শেঠের গ্রন্থ) কাশীনাথ বাবুর পড়ো অট্টালিকা আজিও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় সুন্দরনগর গ্রামে বর্তমান আছে। ইহা তৎকালে গৌরী নদীর তীরেই ছিল।

কাশীনাথ সুন্দরনারায়ণের কলিকাতাস্থ এজেন্ট ছিলেন। জমিদারী সম্পর্কিত বিষয়ে পাঁচ বছর ধরে রাজার সাথে কাশীনাথ বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন কোম্পানীকে দেয় খাজনার জমিদার এবং জমিদারী সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে কাশীজোড়া রাজার ব্যবস্থাপক। কিন্তু কাশীনাথ কয়েকটি কিস্তির টাকা

বাকী ফেলেন। এই জন্য কাশীনাথ ও রাজার মধ্যে দেনা পাওনা নিয়ে মতান্তর চলতে থাকে।

বর্ধমানের কালেক্টার কাশীজোড়ার হিসাব পত্র অনুসন্ধান করে দেখেন যে, কাশীনাথের নিকট গভর্ণমেন্টের ৭২,৫৫৮-৯-৭ পাই পাওনা আছে। এইটাকা আদায় করবার জন্য সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের আদেশে কাশীনাথকে হাজতে পাঠানো হয়। কাশীনাথ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে জামিনে মুক্ত হন। কাশীজোড়া সংক্রান্ত হিসাবপত্রের বিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করার জন্য কাশীনাথ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করেন। কাশীনাথ উক্ত টাকা জমা দেন এবং গভর্ণর জেনারেল হিসাবপত্র ভালভাবে পরীক্ষা করবেন বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন। হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখবার ভার পড়ে খালসা রেকর্ডের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর। ঐ বৎসরেই তিনি হিসাবপত্র দেখে একটি রসিদ দেন। কিন্তু রিপোর্ট কাশীনাথের অনুকূলে ছিল না, তাই তিনি এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান।

"কাশীনাথ বাবু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট উক্ত রাজার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করেন। তাতে রাজাকে ধরবার জন্য ওয়ারেণ্ট বের হয়। শেরিফকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাজা তিন লক্ষ টাকা জামিন দিলে তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। শেরিফের লোক আসার আগেই সুন্দরনারায়ণ জানতে পেরে আত্মগোপন করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় প্রত্যাগমন করেন। তারপর তাঁর জমিদারি ক্রোক করবার জন্য পুনরায় পরওয়ানা বের হয়। এবং তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য শেরিফ সার্জেনসহ ৬০ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি প্রেরণ করেন। তাতে রাজা গভর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করেন যে, উক্ত সার্জন ও অস্ত্রধারীগণ তাঁর কর্মচারীগণকে প্রহার ও আহত করেছে, দরজা ভেঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে, অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছে,

দেবতার অলংকারাদি খুলে নিয়ে দেবমন্দির অপবিত্র করেছে এবং প্রজাগণকে নিষেধ করে খাজনা আদায় বন্ধ করেছে, এরূপ হলে শাসনকার্য অচল হবে বিবেচনা করে গভর্ণর জেনারেল উক্ত আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালন করতে রাজাকে নিষেধ করেন এবং মেদনীপুরের সৈনিক কর্তৃপক্ষের উপর আদেশ করেন যে যেন শেরিফের উক্ত লোক সকলকে পথে আটক করে। তদনুসারে তারা পথে ধৃত হয়। এই সময় গভর্ণর জেনারেল রাজা, জমিদার ও চৌধুরীগণের প্রতি আদেশ করেন যে, কোন বিশেষ চুক্তি না থাকলে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করবে, এবং দেশীয় প্রধান সৈনিক কর্তৃপক্ষকে ঐরূপ কাজে সাহায্য করতে নিষেধ করেন। সুপ্রীমকোর্ট তাঁদের কর্মচারীগণকে গ্রেপ্তার করে সাধারণ জেলে রাখা হয়েছে বলে কোম্পানীর এটর্ণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, এবং গভর্ণর জেনারেলকে উক্ত কাশীনাথের মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য শমন দেন। কিন্তু সুবিখ্যাত হেষ্টিংস সাহেব প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আমি শাসন ক্ষমতানুসারে যে কাজ করছি, তাতে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ পালন করতে বাধ্য নই, এই ঘটনা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হয়। এই সময়ের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের উক্ত প্রকার অত্যাচার নিবারণের জন্য কলকাতাবাসী সাহেবগণ ও গভর্ণর জেনারেল পার্লামেন্টে আবেদন করেন। তদনুসারে পার্লামেন্টের নূতন আইন দ্বারা সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।" ( Marshman's History of Bengal, 8th, Edition, pp. 225—27 )।

এরপর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেব ৬০ হাজার টাকা, রাজস্ব বাকির জন্য রাজার জমিদারী ক্রোক করেন। তাতে রাজাবাহাদুর বাকি কর থেকে অব্যাহতি ও নূতন বন্দোবস্তের জন্য প্রথমে কালেক্টর সাহেবের নিকট, পরে সদর বোর্ডে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সদর বোর্ডের হুকুম আসতে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হওয়ায়

এবং জমিদারী ক্রোক থাকার জন্য খাজনাদি আদায় না দেওয়ায়, সুন্দরনারায়ণের দেবসেবাদি খরচ নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। রাজা তখন বাকীর কাগজে দস্তখত করে কতকগুলি দেবোত্তর সম্পত্তি খালাস নিয়ে বাকী অন্য সব সম্পত্তিসহ জমিদারী ছেড়ে দেন। এর ঠিক ১৫ দিন পরেই সদর বোর্ড থেকে হুকুম আসে যে, "বাকি কর খালাস দেওয়া যায় ও নূতন বন্দোবস্ত হয়।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৫ দিন পূর্বে বাকীর কাগজ দস্তখত করায় কালেক্টর সাহেব তা' মঞ্জুর না করে ১৩ ভাগে জমিদারী নিলাম করেন। সে সময় রাজা ১৯ হাজার বিঘা জমি লুকিয়ে রাখার জন্য সরকারের কাছে মাসোহরার কোন আবেদন করেন নি। কিন্তু তালুকদারগণ ক্রমে ক্রমে রাজাকে উক্ত লুকান জমি থেকে বেদখল করলে, রাজা কলেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন। তখন কালেক্টর সমস্ত জমি জরিপ করার জন্য ৯ জন কানুনগো নিযুক্ত করেন। ৯ হাজার বিঘা জমি জরিপ হওয়ার পর তালুকদারগণ কৌশল করে দশশালা বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করেন। তাতে কালেক্টর সাহেব মাপ বন্ধ করে রাজা বাহাদুরকে আদেশ দেন যে, "যে সময় সরকারের দরকার পড়বে, সেই সময় দরখাস্ত করবেন।" তাতে রাজা সুন্দরনারায়ণ নিরাশ হয়ে কষ্টে দিনযাপন করতে থাকেন। এবং পরিশেষে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তারপর তাঁর পুত্র বস্তিনারায়ণ রায় রাজাসন প্রাপ্ত হয়ে পুনর্বার কালেক্টর সাহেবের নিকট পূর্বোক্ত লুকান জমি পাওয়ার আশায় দরখাস্ত করে পূর্বমত হুকুম পেয়ে কষ্টে দেবসেবা ও জীবিকা নির্বাহ করে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। এরপর পুত্র লক্ষীনারায়ণ রায় রাজা হন। ইনিও সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এরপর রুদ্রনারায়ণ রায় রাজা হন। বর্তমানে এই রাজবংশ অতি দীনভাবে কাশীজোড়াতে বর্তমান আছেন।

'মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি' পাঠে জানা যায় কাশীজোড়া রাজসভায় সুদর্শন ভৌমিক নামক একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। "পাঁশকুড়া থানার এলাকাবাসী বাবু কৃপারাম রায় এবং বাবু সদারাম রায় মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে বহু পূর্বে মহোচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তর মার্কণ্ডপুরের বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস ইঁহাদের বংশধর।" পৃঃ ১১৩।

**ময়না** ॥ 'ময়না' এই শব্দটি "মোহনা" শব্দের অপভ্রংশ। বহু শত বৎসর পূর্বে কংসাবতী ( কপিশা ) ও কেলেঘাই নদীর মোহনা থেকেই জেগে উঠে এই চর। তখন লোকে একে 'মোহনাচর' বলত। এই 'মোহনাচর' শব্দটি ক্রমে ক্রমে ময়নাচর>ময়নাচোর> শেষে ময়নাতে এসে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন এই নূতন জেগে উঠা ময়নাচর ছিল জনবসতি শূন্য নির্জন স্থান। ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত প্রভৃতি কবিগণের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় এই ময়না ছিল লাউসেন রাজার গড়। বিস্তৃত ময়না রাজ্যের তিনি ছিলেন রাজা। লাউসেন রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ধর্মমঙ্গলোক্ত কাহিনীর পিছনে কিছু সত্য নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে এমন একটি বলিষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারত না। "মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে—"ধর্ম মঙ্গল" কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণ সেন ও রঞ্জাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।...রামাই পণ্ডিত গৌড়ের পালরাজগণের সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কালে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।" পৃঃ ৬০২

কিন্তু আমাদের আলোচ্য হচ্ছে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে নয়, 'ধর্মমঙ্গলোক্ত' ময়না কোথায় ছিল তাই। বহুদিন ধরে বহু পণ্ডিত এই নিয়ে বহু গবেষণা, ও বহু অনুসন্ধান করেছেন। এস্থলে তাঁদের গবেষণার বিষয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করাও সম্ভব নয়। তবে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা' হোল বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই বলেছেন, 'বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান 'ময়নাপুর'ই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এতকাল পর্যন্ত বাস করিয়াছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীলনারায়ণ ও 'চাঁদ রায়।' (শূন্য পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ৭৩)।

বসন্ত বাবুর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" লেখক বিনয় ঘোষ মহাশয়। তিনি নিজে দুইটি ময়না পরিভ্রমণও করেছেন। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার এই "ময়নাপুর" ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিগণের বর্ণিত ময়নানগর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ, উক্ত কবিগণ তাঁদের পুস্তকেই ময়না যে কোথায় ছিল, তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

হরিদাস তাম্বুলিকে লাউসেন নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন—

"ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ অবণী।
পিতা মোর কর্ণ সেন মাতা রঞ্জাবাণী ॥"

তারপর লাউসেন এলো রমতি নগরে। সেখানে দেখা হোল কর্মকার লাউ দত্তের সাথে। কর্পূর আর লাউসেনের সুন্দর-সুঠাম শরীর দেখে কর্মকার জিজ্ঞেস করলে পরিচয়। পরিচয় দিল লাউসেন—

"ময়না নগর বাটী সাগর সমীপ।
পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ ॥" পৃষ্ঠা, ১২৯

হস্তি-বধ পালায় রাজা যখন আবার পরিচয় জিজ্ঞেস করছেন লাউ সেনের। সেখানেও বলছেন লাউসেন—

"অবনী অনল অংশে উদধি সমীপ।
নিবসতি ময়না নগর নরাধিপ ॥

এই সমস্ত উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় ময়না ছিল সমুদ্রের সন্নিকটে। সেই ময়না রাজ্যেই কর্ণ সেন রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে তিনিই বোধ হয় প্রথম জেগে ওঠা চরে ময়না রাজ্যের ভিত স্থাপন করেছিলেন। তৎপূর্বে জয়পতি মণ্ডল ঐসব জায়গার জায়গীরদার ছিলেন।

সম্প্রতি গবেষক পণ্ডিত অক্ষয় কয়াল মহাশয় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আমায় পত্র দিয়েও জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"ধর্মমঙ্গল-বর্ণিত ময়না যে তমলুকের অন্তর্গত, ( লাউ সেনের কাহিনীতে ঐতিহাসিক ছাপ থাকুক বা না থাকুক ) সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতকের শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলে লাউসেন কামারের কাছে স্বীয় পরিচয়ে বলিতেছেন—

'ময়না দক্ষিণ দেশে উৎকল বলিয়া ঘোষে
সেই দেশেতে মোর স্থিতি।'

( বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫১৪ )

ঐ শতকের রূপরাম ধর্মমঙ্গলের স্বর্গারোহণ পালায়—

'নানাবর্ণে বাদ্য বাজে ওৎকল ময়না।
স্বর্গ জায় লাউসেন উঠিল ঘোষণা।'

( সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ২৫৬০ )

ঐ শতকের বাঁকুড়ার কবি সীতারাম দাসের আখড়া পালায় মোহিনী বেশী অভয়া লাউসেনকে বলিতেছেন—

"না পাইল নাগর পরাণে হল্য শোক।
হাসিতে হাসিতে রাজা পালাও তমলোক।

তমলোকে তোমার পালাঙ সমাচার।
এত বলি নয়নে ইঙ্গিত একবার॥”
( সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ২৫৬১ )

কয়াল মশাই-এর আবিষ্কৃত তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তমলুকের কাছেই ছিল ময়না রাজ্য। বর্তমান ময়না তমলুকের পশ্চিমে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন—“ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়না নগর রাঢ় ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, ‘ময়না নগর বাটি সাগর সমীপ’। ইহা হইতে মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে ময়নানগর অবস্থিত ছিল। তমলুক মহকুমায় ময়না নামক এখনও একটি স্থান আছে।’ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫৯৩।

গৌড় থেকে ময়না আসতে জলপথ ও স্থলপথে তখন যে সব রাস্তা ছিল এবং দেশ ছিল, সেই সমস্ত দেশ এখনো তমলুকের নিকটে অনেকগুলি বর্তমান আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান এ নয়, তবে দু’চারটি পংক্তি উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

গৌড় থেকে ফিরে আসছেন লাউসেন নিজ রাজ্য ময়নায়। সংগে বীর কালুডোম আর তাঁর স্ত্রী সনকা। পথের বর্ণনার মধ্যে একস্থানে আছে—

“মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে॥
সেদিন সেখানে রণ থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীজোড়া॥
কুতবপুর রাখ দূর পরম সন্তোষ।”
( ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল )

প্রতাপপুর, কাশীজোড়া, কুতবপুর প্রভৃতি স্থানগুলি আজো বর্তমান আছে এবং এগুলি ময়নার কাছাকাছি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী পুস্তকে মানচিত্র সহ প্রকাশের ইচ্ছে থাকল। সবশেষে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্তমান তমলুকের ময়নাই প্রাচীন ময়না নগর। তবে বর্তমান 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধিধারী রাজবংশধরগণ যে গড়ে বাস করে আছেন, এই গড় প্রাচীন লাউসেনের গড় কিনা তা' নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তিলদার গড় বহু প্রাচীন, একদা সামুদ্রিক বন্দরও ছিল, এ কথা পূর্বেই আমরা প্রকাশ করেছি। হয়ত তিলদার গড় লাউসেনের রাজবাটী হতে পারে, এমন কথা বলা যেতে পারে। তাই বলে দাশগুপ্ত পরেশ বাবুর মতে আমি জোর দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারছি না। বর্তমান ময়নাগড় সম্পর্কে ৬২ বৎসর আগে 'তমোলুক ইতিহাসে' যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই এখানে উদ্ধৃত করছি–

"ময়না রাজবংশের আদিপুরুষ গোবর্দ্ধনানন্দ সবঙ্গ পরগণার জমিদার ছিলেন। ইনি উৎকল রাজার সেনাপতি কালান্দিরাম সামন্তের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ হইতেছেন। (মধ্যের চারি পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না)।* ইনি নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ না করায় দেবরাজ প্রেরিত সৈন্য কর্তৃক উৎকলে নীত ও কারারুদ্ধ হন। তদবস্থায় সুযোগক্রমে আপন সংগীত মল্লবিদ্যা দ্বারা দেবরাজ বাহাদুরকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিয়া বাকি কর ক্ষমা সহ রাজ্য ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি এবং পৈতা (একমাত্র রাজার, রাজটীকাসহ পৈতা গ্রহণ ভিন্ন, দ্বিজ জাতির ন্যায় আদৌ উপনয়ন সংস্কার হয় না।) [রক্ষিত মহাশয়ের এইরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 'জানা' বংশের কোর্ষিনামা প্রকাশ করব,

---

* মধ্যের এই চার পুরুষের নাম হোল (১) ধরণীধর সামন্ত (২) বৈষ্ণবচরণ সামন্ত (৩) চৈতন্যচরণ সামন্ত (৪) নন্দীরাম সামন্ত। সাহিত্য-তত্ত্ব-বারিধি, পৃঃ ১৩২।

তাতে স্পষ্টই লেখা আছে এই জাতির পৈতা ছিল, শুধু রাজা নয়, রাজবংশধরগণও বংশপরম্পরায় পৈতা ব্যবহার করতেন।] ছত্র, নিশান এবং ডঙ্কা প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু তৎকালিক ময়না রাজা শ্রীধর হুই রাজকর প্রদান না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করায় তাঁহাকে শাসনসহ ময়না পরগণা অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক যুদ্ধ দ্বারা শ্রীধর হুইকে নির্বাসন করিয়া ময়না পরগণাও শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্বে উক্ত ময়নাগড় গৌড়াধিপতির শালীপতি কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র রাজা লাউসেন (যাঁহার ইতিহাস কবি দ্বিজরূপরাম, কবিরত্ন ঘনরাম চক্রবর্তী, কবি নৃসিংহ বসু ও কবি মাণিক গাঙ্গুলির রচিত পৃথক পৃথক চারিখানি ধর্মায়ণ ও ধর্মসংগীত নামক পদ্য পুস্তকে প্রকাশ আছে।) ও তৎপুত্র রাজা চিত্রসেন রাজত্ব করেন। শ্রীধর হুই ঐ বংশের কোন শাখা কি অন্য বংশের ছিলেন তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং গোবর্দ্ধনানন্দের পূর্বপুরুষের বিস্তারিত বিবরণও দৃষ্টিগোচর হয় না। গোবর্দ্ধনানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন, এবং ময়নাগড় দুর্গম দেখিয়া তথায় রাজধানী করিয়া বাস করেন, ও তিলদাজলচক গ্রামেও একটি গড়বাটী নির্মাণ করেন। (তিলদা নামক স্থান কিন্তু বহু প্রাচীন।) তাঁহার মৃত্যু হইলে মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র, গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র, কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ক্রমান্বয়ে ময়না সবঙ্গ পরগণায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকালে কয়েক বৎসর উপর্যুপরি ফসল অজন্মাহেতু ও অপরিমিত দায়িত্বহীন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় সবঙ্গ পরগণা নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তমর্ণগণের প্রাপ্য আদায় জন্য ময়না পরগণার অধিকাংশ গ্রাম ও নিষ্কর ভূমি খণ্ড খণ্ড

রূপে নিলামে বিক্রয় হয়। ঐ সকল বিক্রী অংশে এক্ষণে শত শত তালুকদারের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকাল জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে ইহার পুত্র রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাসন প্রাপ্ত হন। ইনি অতি মিষ্টভাষী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সহিত সমব্যবহারগুণে পরগণার প্রজাবৃন্দ ইঁহার দ্বারে পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার্থ প্রার্থিত হইত এবং ভেটী প্রদান করিত। তজ্জন্য ইহার যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সেই বর্দ্ধিত আয়ের সৎব্যবহার দ্বারা নিজ গৌরব বৃদ্ধির সহিত অনেক রাজার আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হওয়ায় উপরোক্ত বৃদ্ধি আয় সহ গৌরব অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার তিন পুত্র—প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্রেরও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে। পৃঃ ৯১—৯২।

বর্তমান রাজগণ যে গড়ে অবস্থান করছেন তার পরিমাণ ফল ৩০০ শত বিঘারও অধিক। ইহার চতুর্দিকে কালিদহ পরিখা, বিস্তার ১৭৫ ফিট, দৈর্ঘে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৭৫০ ফিট। ইহার চতুর্দিকে উচ্চ ভূখণ্ড পরিসর ২০০ শত ফিট, দৈর্ঘে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ হাজার ফিট। বাইরে মাকরদহ, বিস্তার ১৭৫ ফিট, প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ ১৪০০ শত ফিট, গভীরতা ৮ থেকে ১৫ ফিট, উক্ত পরিখাদ্বয়ে কুমীর ও মৎস্যাদি ছিল। পূর্বে উভয় পরিখার মধ্যবর্তী স্থান উচ্চ ভূখণ্ড ঘনাবৃত দুর্ভেদ্য পার্বত্য বাঁশের ঝাড় ও বহুবিধ পাহাড়ি বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সব অরণ্যে হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্য জন্তু বিচরণ করত। এক্ষণে ঐসব জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে শস্যক্ষেত্র ও টাইল কারখানা স্থাপন হয়েছে। গড়ে উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বংশধরগণ কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# একটি নবাবিষ্কৃত কোর্ষিনামা

এখন আমরা যে কোর্ষিনামাটি এখানে উদ্ধৃত করছি, এটি তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার বিকলিয়া গামের বিখ্যাত 'জানা' বংশের পূর্ব ইতিহাস। এই কোর্ষিনামাটি এতদিন অনাবিষ্কৃত ভাবে উক্ত বংশের বংশধর ব্যায়ামাচার্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ জানা মহাশয়ের কাছে রক্ষিত ছিল। সর্বপ্রথম আমায় এই পুঁথিটির সন্ধান দেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়, তাঁরই নির্দেশে আমি বিকলিয়া থেকে এই কোর্ষিনামার অবিকল নকল করে আনি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই বংশেরই সুসন্তান। এই বংশের ৩৭ পুরুষ প্রসাদ জানা এই কোর্ষিনামার সংগ্রাহক ও রচয়িতা। বর্তমান ৪৩ পুরুষ চলছে। আজ থেকে তাহলে ৬ পুরুষ আগে এই কোর্ষিনামাটি লিখিত হয়েছিল। ৩ পুরুষে যদি একশত বছর ধরি তাহলে আজ থেকে প্রায় দু'শত বছর পূর্বে এটি সংকলিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু লেখার ছাঁদ দেখে মনে হয় দেড়শত বছরের বেশী পুরান নয়।

এই বংশ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের বংশ। খুব সম্ভবত রাজা মুকুন্দদেব ১৫৫০ থেকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেবকে পরাজিত করেন। মুকুন্দদেব থেকে ১৪ পুরুষ হরিবল্লভ দেব উড়িষ্যার শেষ প্রান্তে রাইমণি কেল্লার রক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়েই বাংলা ১০১২ সালে এই কেল্লার জীবন শেষ হয়। এই বংশ ঐ সময় অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেদিনীপুরে চলে আসে। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনি বীরত্বপূর্ণ। এই সংগে আমরা তৎকালিক তাম্রলিপ্তের অনেক অজানা ইতিহাসও জানতে পারব।

রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ইতিহাস এই কোর্ষিনামা থেকে অনেকাংশ জানা যাবে। তাই তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে এই কোর্ষিনামা আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আমরা নিম্নে এই কোর্ষিনামার অবিকল নকল উদ্ধৃত করছি—

## বংস পরিচয়

প্রভূ জগন্নাথ পদে করিএ প্রণাম।
বংসাবলি লিখিলাম শুন দিয়া মন॥
পুরি রাজবংশে জন্মি কর্মফল গুণে।
অধিষ্ঠান হল পরে ভুবনেশ্বর ধামে॥
দেবপূজা ভার লয়ে থাকে সুখে সেথা।
বংস বৃদ্ধি হয়ে শেসে যায় যথা তথা॥
রাইমণী নামে দুর্গ আছে নদী ধারে।
তথায় করিল হানা রাজ্য রখিবারে॥
মুকুন্দদেবের জায়া রাণী রাইমণি।
সেই নামে গড় হয় রাখিতে অবনী॥
তথায় করিলা বাস বহু জ্ঞাতিগণ।
হাতী ঘোড়া লয়ে থাকে হরসিত মন॥
সেকালে একদিন গভীর নিশিতে।
পাঠানের সৈন্যদল এল আচম্বিতে॥
ষোলশত সেনা সহ দারে হানা দিল।
দক্ষিণ দ্বারেতে ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল॥
তিনদিন যুঝে সবে করি প্রাণপণ।
অবশেষে গেল সবে সমন ভবন॥
সব সেনা মরিলেক হাতি ঘোড়া সহ।
মরিলা সকল জ্ঞাতি নাহি রহে কেহ॥

তখন রমণীগণ রণে দিলা হানা।
জয়কালী বলি পড়ে অস্ত্রের ঝনঝনা॥
মারিআ বহুত সেনা উজাড় করিলা।
অবশেষে পড়িলেক সব রাজবালা॥
বিধির অপূর্ব লিলা কহা নাহি যায়।
স্মরিলে সে সব কথা প্রাণ বাহিরায়॥
পঞ্চজনা নর আর চারি জনা নারি।
কোনমতে রক্ষে প্রাণ পরিখা সাঁতারি॥
নহিলে বংসের চিহ্ন রহিত না আর।
কি কব দুঃখের কথা নাহি পারাবার॥
কোথাএ রহিলে আজ পুরনারিগণ।
কোথায় রহিলে পিত্রিপিতামহগণ॥
স্বর্গধামে সবে গেলা করি ঘোর রণ।
হেথায় দুঃখের কথা করগো স্মরণ॥
কোথা রাজা কোথা ধন কোথা গেল পুরি।
এ ঘোর অরণ্য মাঝে সহায় শ্রীহরি॥
কোথায় সাবিত্রী রাণী করিআ সমর।
শতশত সৈন্যে মারি গেলা যম ঘর॥
মস্তক তোমার দেবি কাটি লয়ে গেল।
অধম সন্তানে মাগো হৃদে দেহ বল॥
বহু পুরনারি সহ যুঝিলে সমরে।
সকলিত গেল চলি কৃতান্ত আগারে॥
সতী ধর্ম্ম সবে নাহি দিয়ে বিসর্জ্জন।
ক্ষত্রিয় বনিতা হয়ে সধর্ম্ম পালন॥
অমানিশা ফাল্গুনের সংক্রান্তি দিনেতে।
চলি গেলা সবে সর্গে দুন্দুভি ধনিতে॥

ভুবন ভরিআ যম রাখি গেলা সবে।
বংসের তনয় সবে নাহি পাসরিবে॥
অশ্রু মাত্র চিরতরে করিএ সম্বল।
অধম প্রসাদ লিখে হৃদে নাহি বল॥
বংসের তনয় সবে যে যেখানে থাক।
স্মরহ পূর্ব্বের কথা কভু ভুল নাক॥
যশমান কুল ধর্ম্ম উদ্ধারিতে সবে।
করিহ সংগ্রাম যদি দিন পাহ ভবে॥
ধর্ম্মরাজ্য ধর্ম্মপুরি যারা নষ্ট কৈল।
তার রাজ্য ধ্বংস হবে পাপ পূর্ণ হৈল॥
যথাধর্ম্ম তথা জয় চিরদিন হয়।
কর্ম্মফল ভোগ তরে জয় পরাজয়॥
সমূলে পাঠান বংশ তরা ধ্বংস হবে।
শ্মশান হইবে পুরি সিবা বিচরিবে॥
সেই মত লিখি আমি করিএ প্রকাশ।
বংসের সন্তান তার মনে রাখি আস॥
বহু বহু বীর জন্মি জয়ডঙ্কা লয়ে।
রাখিলা বংসের মান ভুবন ভরিত্র॥
যতসব রাজগণে কন্যা নিল দিল।
যাহারা অচল সবে পড়িয়া রহিল॥
দেবস্থান বাস্তুধাম অতি সন্তর্পনে।
বাস্তুনাগ রহে হেথা দক্ষিণের কোণে॥
দেবনারি আছে বৃক্ষে সেত বস্ত্র পরি।
এই দুই যেবা দেখে ভাগ্যের সঞ্চারি॥
মাঝে মাঝে দেখা দেন পুরনারিগণে।
অস্তিত্ব জানায় তাঁরা মঙ্গল কারণে॥

দুরে থাকি নাহি ভাষে মনে নাহি আস।
হেথাএ আসিলে হবে জ্ঞান পরকাস॥

রাজা হরি রাজ্য পেয়ে পুন তাহা জায়।
তথাপি অক্ষয় বংশ ক্ষয় নাহি পায়॥

অধিক কহিতে মোর নাসরে বচন।
বংসবেতে একদিন করিবে সরণ॥

পিতৃ পুরুষের গাথা মঙ্গল কারণ।
শ্রীহরি পদারবিন্দ করিএ স্মরণ॥

হে হরি বিশ্বের পতি করুণা নিদান।
ভবে কেন এত দুঃখ কিসের কারণ॥

তব মূর্ত্তি জগন্নাথে সেবি গুরুজন।
লভিলা অক্ষয় সর্গ পুণ্যের কারণ॥

সেই বংসে জন্ম লভি সেই রক্ত ধরি।
বিচার করিলে কিসে ভবের কাণ্ডারি॥

তবমান রক্ষিবারে পুরি ধ্বংস হইল।
পিতৃপিতামহগণ রণে সব মৈল॥

তারসহ মরিলেক পুরনারিগণ।
অশ্বপৃষ্টে বর্সা লয়ে করি ঘোর রণ॥

কি শোধ লইলে রাজা রাজদণ্ড ধরি।
অরণ্য বাসেতে হেথা ঘোর দুঃখে মরি॥

হাতি ঘোড়া অগণিত লাখ লাখ সেনা।
নিমেসে উড়াতে পার পাঠানের হানা॥

জ্ঞাতির নিধন দেখি হরসিত মন।
ইহা যদি সত্য হয় অবস্য নিধন॥

তোমার নিকটে করি এই নিবেদন।
অবশ্য করিয়ে তাহা রাজার বিধান॥

জয় জয় জগন্নাথ করুণা নিদান।
অধম প্রসাদে দিও শ্রীচরণে স্থান॥

শ্রীশ্রীহরি—

## বংসাবলী পরিচয়

পুরী রাজা মহামতি শ্রীমৎ মুকুন্দদেব তস্য ভ্রাতা রঘুনাথদেব তস্য নিবাস বায়ান্ন বাটী মর্দ্ধে ছিল তৎপরে খুবদায় গিয়া বসত করে ঘবাও বিবাদ ক্রমে বসত বাটী ছাড়িয়া জায়া পুত্রাদি সমভিবাহারে ভুবনেশ্বর মন্দিরে আসিয়া তথাকার জমিদারী নিয়া তথায় বসত করে ও সেহেও মন্দিরের সেবা পূজার খিচমত করিতে থাকে ভুবনেশ্বর মন্দিরের চল্লিশ হাজার বিঘা ছিল—

সে মতে মুল বংশ পরিচয় রাজা মুকুন্দ দেবকে জানানায় তদউর্দ্ধ পুরুষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই—
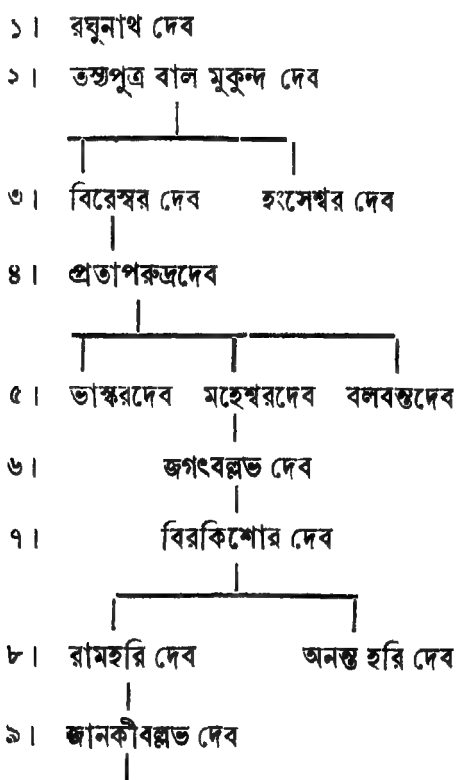
আন্দাজ ১৭০ বৎসর মর্দ্দে এতক কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নাই জাহা লিখা যায় এতক কাল মর্দ্দে কটক ও বালেশ্বর জেলায় বহু স্থানে বহু কুটুম্বিতা হইআছে বহু জাতি নানাস্থানে লখরাজ আদি লইয়া বাস করিতেছে তাহারা দেশাচার ক্রমে ক্রমে পট্টনাএক ও মাহান্তী পদবী নিজেরা মনফাই মতে লইয়াছে তাহারা কেহই পুরী কি খুরদার জমিদারির ভাগ বখরা পায় নাই তাহাদের কোনো পরিচয় এথায় দেওয়া গেল না গৌরীনাথ অপুত্রক মরে ভুবনেশ্বরে * * বহু জ্ঞাতি হওয়া আপনারা বিবাদ করিতে থাকে সে মতে হরিবল্লভ ওখান হইতে আসিয়া পুরা রাজ্যের হুকুম স্মুরত উড়িষ্যায় প্রান্তে রাইমণা কিল্লায় বাস করিলেক তারানাথ কর্ণগড় রাজার কন্যাকে বিবাহ করে তাহার নাম লক্ষ্মীমণা দেই তারানাথ পবে মহিমানিত পুরীরাজের হুকুম স্মুরত নদী পারে চন্দ্রায়নী কিল্লায় বাস করিলেক রাইমনী কিল্লা আড়দীর্ঘ্য চার যোজন ছিল পাঁচ হাজার সেনা বহু হাতী ঘোড়া তথায় থাকিবার উপায় ছিল চারটি গড়খাই পার হইয়া সেথায় যাইতে হইত নদী কতক দূরে ছিল রাইমনী কিল্লার চারিধারে চল্লিশ হাজার বিঘা জমি ছিল ওড়িষ্যা রাজধানী

রক্ষার্থ ওহার দুই জনা হরিবল্লভ ও তারানাথ দুই পার্শ্বে বহু সেনা হাতী ঘোড়া আদি লইআ বাস করিলেক[১]।

---

১ উড়িষ্যার প্রান্তে এই রাইমণি কেল্লা কোথায় আছে অনুসন্ধান করার জন্ম আমি গত ২৩শে জুন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মঙ্গলবার উড়িষ্যা যাত্রা করি। দাঁতন দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে বালেশ্বর জেলায় উপস্থিত হই। লোকের মুখে শুনি ঐ জেলায় বিরাট রাজার গড় আছে। শুনে আশ্চর্য হই। হেথায় আবার বিরাট রাজার গড়! সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মহাভারতীয় যুগের সেই গড় কি আজো অভগ্ন অবস্থায় উড়িষ্যাতে থাকা সম্ভব। যাইহোক আমরা দু'জন সাথী সহ ফলতাগড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুত রাধিকারঞ্জন দাস মহাপাত্রের আতিথ্য গ্রহণ করে উক্ত বিরাট রাজার গড় দেখতে যাই। যেয়ে যা দেখলাম, তা আমার এই কোষিনামার সাথে অবিকল মিলে যায়। এখনো চারটি পাথরের দেওয়াল ভগ্ন অবস্থায় বর্তমান আছে। প্রথম যে চার যোজন-এর কথা—অর্থাৎ দৈর্ঘ প্রস্থে ৩২ মাইল বর্গাক্ষেত্রাকারে উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় আজো বর্তমান আছে। গড়ের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। প্রথম পরিখার পর যে চল্লিশ হাজার বিঘা জমির কথা উল্লেখ আছে, তাতে এখন চাষ-আবাদ হচ্ছে। দ্বিতীয় গেট অর্থাৎ প্রাচীর-এর মধ্যে একটি গ্রাম আছে নাম রাইবনিয়া। এই গ্রামটি খুব সম্ভব রাইমণি কেল্লার শেষ স্মৃতি বহন করছে। এই গ্রামে ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে। গ্রামে কয়েকটি অবস্থাপন্ন লোকের বাসও আছে। গড়ের শেষ প্রাচীর ও পরিখা এখনো সুস্পষ্টভাবে অন্তত ৮।১০ ফুট উচ্চ বর্গক্ষেত্রাকার একরকম অভগ্ন অবস্থায় আছে। মধ্যে বড় বড় পুকুর এখনো দেখা যায়। কয়েকটি ঢিপি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে। সম্ভবত এইগুলি প্রস্তর নির্মিত বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। একটি নির্মিত প্রাসাদের কিংবা ঠাকুর বাড়ীর ভগ্নস্তূপ আজো আছে। এই বাড়ীর একাংশের আলোক চিত্র এই পুস্তকে প্রকাশ করা হোল। ইংরেজ রাজত্বের সময় এই গড়ের মধ্যে নীলের চাষও হয়ে ছিল। নীল তৈরীর চৌবাচ্চা দেখলে তা স্পষ্ট

বোঝা যায়। উক্ত মন্দিরের কাছে চণ্ডী ঠাকুর নামে একটি কারুকার্য-খচিত ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড পূজিত হচ্ছে। কে পূজক জানা যায়নি। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ এখানে মেলা বসে। সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় নাকি এখানে আসা যায় না। সকলেই ভয় করে। যেতেও বাধা দেয়। আমাদের প্রবল বাধা অগ্রাহ্য করেও যেতে হয়েছিল। উত্তরদিকে একটি গেট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী হয়েছিল, তা' এখনো বেশ বোঝা যায়। রাধিকারঞ্জনবাবু বললেন উড়িষ্যার ইতিহাসে নাকি এটি রাই বলিয়ার সিং-এর গড় বলে বর্ণিত আছে। ফকীর মোহন সেনাপতির এই গড়ের পটভূমিকায় একটি বই আছে নাম 'লছমি'। আসলে এই বিরাট রাজার গড় যে রাইমণিকেল্লা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দাঁতন থেকে এই স্থান ১২।১৪ মাইল পথ হবে। হাঁটা ছাড়া যাওয়ার কোন পথ নেই।

হরগোবিন্দ জানা পদবী ব্যবহার করিত এই পদবী রাজবংশের লোক ব্যতীত অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পারিত না গোপাল কিষ্টের ছয় পুত্র ছিল। তাদের বিবরণ পরে বলিব কিষ্টকিশোর বালীসীতা গড়ের দেওয়ান ও সেনাধ্যক্ষ ছিল তস্য পুত্র হরিনাথ বালীসীতা গড়ের কন্যা কমলিনী দেইকে বিভা করে বালীসীতার একটি তালুক যৌতুক পায় তদপরি সে অপুত্রক মারা যায়। ইহার আন্দাজ শতেক বৎসর রাইমনী কিল্লায় বাস করে সন ১০১২ সালের ফাল্গুন মাসে বহু মোছলমান ঐ কিল্লা চড়াও হইয়া তাহা ঘেরাও করে[১] ঐ কিল্লা চড়াও হইয়া তাহা ঘেরাও করে

---

১ বাংলা ১০১২ সাল অর্থাৎ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিহাসে এই সময় মোগল-পাঠান বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল-রাজ ভাণ্ডারের প্রধান হিসাব রক্ষক আবদুল রজ্জককে পাঠানেরা বন্দী করে নিয়ে যায়। শ্রীপুর অন্তয় নামক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রজ্জককে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়। এক ভীষণ দর্শন পাঠান ছিল তার রক্ষক। আদেশ ছিল তার উপরে যদি মোগলেরা জয়ী হয় তা'হলে রজ্জকের মস্তক খণ্ডিত করে যেন পাঠান শিবিরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলদের গোলার আঘাতে পাঠান রজ্জকের মৃত্যু হয় এবং পাঠানেরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। তখন তারা বাংলা থেকে উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়ে নতুন করে সুযোগের সন্ধান করেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠানেরা উড়িষ্যার ছোটখাট দুর্গ বাহুবলে জয় করেন। এবং পাঠান নেতা ওসমান খাঁ কুড়ি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে খুব প্রবল ব্যক্তি মনে করেন। খুব সম্ভবত ঐ সময় ১০১২ সালে রাইমনী কেল্লার ধ্বংস হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ওসমানের

তিনদিন যুদ্ধ হইবার পর বহু সেনা ঘোড়া হাতী বরকন্দাজ আদি মারা জায় তদপরে রাণী সাবিত্রী ও বহু রমণী ঢাল-তলওয়ার লইআ ঘোর যুদ্ধ করে ও শেষে সকল নারী মারা জায় ৫জনা পুরুষ ও ৪ জনা মেয়ে মানুষ কোনমতে পরিখা সাতরাইআ পলাইতে পারিআ ছিল সেওয়ায় উক্ত কিল্লার আর কেহ বাঁচে নাই কোথক ছেলেকে মুছলমান মারিআ জায় আর কোথক পরে পাওয়া জায় গোপাল কিষ্টের ৩ পুত্র জুদ্ধে মারা জায় জনেক বন্দী হইআ ছিল কিন্তু পরে পলাইআ আসে মোসলমানরা গড় লুঠ করে বহু ধনরত্ন লইআ জায় মৃত্য রাণীর মাথা কাটিআ জায় তেজষপত্র জাহা ছিল দিঘীতে ফেলাইআ জার কোবাট দোয়ার ভাঙ্গিআ চুর করে এমতে কিল্লার দফা রফা করে ছয় মাস মোছলমান লুট করিআ শেসে পলাইয়া জায় তদপরে বহুদিন কেহ থাকে নাই শেসে বর্গীরা তথায় কোথক দীন বসতী করিয়াছিল[১] সেতক সেথায় আর কেহ বাস করে নাই। আন্দাজ ৮০ বৎসর সে কিল্লায় বাস ছিল একাল মর্দ্ধে কেহ কেহ

---

অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব মোগলদিগকে বিস্মিত করেছিল। এই যুদ্ধে মোগল সেনাপতি সুজায়ত খাঁর প্রাণ সংহার হয় ও পরাজিত ওসমান খাঁ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন। সুবর্ণরেখার অনতি-দূরেই রাইমণি কেল্লা অবস্থিত।

১ বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে ১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বর্গী বিদ্রোহ চলে। এই সময় বর্গীরা নবাবের বিদ্রোহী কর্মচারী মীরহবিবের সহায়তায় হুগলী ও হিজিলি থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর পর্যন্ত, এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল করে নিয়ে ছিলেন। বালেশ্বর জেলায় এই দুর্গ অবস্থিত পূর্বেই বলেছি। সেই সময় লক্ষ্মী নামক কোন বিদেশী সুন্দরী রমণীকে রাজঘাট থেকে ধরে নিয়ে এসে বর্গীরা এই দুর্গে আটক করে। সে কাহিনী উড়িয়ার সাহিত্যিক ফকীরচন্দ্র সেনাপতি লছমি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

খণ্ডুরই তুর্কার বর্দিষ্ট বেত্তির সহিত কন্যা আদান প্রদান করে নেওয়ায় অন্য কোন ঘরে কেহ বিভা করে নাই জে সকল পুরুস ও মেয়ে মানুস কিল্লা হইতে পলাইআ আসিতেছিল তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ব্রজদুলাল ঠাকুরের বাটীতে কথক দিন ছিল ও সেইকালে মোছলমান বাদসার ভারি জুলুম ছিল মোছলমান চারিধারে লুটপাঠ করিত ধনী লোকের প্রাণের আশা খুব কম ছিল মেয়ে মানুষ লুট করিআ লইআ জাইত ওহারা কথক দিন পরে চন্দ্রমণী কিল্লা লুঠ করে (শুনেছি চন্দ্রমনি কিল্লার ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনো আছে। তবে আমরা সে কেল্লার কোন অনুসন্ধান করতে পারিনি সময় অভাবে)। বহু লোককে খুন করে কিন্তু মেয়ে মানুষ কাহাকেও ধরিআ লইআ জাইতে পারে নাই তাহারা সকলে জুদ্ধ করিআ মরিআছে কেহ ধরা দেয় নাই এহার কথকদিন পরে ব্রজদুলাল ঠাকুরের ঘর লুঠ হয় তাহাতে ওহার ঘরের সকললোক পালাইআ বাঁচে এমতে সেথায় কাহারও বাস করা আদৌ নিরাপত্ত নহে বিবেচনা করিআ সকলে পূর্বদিকের খাল দিআ বড় নদীতে আইসে ৫।৬ দিন তক নৌকা বাইআ হিজলী রাজ্যে আইসে ঘোর জঙ্গলের মর্দ্দে আসিআ এক জায়গায় গাঙ্গের ধারে বাস বসাইয়া তথায় কথক ও নৌকায় কথক থাকে সেওয়ায় তদপরে জঙ্গল কাটিআ ঘর বান্দিআ তাহাতে ক্রোমে ক্রোমে বাস করে ব্রজ ঠাকুর কোথক দিন কিছু দক্ষিণে এক স্থানে ছিল পরে দক্ষিণে কথক দুরে গাঙ্গের ধারে জঙ্গল কাটিআ বাস তৈরী করে এহা এক্ষণ লখী মৌজা কহে গোপাল কিষ্টর পুত্রগণ যেথায় বাস বান্দিআছিল তাহাকে পরে বিরূলিআ কহে এথায় তদপূর্বে কেহ বাস করে নাই পুব দিকে খালি জঙ্গল মহাল ছিল দেড়কোস তফাতে সাগর নদী ছিল গঙ্গাসাগর যাইতে হইত সেই নদী সেথায় ছিল মস্তবড় নৌকা না হইলে সেথায় কেহ জাইতে পারিত না সেওয়ায় নোতন চড়ায় ঠেকিআ কোথক জাহাজ মারা জাইত। জাহারা নৌকা করিআ রাইমণী কিল্লা হইতে এথায়

পলাইয়া আসিল তাহারা জে খোরাকী আনিয়াছিল তাহাতে কোনমতে কোথক দিন গেল তদপরে ঘোর জঙ্গল মর্দ্দে কোন খোরাকী না পাইআ কোথক লোক মারা জায় বেমারী হইআও কোথক মারা জায় জাহারা বাচিআ ছিল তাহারা কোনমতে বহু কষ্টে ছিল কোথক দিন উপাসে কাটাইয়াছে নৌকাপথে ধান আনিতে হইত তাহা বড়ই দুর্গম ছিল সকল সময়ে নিরাপত্ত ছিল না বাএন্দাতে কতক লোকালয় ছিল তথায় ধান চাইল পাওআ জাইত তথা হইতে আসিতে ৩|৪ দিন লাগিত ওইরূপ কষ্টে তাহারা কোনো মতে বাচিয়া ছিল মেয়ে ও পুরুস মানুস সাকল্যে ৫৩ জনা আসিয়া ছিল দুই মাসের পর মাত্র ২৩ জনা রহিলেক এদেশে কোথাও মিঠা জল ছিল না নৌকা করিয়া বাএ নদী হইতে নৌকা বুজাই করিআ জল আনিতে হইত জে সকল পুরুষ মানুস রহিলেক তাহারা হরিণ বাঘ মারিআ বহু স্থানের জঙ্গল কাটিয়া জমিমজকুরা চাষের মত করে দেওয়ায় বহু বন্য বরাহ আসিয়া উৎপাত করিত জঙ্গল বড়ই দুর্গম ছিলো তীর মারিলে উহারা বন মর্দ্দে অদৃশ হইত পুরুস মানুসেরা অনেক দিন হরিণ মাংস খাইয়া দিন গুজরান করিত চাউল না পাইলে বন আলু ও ফল খাইত তাহাও বড় কষ্টেই মিলিত বাএন্দার এদিকে কোন লোকালয় ছিল না কেবলই জঙ্গল মর্দ্দে মর্দ্দে কোথক কোথক ছোট ছোট জলা জমি পড়িআ ছিল তথায় হরিণ, বরাহ চরিআ থাকিত বড় বড় গাঙ্গ নদী চারদিকে ছিল জলে বহু কুমির থাকিত এহারা কোথক দীন বহু গ্রাম এক বালি জায়গা বাহির করে সেথায় কোথকটা জঙ্গল কাটিআ তথায় একটি ছোট ডোবা খনন করে তাহাতে মিঠা পানি পাওআ জায় সে মতে জলের অভাব আর থাকে নাই তাহাতে এক্ষণে ব্রজ ঠাকুরের বংস বাস করিয়াছে তাহা পরে লখীর গড় হইআছে ওই ছোট ডোবা তাহারা বুজাইআ দেয় নাই খালের নিকট আছে। তখন ব্রজঠাকুর তথায় বাস করিতে জায় ওই

ঠাকুরের বংসের কেহ কেহ বহু পরে আসিয়া ছিল কিন্তু আমাদের বংসের আর কেহ না থাকায় কেহ আসে নাই জাতায়াতের পথ নাই সে মতে কোনো বান্ধবাদী কোনো খবর করে নাই কোথক দিন পরে অনেক বান্ধব জানিতে পারিআছিল কিন্তু পথ দুর্গম হওয়ায় কেহ আসিতে পারে নাই এমতে আন্দাজ ২০।২৫ বছর কাটিআ গেল সকল লোক মোছলমান ও বর্গী ভয়ে কোথাও বাহির হইতে পারিত না সঙ্গে নৌকা দেখিলে ভাঙ্গিয়া ডুবাইয়া দিত কোনো বাঘ বাহির হইলে তীরকাঁড় লইয়া জাইতে হয়
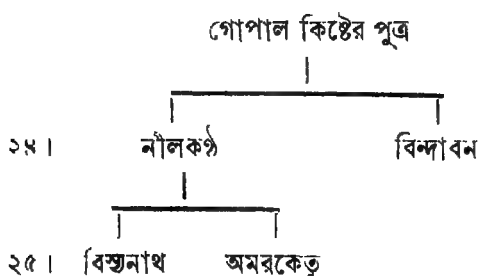
অমবকেতু কুতুবপুর রাজের সেনাপতি ছিল ইহার ভারী জবরদস্ত ক্ষমতা ছিল কোথক দিন পরে পুরীর রাজার কাছে চণ্ডভীম খেতাব পাইআছিল তস্য ভগিনী সুগন্ধাকে কুতুবপুর রাজা হরিদেব সিং বিভা করে বিস্তনাথ তস্য পুত্র রুদ্রনারাণ কটক জিলার কুজং রাজার কন্যা কিষ্টমনীকে বিভা করে ওই রাজা রাজার বান্ধব হয় রাধামাধব তস্য পুত্র হরিচরণ এহার দুই কন্যাকে তুর্কা রাজার দুই ভাই বিভা করে হরিচরণ বিভা কালীন বহু জোতুক দেয় কিসোরী মোহন ভদ্রকের জমিদার পট্টনাএক ঘরে বিভা করে ও জায়গীর পায়।

২৫। বিশ্বনাথ

|

২৬। রুদ্রনারায়ণ

|
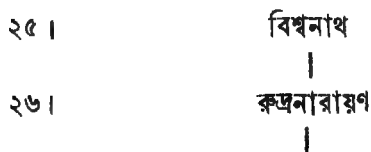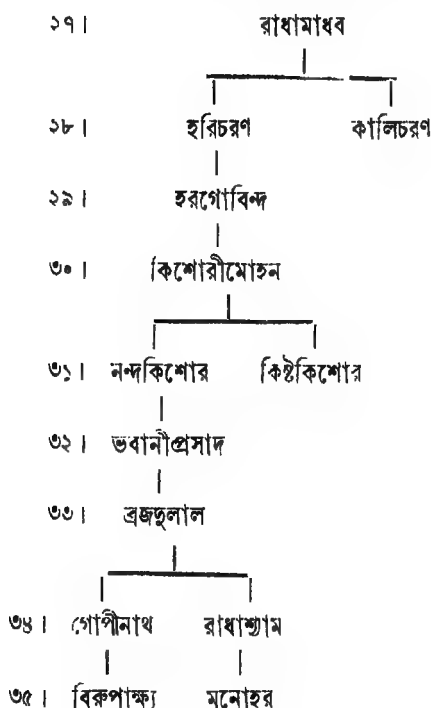
রাধামাধবের বণিতা হৈমবতী দেই নারায়ণগড় রাজার কন্যা হয় হরিচরণ বলরামপুর রাজার কন্যা রুক্মিনী দেইকে বিভা করে কালীচরণ বিভা করে নাই নারাণগড় রাজার নাম শ্রীমৎ হরচন্দ্র রায় এহার ৩ ভাই মুকুন্দলাল ও মুরারিলাল বলরামপুরের রাজা শ্রীমৎ রাজচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর রাজা শ্রীমৎ দেবনারায়ণ রায় বলরামপুর রাজার জ্ঞাতি হয় হরচন্দ্র সবং জমিদার রাজকৃষ্ট দাসের কন্যা নাম সত্যভামা দেইকে নন্দকিসোর অমর্ষীর বলরাম চৌধুরীর কন্যা সুভদ্রা দেইকে বিভা করে কিষ্টকিসোর বিভা করে * * ভবানীপ্রসাদ তিলদার জমিদার তুলসীরাম দাসের কন্যা যমুনামণিকে বিভা করে ব্রজদুলাল চংরাচকের বলরাম রায়ের কন্যা ললিতা দেইকে বিভা করে গোপীনাথ বালেস্বর জিলায় বাসুদেবপুর মৌজায় মাহান্তি

জমিদারের কন্যা সুষমা দেইকে বিভা করে রাধাস্যাম ওক্ত জিলার বাস্তরে জমিদার পরমেস পট্টনাএক এর কন্যা রাজেস্বরী দেইকে বিভা করে ওই দুই জনা বাসুদেবপুরে কুড়ি হাজার বিঘা ও বাস্তরে দশ হাজার বিঘার জায়গীর পাইআ ছিল গোপীনাথ উত্তম পণ্ডিত আগমবাগীস হয় কোথক পুস্তক রচনা করে চৌপাড়ী ছিল রাধাস্যামের দুই কন্যা ছিল এক কৃষ্টপ্রিয়া দেইকে ময়নার রাজা গোকুলানন্দ বিভা করে[1] আর এক কন্যাকে সুজামুটার রাজা কার্তিক চন্দ্র বিভা করে কিন্তু লিখি বিভার কোথক দিন পরে দুই জনার কাল হয় বিস্যানাথ* রাজাব কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেইকে বিভা করে ওহার নাম শ্রীমৎ রামহরি দাস ওহার ৩ ভ্রাতা ছিলো মোজো অপুত্রক মরে মোছলমান বাদসার সময়েতে রাজধানী লুঠ হইআ জায় বাজবাটীর কোন লোকের কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই রুদ্রনাবায়ণ মালজিটা[2] মহাল একলক্ষ্য তঙ্কা মালগুজরি সুরত বন্দোবস্ত লইআ ছিল ওই মহাল দৈর্ঘ্যো কুড়ি কোশ ও প্রস্থ চারি

---

১ গোকুলানন্দ ছিলেন মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্রের পুত্র। গোকুলানন্দ খুব সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ময়নার রাজা ছিলেন।

২ 'মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত 'খাস' সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমীদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মসনদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের 'খাস' অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়। নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে:—

১। জলামুঠা জমিদারী:—(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেত্তড়ামাল বিশওয়ান, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫

কোশ ছিল বিস্তনাথের কাল হইলে তস্যপুত্র রুদ্রনারায়ণ ইহার মালিক হন কিন্তু সময় মত মালগুজরি দিতে না পারায় বাদসা কাড়িআ লয় ওই মহলে আন্দাজ ৩৫ বৎসর দখল করি পরে কোথক কাল নিমক পোক্তন চান কোথক দিন গতে প্রবান (?) ও অঠি (?) বন্দোবস্ত হয় মালজিটা মহালের জমা আদায়ের জন্য বহু বরকন্দাজ রাখিতে হইত সেওয়াঅ তেমন আদায় হইত না একারণ রাখিতে পারা জায় নাই প্রগনা ও তুমারী বন্দোবস্ত হইলে আবার কোথকদিন এহার' লইআছিল এমতে ওই মহাল লইআ (প্রগনার নাম ভাগ নিম্নে ফুটনোট দিয়েছি।) বহু গোল হয় পরে এহারা একবার ছাড়িআ দেয় নন্দকিসোর নারায়ণগড় রাজা শ্রীমৎ হরিদেব শ্রীচন্দন এহার গড়ে সেনাপতি হইআ থাকে,[১] এহার কোথক উত্তর দিকে এহার এক বান্ধব রাজা ছিল তাহার কিল্লা মযুপুরে ছিল সে রাজার নাম হরদেব চৌধুরী তাহার ৪ ভ্রাতা পাশাপাশি ৩টি গড় তৈয়ার করিআছিল নারায়ণগড় বড় রাজা ছিল বহু হাতি ছিল ঘোড়া ৫০০ ছিল হাতি ২০০ ছিল

---

পাহাড়পুর, ৬ গন্তমেশ. ৭ নয়াচক বাজার, (বাযন্দা বাজার), ৮ ভাইট গড় (সরকার বালেশ্বর), ৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল, ১১ আগ্রাচৌর, ১২ মীরগাদা, ১৩ ভোগরাই।

২। মাজনামুঠা জমিদারী:—(সরকার মালজেঠিটা) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরো ডুরনান, ৩ নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কসবা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ, ৭ নয়াবাদ (দেবমুঠা), ৮ শরীয়াবাদ, ৯ আসীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার মুজকরি), ১১ পটাশপুর, ১২ কিস্‌মৎসীপুর।—হিজলীর মসনদ-ই-আলা পৃঃ ১০০-১০১

এই খাস জমিদারী নিয়ে যে বেশ গণ্ডগোল হোত তা এই কোষিনামা থেকেও বোঝা যায়।

১ শ্রীচন্দন বংশীয় রাজগণ নারায়ণগড়ে ১২৭৩ খ্রীঃ—১৮৮৩ পর্যন্ত ২৬ পুরুষ রাজত্ব করেন।

তীরন্দাজ ২৫০০ ছিল ঘোড়সআর বহুত ছিল এ তসওয়াঅ পদাতি সেনা ২০ হাজার ছিলো এহার রথ চলিত বর্গী হেথায় ভিড়িতে পারিত না রাজা অপুত্রকে মরে ঘরাও বিবাদে বহু গোলযোগ হইআ শেষে বাদসা গড় দখল করে জিনিস তৈজসাদি কোথক লুঠ হয় কোথক কর্ম্মচারী বরকন্দাজরা লইআ পলাইআ জায় ২ রাণী সহমরণ করে নন্দকিশোর পুরী গিআছিল তথা হইতে ফিরিআ আসে নাই সুনা জায় তিনি আসিবার পথে সাক্ষীগোপাল দিআ আসিতে ছিল তথায় মারা জায় সেওয়ায় আর কোন খবর কেহ পায় নাই। বংসের যাহারা কটক বালেশ্বর জিলায় বিভা করিআছিল তাহারা সকলেই দসীসৌচী এখানের বহু লোক মাসা সৌচী থাকায় কোথক আচার ব্যাভার প্রিথক আছে[২] সেমতে তাহারা এবংসের লোককে ক্রমে ক্রমে ঘ্রুণা করিতে থাকে ও কেহ কেহ কুবাক্য বলে তাহতে এহারা রাগীয়া পৈতা ফেলাইয়া দেয় তদবধি পৈতা ধারণ করে নাই ও দসাসৌচী পরিত্যাগ করিআ মাসাসৌচী হয় এমতে সকল সাবেক জ্ঞাতি ও কুটুম্ব বান্ধব পরিত্যাগ করিল ক্রমে গতায়ত বন্ধ হইল ও আর কেহ জায় নাই তথাত্র গতায়াত বহু দুর্গম ছিল নৌকা পথে গতায়াত চলিত সেওয়ায় অন্য কোন ভালো পথ ছিল না কোথাও কোথাও ডাঙ্গা পথ ছিল কিন্তু তস্কর ভয় নিতান্ত ছিল সে কারণ বড় কেহ যাইত না তথাকার কেহই এদুর দেশে আসিত না ব্রজদুলালের কন্যা রাইকিসোরীকে তুর্কার রাজা বিভা করে।

---

২ তমোলুক ইতিহাসকার বলেছেন—"ইঁহাদের কোন কালে কোন দেশে উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াও শ্রুতিগোচর হয় না।" পৃঃ—৮৬। রক্ষিত মহাশয়ের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা এই কোর্ষিনামা প্রমাণ করিবে।

ব্রজমোহনের ৭ পুত্র ছিল।

প্রসাদের বণিতার নাম কুঞ্জ দেই<br>
রঘুনাথের বণিতার নাম সরলা দেই<br>
টীকারামের বণিতার নাম অহল্যামনী দেই<br>
বিনন্দরামের বণিতা রাজেশ্বরী দেই<br>
গোবিন্দরামের বণিতা লক্ষ্মীমণি দেই<br>
বাবুরামের বণিতা হরিপ্রিয়া দেই<br>
সাধুচরণ বিভা করে নাই।

মনোহর জানার বণিতা সাবিত্রী বাহিরির রাজ বংসের মনোহর দাসের কন্যা উক্ত বংসের এক্ষণে কেহ নাই নামা মানীয় হইআছে কেহ কেহ ওড়িস্যায় গিয়াছে বাকী ২।৪ জনার বিশেষ কোন সন্ধান কেহ রাখে নাই রঘুনাথ অমষীর চৌধুরী বংসের দামোদর চৌধুরীর কন্যা বিভা করে ব্রজমোহন বণিতা কলিকা স্যালী স্বরূপচন্দ্র দাসের কন্যা ছিল প্রসাদ এ টীকারাম সংস্কৃত ও ওৎকল ভাসায় পণ্ডিত ছিল প্রসাদ মহাভারত লিখিআ ছিল। বাবুরাম কবিরাজী ও জৌতিসের কাজ করিত এহাতে বড় পণ্ডিত হইআছিল রঘুনাথ বিনন্দরাম সাধুচরণ বিভা করে নাই এই সাত জনা অতিশয় বলবান ছিল এহাদের রামসিং ও ভীমসিং করিআ ২টি বড় বড় লাঠি ছিল তদ্বারা এহারা জেথা সেথা অতি দ্রুত যাইতে পারিত ও বড় বড় বাঘ হরিণ মারিতে পারিত বরাহ মারিত রঘুনাথ বাসুদেবপুরে ও বিনন্দরাম ময়না গড়ে সেনাপতি ছিল তথায় এ জাতির বহুলোক পাইক বরকন্দাজ ছিল তীরকাঁড় মারিত ১১৫৫ সালে বর্গীর যুদ্ধে রঘুনাথ

বিষ্ণু মর্তিদ্বয় ( জিষ্ণুঃঠাবির মন্দিব )

রাইমনি কেল্লার একাংশ ( উড়িষ্যা )

পাথর নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ( রাইমনি কেল্লা )

বুকে তীর গাথিয়া যাওয়ায় ঘোড়াসহ মরে বিনন্দরাম তদপরে ময়নার তিলদায় বর্গীর যুদ্ধে আহত হইয়া বাড়ী আসিআ কোথক দিন আর মারা যায় সাধুচরণ ও গোবিন্দরাম বহু বরকন্দাজ লইআ নানাস্থানে থাকিত তাহাদের সহিত হিজলীর মোছলমানদের মাঝে মাঝে জমি লইআ মারামারি হইত তাহাতে বহুলোক জখম হইত সেমতে সহজে কেহ ধরা দিত না বাবুরাম কুতুবপুরে জমিদার রাজা হরিনারায়ণ সিংএর বাটীতে থাকিত ওই রাজার দুই পুত্র বর্গীর জুদ্ধে মারা যায় গোবিন্দরাম কোথক দিন মহিষাদলে ছিল ১১৭৬ সালে রঘুনাথ ঈড়িঙ্কির দীঘি খনন করিয়া ছিল ১১৮০ সালে ওই ব্যক্তি জুখিয়ার দিঘী কাটে ও তথায় বিগ্রহ মূর্তি যাপন করে বাসদেবপুর জমিদারের খরচে ঐসকল কাজ হইয়া ছিল মলদিরো (মলঙ্গি জাতি) রোজ দুই পাই মজুরীতে দিঘী খনন করিআছিল চাউল এক তঙ্কায় ১ মোণ ছিল বহু লোনা মাছ পাওয়া জাইত মাছ হরেক রকমের ছিল ঈড়িঙ্কির দক্ষিণে ঘোর জঙ্গল ছিল তাহার পর বড় নদী ওহার পচ্ছিমেও নদী ছিল জঙ্গলে বহু বরাহ আছে তথায় কেহ যায় না। মলঙ্গীরা[১] পশ্চিম প্রদেশ হইতে ক্রমে এদেশে

---

[১] এই মলঙ্গী জাতিরা সত্যই বড় দুর্দান্ত ছিল। লবণ তৈরী করিত একথা মিথ্যে নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হিজলীর মলঙ্গীরা বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে বীরকুল, বালিসাই, মিরগোদা প্রভৃতি পরগণার রঘু দিন্দা, ভগবান মাইতি, বলেন কুণ্ড, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু, বৈষ্ণব ভুঞা প্রভৃতি বহু মলঙ্গী সল্ট কমিটির প্রেসিডেন্টের নিকট বহুপ্রকার দুর্নীতির অভিযোগ জানান। মলঙ্গীরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না অধিকন্তু নানা রকম নির্যাতনও সহ্য করত। ১৮০৪ সালে বহু মলঙ্গী কলকাতায় গিয়ে তাদের অভিযোগ পেশ করে। এদের নেতা ছিলেন পরমানন্দ সরকার। ৩০০ শত মলঙ্গীকে নিয়ে কাঁথিতে তিনি ক্ষারকুহার সন্ সাহেবের কাছারীতে উপস্থিত হন। অবিলম্বে তাঁদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্ত সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেন। ১৮০৬ সালের ৫ই মে একশত অনুচরসহ পরমানন্দ মিঃ ম্যাসনের নিকট উপস্থিত হন এবং দাবী মেনে নেওয়ার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। মলঙ্গীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে

আসিয়া বসত করিআছে তাহারা জীর্ণ কৌপিন পরিধান করিআ থাকে লবণ মারিয়া থাকে তাহারা ক্রমে সংখ্যায় বেশী পরিমাণে আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা বাস করিবার নিমিত্তে বহু স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিতে থাকে। সেরূপ চাষে ধান বহু পাইত, তবে বন্য বরাহ বহু উপদ্রব করিত। মাঝে মাঝে উহারা মারামারি করিয়া মরিত কাহারও কথা শুনিত না ববাহ হরিণ স্বীকার করিয়া খাইত।
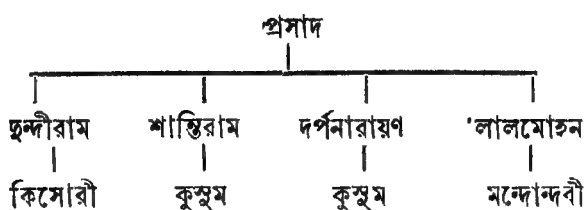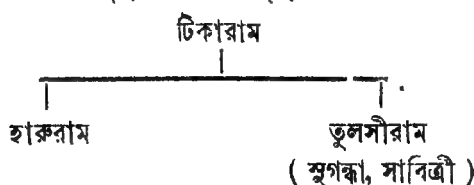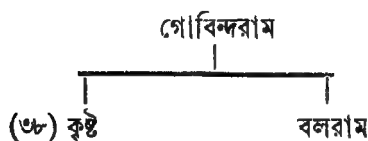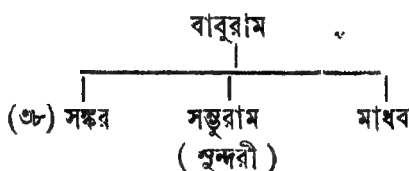
হিজলী এজেণ্টগণ নাজেহাল হয়ে উঠেন। প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে সাহেবদের বিরুদ্ধে এরূপ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বড় সোজা কথা নয়। মেদিনীপুর পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৬২ শারদীয় সংখ্যা।

এতক ৩৯ পুরুষ লেখা হইল।

গোবিন্দরামের পুত্র বলরাম রেয়াপাড়ার শিব মন্দিরের মাত্থলি পাথরটাকে এক হাতে তুলিয়া ২৬ হাত দূরে ফেলাইয়া দিয়াছিল। রঘুনাথের বনিতা সরলার নামে সরলিয়া চক হইয়াছে তথায় বালেশ্বর হইতে বহু জালিক আনাইয়া বাস করাইয়াছে এছাড়া বালিচক ২৩০/০ বিঘা বিন্দাবনচক ৩০০/০ বিঘা মধুসূদনচক ৬০০/০ বিঘা লাখী গ্রামে ৬০০/০ বিঘা ও বিরুলিয়া মৌজায় ১৮০০/০ বিঘা ভুঁমি জোত আবাদ কারণ রাখিআছিল ওহারা নিজবাটির কাজ ও খিজমত করেন দুই চাকর এক পটনাএক অন্য মাত্নাএক ও নাপিত হরি প্রামাণিককে বালেশ্বর জিলা হইতে আনিয়া বাসস্থানে স্থাপন করে হরি পট্রনাএক উত্তরে মাত্নাএক খালের পূবদিকে নাপিত দক্ষিণ দিকে রাখে তথায় ব্রজঠাকুরের বংসের কেহ কেহ ছিল পরে ছাড়িয়া লাক্ষী গড়ে গিয়া বাস করে বাসের কোথক উত্তরে বেহারা ৬ ঘর ও কাঁড়ওয়ালী ডোম দুই ঘর আনিয়া রাখা হয় মধুসূদনচক রাজা নরনারায়ণ এর পূর্ব পুরুষকে দান করা হয়। কৃষ্ট ও বলরাম আদৌ বিভা করে নাই ওহারাও রামসিং, ভীমসিং, লাঠী লইআ চলা ফেরা করিত চোর ডাকাত মারিয়া উজাড় করিআ ছিল। এহারা লাঠী দিয়া বাঘ, হরিণ বরাহ মারিত রঘুনাথ ও বিনন্দরাম লাখী মৌজায় একটি ৪/০ বিঘা বড় পুকুর কাটাইয়া ছিল তাহার

চারিধারে সসান হইয়াছে নিজদের সবদাহ জন্য পৃথক একটি পুকুর ও পাড় সমান করিআ ছিল বীরুপাক্ষ নামে বিক্কলিয়া হয় সে কথা পরে কহি এহাদের ভারী জবরদস্ত তলায়ার ছিল সেই সকল তোলাআর কোথক বর্গীর যুদ্ধে ও কোথক মোছলমানের কাছ হইতে কাড়িআ লইআছিল। কুন্দা বন্দুক কোথক এপ্রকারে কাড়িয়া লইআ ছিল কিন্তু তাহার বারুদ না পাওয়ায় কোনো কাজ হয় নাই। বলম ও কতক লইয়াছিল সেওয়াঅ ঘোড়ার সাজ বহু কাড়িয়া আনিয়াছিল ওহারা বহু বিপন্ন নরনারীকে তস্কর আদীর হাত হইতে উদ্ধার করিত তেমতে ওনারা সকলের ভালো হইয়াছিল চারদিকে সকলে ওদিককে বড় ভয় করিত ওহারা মোটা বাসের কাড় ৮০০ হাত তক তীরকাড় মারিতে পারিত এক এক কাড়ে বাঘ মরিত বহুত বাঘ ও হরিণ চামড়া ছিল দর্পণারাণ কলমদানে মুঠা মারিয়া বাঘ মারিয়া ছিল তাহাকে বাঘ কামড়াইআ দিআছিল সেথায় ঘা হইআ মারা জায় মাধব পা পথে গয়াধাম গিয়া ফিরিআ আসে এক বছর লাগিয়াছিল কৃষক বোষ্ণব হইআছিল তাহাকে উত্তরে সামিজ দেওয়া হয় হরিরাম কোথকদিন ময়নাগড়ে ছিল সম্ভু কোথক দিন তুর্কাগড়ে ছিল সঙ্কর ও কষ্ট বাসুদেবপুর গড়ে ছিল লাল মোহন বালীসীতা গড় ও কুতুবপুরে ছিল বলরাম সুজামুঠা গড়ে ছিল এহারা সকলেই সেনাপতি ছিল সেকালে যখন তখন বর্গীর হাঙ্গামা হইত লোক ভয়ে জলে ডুবিয়া মাথায় হাড়ী দিয়া লুকাইত কচি ছেলের মুখে কাপড় বান্দিআ দিত বর্গীরা জাহা পাইত তাহা লুঠ করিত মানুষ দেখিলে কাটিআ ফেলিত মেয়েমানুষ সুশ্রী দেখিলে লইআ যাইত নতুবা বেইজ্জত করিত লোকে দামামা বাজাইআ জানাইত তাহাতে সকল লোক সাবধান হইত বনে ঝোপের ভিতর লুকাইত।

ছন্দিরামের কন্যা রাইকমলিনীকে সুজামুঠার রাজা কিষ্টচন্দ্র

নারায়ণ রায় বিভা করেন ছুন্দিরাম ও শান্তিরামের জ্যেদে গোলকেন্দ্র কথক দিন ময়না গড়ে থাকেন রামমোহনের আর এক ভগিনীকে নাম সত্যভামা দেঈ ময়নার কেয়ারানায় রামমোহন রায়কে বিভা দেওয়া হয় ওহারা ময়না রাজার জ্ঞাতি হয়

এদেশে যাহারা আসিয়া বাস করিআছে তাহারা সকলে পছিম ও দোখিন হইতে আসিয়াছে ক্রমে ক্রমে বাস হইয়াছে মলঙ্গিরা বেশী আসিয়া ছিল তাহারাই এ প্রদেশের মদ্ধ্যে স্থানে স্থানে বাস বান্দিয়া বাস করিয়াছে তারপরে কোথক চাষী লোক আইসে তাহারা কাটাজমি কর দিয়া লইয়া তথায় বাস করিআছে।

## ॥ সেনাপতি মহাবীর অমরকেতু চণ্ডভীম ॥

এই বংসের অমরকেতু প্রথমাবস্তায় কুতুবপুর রাজার সেনাপতি ছিল। পরে অন্যান্ন রাজার অধিনে বহু বহু কার্জ্জ করিআছিল তাহার অধিনে ৫০ হাজর পদাতি ২ হাজার ঘোড় সওয়ার ৫ শত হাতি ও বহু বহু বরকন্দাজ ছিল এই ব্যক্তি শতেকের অধিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শেষে পুরির রাজার আদেশে মত্তহাতির শুড় ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মাটিতে সোওয়াইআ দিয়াছিল এমতে মাল্য বহু বকসীস দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া শেষে চণ্ডভীম উপাধি দিয়া আড়ম্বরে বিদায় দেন

এই ব্যক্তি ছোট খেজুর গাছ জটা ধরিয়া উপড়াইতে পারিত। বনের বাঘকে মুঠার ঘায় মারিতে পারিত গুড়ি কাঠ লইআ বহু বহু কসরত করিত মোটা বাঁস পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দুই হাত দিয়া সুমুখে টানিয়া ভাঙ্গিতে পারিত। ১৫ মন ওজনের পাথর একলা বহন করিতে পারিত। ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার উপর লাফাইয়া উঠিয়া অব্যর্থ তীর মারিতে পারিত ৩ হাত লম্বা আধমন ওজনের দুইটি তলওয়ার লইয়া ২ হাতে জুদ্ধ করিতে পারিত।

৩ মন ওজনের প্রকাণ্ড পিতলের গদা লইয়া জুদ্ধ করিত এমতে বহু বহু কসরতের কার্য করিয়াছে।

অমরকেতু বিভা করে নাই। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মারা যায় এ ব্যক্তি বহু জুদ্ধ জয় করিআছিল তাহার বিবরণ কহিয়াছি এ ব্যক্তি বড় ধর্মপরায়ণ ছিল। বহু দান ফেরাত করিআছে এ কারণ বহু লোকের ভাল্য ছিল। এক রাতিরে গড়ে আসিবার কালে পথমদ্ধ্যে একটি বড় ঘরে ডাকাতি হইতে ছিলো। প্রায় ১০০ ডাকাত বহুত অস্ত্রাদি লইয়া আক্রমণ করি আছিল হেনকালে সেই পথে সেনাপতি অমরকেতু ঘোড়া ছুটাইআ জাইতেছিল। হাঙ্গামা দেখিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার বুঝিআ তক্ষণাত লোহার ডাণ্ডা লইয়া ষাড়ের মত ডাকাত দলকে আক্রমণ করিল একাকী জুদ্ধ করিআ অর্দ্ধেক ডাকাত নিম্মুল করিআ শেষ করিল বাকী কোথক বন্দী হইল ও কোথক আহত হইয়া পালাইআ যায়। এমতে একলা বহু বিক্রোম প্রকাশ কবিআ বহু নারীর মান ইজ্জত রক্ষা করিআছে। এ কাজ্য করিআ তাহার আন্দাজ লক্ষাধিক টাকা রক্ষা করে ও মান ইজ্জত রক্ষা পায় কিন্তু কোনো পুরস্কার গ্রহণ করে নাই। মুছলমান ও বর্গীর হাত হইতে বহু নারীর মান রক্ষা করিআছে। বহু বর্গী ও পাঠান মারিআ উজাড় করিআছে। কঠিন জ্বরারোগে আক্রান্ত হইয়া সেষে মহাবির হাজার হাজার লোককে কান্দাইআ মারা যায়। এই মহাবীরের বহু শত সিস্য ছিল। এ জাতির বহু বীর না থাকিলে পাঠানের ও বর্গীর অত্যাচারে দেশ উজাড় হইআ জাইত। এহার প্রতাপে শত্রুগণ থরহরি কম্পান্বিত হইত।

এই বংশের অন্যান্য বীরগণের পরিচয় :

এহাদের সকলের কথা কহি যে ইহারা সকলেই প্রশংসিত বীর ছিল। নবাবের আমলে ইহারা বন্দুক ব্যবহার করিত। বারুদ হাতে তৈয়ার করিয়া লইত। বড় বড় তলোআর, তীর ধনুকবাণ,

রামসিং ও ভিমসিং নামক লাঠি ছিল। এমতে ইহারা নির্ভএ বিচরণ করিত। দুর পথে জাইতে হইলে ঘোড়ায় চড়িআ জাইত। জঙ্গলে গিয়া বাঘ হরিণ কুমীর আদি কত মারিত। দুদ্দান্ত জলদস্যুকে জব্দ করিত। এহাদের প্রতাপে দেশে বহু সান্তি ছিল। লোকে বর্গী বা পাঠানের ভয় করিত না। স্থানে স্থানে ঘাটি থাকিত তাহাতে লোকে পহরির কাজ্য করিত। দরকার হইলে দামামা বাজাইআ লোকজনকে জানাইআ দিত। তাহাতে সকলে সাবধান হইত কেহ কেহ স্থানান্তরে জঙ্গলে লুকাইত। এমতে বর্গীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত। দস্যু ভয় ও যথেষ্ট ছিল তাহারাও গ্রাম লুণ্ঠন কাজ্য করিত।

এই খানেই প্রসাদ জানা রচিত কোর্ষিনামা শেষ। এর পরও এই বংশ-এর কোর্ষিনামা আছে। সে কোর্ষিনামা নিম্নে প্রকাশ করছি।
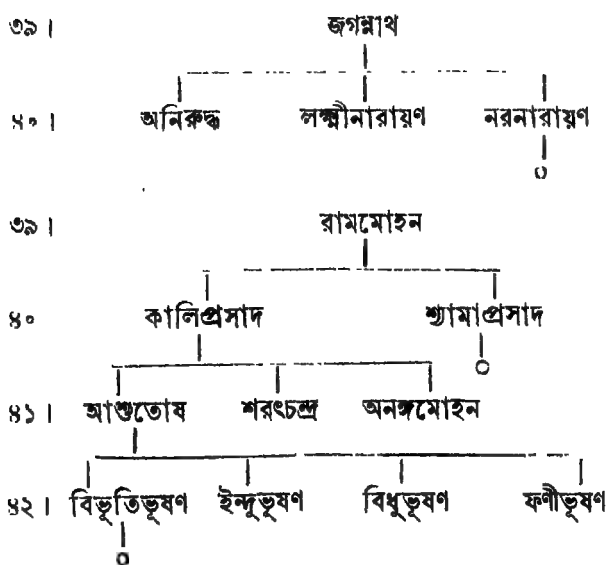
৪১। শরৎচন্দ্র
৪২। সুনীলকুমার অরুণকুমার আশীষকুমার
৪১। অনঙ্গমোহন
৪২। অমূল্যরতন হরিপদ বিষ্ণুপদ শক্তিপদ
৪২। ইন্দুভূষণ
রজত নিতাই
৪২। বিধুভূষণ
৪৩। দেবপ্রসাদ শিবপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ শক্তিপ্রসাদ
৪০। লক্ষ্মীনারায়ণ
৪০। অনিরুদ্ধ
৪১। কৈলাস
৪৩। গজেন্দ্র ভূষণ অর্জুন
৪২। ধরণী
৪২। সুধীর
৪৩। অনিল সুশীল
৪৩ চিত্ত সনা
৩৮। নরসিংহ
৪০। নবীনচন্দ্র কৃপাসিন্ধু মধুসূদন দীনবন্ধু জগবন্ধু
যতীন্দ্র
৪১। ক্ষিরোদ কুমেদ রজনী সুরেন্দ্র ধীরেন্দ্র
৪০। জগবন্ধু
৪১। অমরেন্দ্র সত্যেন্দ্র সমরেন্দ্র
৪২। বিদ্যুৎ
সরিৎ শ্যামল শোভন অশোক

৪০ পুরুষ মধুসূদন জানা বাংলার অতি প্রাচীন সংবাদপত্র "নীহার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকা আজো প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ইনি আরো বহু পুস্তকও প্রকাশ করেছেন। ৪১ পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ জানা কবি ও সাহিত্যিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। আশুতোষ জানা সমাজ সংস্কারক ও বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। বিদেশ থেকে কতকগুলি ডিগ্রি পেয়েছিলেন। শরৎ জানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম-এস-সিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ছিলেন। বিধুভূষণ বিখ্যাত ব্যায়ামাচার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দু'তিন খানা পুস্তকও লিখেছেন। বিভূতি ভূষণ সাহিত্যচর্চা করেন। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ৪২ পুরুষ সুনীল কুমার জানা বিখ্যাত ফটো-গ্রাফার। এর তোলা ছবি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিজস্ব স্টুডিও কলকাতায় আছে। বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করলে এই বংশের দান তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে যে অনেকখানি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজরক্ত এই বংশে আজো প্রবাহিত। একদিন যে বংশ ছিন্নমূল অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাণটি হাতে করে নিয়ে মেদিনীপুর অঞ্চলে চলে এসেছিল; সেই বংশ পরবর্তীকালে তমলুক তথা মেদিনীপুরের ইতিহাসকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছিল।

এতদিন আমরা এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারিনি। এমনি হয়ত আরো অনেক গৌরবপূর্ণ বংশের ইতিহাস আজো আমাদের কাছে অজানা আছে অনুসন্ধান করলে হয়ত আবিষ্কৃত হতে পারে। এতদিন বালেশ্বরের যে দুর্গ "বিরাট রাজার গড়" নাম অভিহিত হোত, যার প্রকৃত ইতিহাস ছিল অজ্ঞাত—আজ অন্ততঃ জোর গলায় বলতে পারি—না, এ বিরাট রাজার গড় নয়, এ হোল রাইমণি কেল্লা। যেখানে রাজা মুকুন্দ দেবের উত্তর পুরুষগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যুদ্ধ করে বীরত্বের সাথে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল।—এ হোল সেই পূণ্য তীর্থক্ষেত্র।

চৈতন্য দেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নাকি উড়িষ্যার রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধ্বংস করেছিল। প্রেমের বন্যায় উৎকলবাসী ভেসে গিয়েছিল, তাই নাকি তাঁরা পাঠান-মোগল আক্রমণের সময় দেশকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের হাতের অসি প্রেমের ভরে খসে পড়ে গিয়েছিল। আজকে কি বলতে পারি না যে—না, এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। সাবিত্রীর বীরত্ব, রাইমণি কেল্লার সৈন্যগণের অপূর্ব আত্মত্যাগ উড়িষ্যার ইতিহাসে কি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত নয়? শুধু উড়িষ্যা বলি কেন সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন 'ঘটনা কি স্থান পাওয়ার অযোগ্য! ইতিহাস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার ক্ষেত্র নয়, কিন্তু তবুও বলব প্রকৃত বীরত্ব দেখলে কি বুকটি আনন্দে গর্বে নেচে উঠে না! দেশের গৌরবময় ইতিহাস পাঁচজনকে কি ডেকে শোনবার মত নয়!

# চতুর্দশ অধ্যায়

## তাম্রলিপ্তের সাহিত্য ও সাহিত্যিক

প্রাচীন তাম্রলিপ্তে সাহিত্য চর্চা কতদূর হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। রামায়ণ মহাভারতে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পৌরাণিক যুগে সাহিত্যের চর্চা বোধহয় কিছু কিছু হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তৃত ও সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্তে যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল, তা' বৌদ্ধ ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-চোয়াং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় এখানে বড় বৌদ্ধ বিহার যেমন ছিল, তেমনি সেই সমস্ত বিহারে গ্রন্থাগারও ছিল। ফা-হিয়েন দু'বছর তাম্রলিপ্তে অবস্থান করে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্তি আদির অবয়ব নকল করেছিলেন। পণ্ডিত রাহুল মিত্রের কথাও ইতি-পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। মহাস্থবির কালিক ষোড়শ স্থবিরের মধ্যে একজন ছিলেন। অনেকে তাঁকে তাম্রলিপ্তের অধিবাসী বলে মনে করেন।

এর পরের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না, অর্থাৎ আজ পর্যন্ত কোন কিছু আবিষ্কার হয়নি। তাই তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে অনেক ফাঁক থেকে যাবে। বৈষ্ণব পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুকে মহা-প্রভুর বাল-মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৪৫৫ শকাব্দে যখন চৈতন্যদেব মারা গেলেন এই সংবাদ শুনলেন, তখন অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাম্রলিপ্তে আসেন এবং এখানেই বিগ্রহ স্থাপন করে দিন যাপন করেন। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ সম্বন্ধে লিখেছেন—"গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী রচয়িতা গনের মধ্যে বাসুদেব শীর্ষস্থানীয়।" বস্তুত তাঁর গৌরাঙ্গ সম্পর্কিত পদগুলি

ব্যথিত-হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি কিন্তু তমলুকের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁর বাড়ী পূর্বে ছিল কুমারহট্টে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্টের বুড়ণ গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বাসুদেব ঘোষের মাধব ও গোবিন্দানন্দ নামে আরো দু'জন সহোদর ভাই ছিলেন। এই তিন ভাই শেষে নবদ্বীপে এসে বাস করেন। বাসুদেব ঘোষের তিন ভাই-ই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। মাধব ও গোবিন্দানন্দ দু'জনেই প্রসিদ্ধ কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাসুদেব ঘোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই তাঁর রচিত পদাবলীগুলি অতি সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ এবং অতি সরল ভাষায় লিখিত। এই শোকাতুর ভক্ত কবির পদাবলী তৎকালে বৈষ্ণবাচার্যগণ অতি ভক্তি সহকারে বিভিন্ন মহোৎসবে কীর্তন করতেন। খেতুরীর বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্মেলনে, যেখানে রসকীর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল—সেই মহোৎসবের শেষদিন সন্ধ্যায় মার্দাঙ্গিক দেবীদাস, গোকুল ও গৌরাঙ্গ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াগণ নিম্নলিখিত বাসুদেব ঘোষের পদাবলীটি গেয়ে ছিলেন—

"সখি হে ওই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কুম্ব কণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দু দরশন॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥

**কবি শিবরাম ঘোষ**॥ শিবরাম ঘোষ তাম্রলিপ্তে বসে তাঁর কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে গবেষক অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় যে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা' এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করছি—

"সন ১৩৪৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কবি শিবরাম ঘোষের কলিকামঙ্গলের একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খণ্ডিত পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। পুঁথির ভণিতা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ মাতার নাম রাধিকা বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনুমান করেন (রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভনে)। ইহা ছাড়া ঐ পুঁথি হইতে কবির আর কোন পরিচয় বা তাঁহার কাব্য রচনার কাল জানা যায় না। ইহার পর আমরা শিবরাম ঘোষ নামাঙ্কিত এক কবির একখানি একাদশী পাঁচালির পুঁথি পাই। রাজা চন্দ্রকেতু ও রুক্মাঙ্গদ নৃপতির দুইটি কাহিনী লইয়া পাঁচালিটি রচিত। পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কালিকামঙ্গলের কবি শিবরাম ঘোষ এবং একাদশী পাঁচালি রচয়িতা শিবরাম ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি। একাদশী পাঁচালির বন্দনাংশ হইতে আমরা কবির মাতার নাম সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারি এবং তাঁহার কাব্য-রচনার স্থান ও কাল জানিতে পারি।

ব্যস বাল্মীকি আদি বন্দো যত কবি।
জনক জননী বন্দো লোটাইয়া ভুবি॥
বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী।
মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপানি॥

* * *

শশী শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর।
পাতসা অরং সাহা ডিল্লি ঈশ্বর॥

তমলিপ্ত মহাস্থান বন্দো দেবতা বাস্থলি।
তথাত্র রচিল এই ব্রতের পাঁচালি ॥
দৈবকী নন্দন পদ ভজি একমনে।
একাদশী ব্রতকথা শিবরাম ভণে ॥

অর্থাৎ ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি শিবরাম ঘোষ তাম্রলিপ্তে বসিয়া একাদশী পাঁচালি রচনা করেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার কালিকামঙ্গল রচনারও একটা আনুমানিক কাল সহজেই ধরিয়া লইতে পারি।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম খণ্ডে উক্ত উভয় পুঁথিই স্থানলাভ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৮৬২ ও ১০৪৫ দ্রষ্টব্য)। ডক্টর সেন প্রথমে কালিকা মঙ্গলের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া অনুমান করেন, পরে একাদশী পাঁচালির পুঁথি দেখিয়া শেষোক্ত পুঁথির সঠিক রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমোক্ত পুঁথির রচনাকাল আর সংশোধিত হয় নাই। উক্ত ইতিহাসে কালিকা মঙ্গল আলোচনায় কবির পিতামাতার নামোল্লেখ না থাকায় ইহার কবিকে একাদশী পাঁচালির কবি হইতে পৃথক মনে হইতে পারে।

ভবানন্দের হরিবংশ পুঁথির অন্যতম লিপিকর শিবরাম ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। (ভবানন্দের হরিবংশ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ভূমিকা পৃঃ ৵০ [১৩৩৯]।—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৪ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১১৯।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। বাংলা মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস যে সমগ্র পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করেননি সে সন্দেহ আজ পণ্ডিত সমাজে বদ্ধমূল হয়েছে। কাশীরাম দাসের নামে যে বৃহৎ মহাভারত মহাকাব্যখানি এতদিন চলে আসছে, তার মধ্যে ৬টি পর্ব আমাদের এই শিবরাম ঘোষের রচনা বলে অনুমিত হয়। উক্ত কবির কয়াল মহাশয় একখানি

মহাভারতের বনপর্ব সংগ্রহ করেছেন। সেই পর্বের শেষে লেখা আছে—

পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক।
পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ আরণ্যক ॥ ১৬০৫ ॥[১]
অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত।
বিরচিল তনয় শিখর শুত জিত ॥
ভারত পঙ্কজ পর্ব্ব শ্রষ্ট অরণ্যক।
আদি সভা বিরাট বন করিল লিখক ॥
এই চারি পর্ব পুস্তক কাশীদাসি।
উদ্যোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোষি ॥[২]
ঐষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই।
তাহরে নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই ॥৫৮ বনপর্ব সমাপ্ত

পরিশেষে ফুটনোটে কয়াল মহাশয় যা মন্তব্য করেছেন, তা' হলো "১ লিপিকর কি করিয়া পুষ্প'কে (০) শূন্য বলিয়া ধরিলেন জানি না। ২, শিবরাম ঘোষের ছয় পর্ব মহাভারতের কোন হদিশ নাই। শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শিবরামের মহাভারত পুঁথির কয়েকটি পত্র আছে শুনিয়াছি।" —মা. প. প. ষষ্ঠ ৬৬, পৃঃ ৯৪।

আমার মনে হয় এই শিবরাম ও একাদশীর ব্রতকথা প্রণেতা শিবরাম একই লেখক, তবে অবশ্য আজ পর্যন্ত জানা যায় নি এই কবি শিবরাম ঘোষের আদি নিবাস কোথায় ছিল? তমলুকের অনতিদূরে কেলোমাল গ্রামে এক প্রাচীন ঘোষ জমিদার বংশ আছে। ইঁহারা প্রাচীন জমিদার বংশ, হয়ত এই বংশেই কবি শিবরাম ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা যায় না। সুস্পষ্টভাবে কিছু মন্তব্য করতে হলে আরো পুঁথি আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

**কবি কুঞ্জবিহারী দাস ॥** ফাসর‍্যার পালা কাব্যের রচয়িতা কবি কুঞ্জবিহারী দাস। এই পুঁথিটি পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে শ্রীযুত মদনমোহন অধিকারী সংগ্রহ করে আমায় দেন। ইতিপূর্বে আমি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এই কাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কবির বাড়ী পূর্বে কাশীজোড়া পরগণায় ছিল। পরে কবির পিতামহ তমলুক পরগণার অন্তর্গত মামুদপুরে বসবাস করেন। সেই থেকে কবিরা তিন পুরুষ ধরে বাস করেন। মামুদপুরের দক্ষিণদিকে পট্টনায়কের ইজারার মধ্যে বাস ছিল কবির। অল্প বয়সে পিতাকে হারান তিনি। কবিরা পাঁচ ভাই। কুঞ্জবিহারী, রাম, গৌরচন্দ্র, কৃপারাম ও ছোট ভাই জগন্নাথ। কবি প্রথম জীবনে মোহরিগিরি করতেন। জাতিতে তিনি ছিলেন মাহিষ্য। চাষ-বাস করেই জীবিকা নির্বাহ হ'ত। কবির একটি মাত্র পুত্র ছিল। নাম তার পরীক্ষিত। কবি কাব্য মধ্যে এমনিভাবে দিয়েছেন তাঁর আত্ম পরিচয়—

"তোমলোক মহাস্তান মহারাজা পুন্যবান
তার দেশে আমি করি ঘর।
এই বর দেহ আগে রাজাজিকে জুগে জুগে
কর পীর অক্ষয় অমর॥
পূর্বে কাশীজোড়া ছাড়ি তোমলোকে ঘরবাড়ী
মামুদপুরেতে করিলা স্থিতি।
পিতামহো জেঠা বনে মঞ্জিলেন সেইখানে
আমা সভার সেইখানে স্থিতি॥
কহিতে মনের দুঃখ বিদুরিয়া যায় বুক
মোর ভাগ্যে বাম হইল বিধি।
আমি অভাগিয়া বোড়ী শিশুকালে মোরে ছাড়ি
অলপ বয়সে মৈল পিতা॥

এ বড় দারুণ তাপ ছেড়্যা গেল মোর তাত
দুঃখ সদা আমার কপালে।
ভাই আছি পঞ্চজন দয়া কৈল নারায়ণ
কৃপা করি রাখ পদতলে॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী, রাম গৌরচন্দ্র কৃপারাম
ছোট ভাই নাম জগন্নাথ।
তাহার মধ্যম ভাই পীরের হুকুম পাই
করিলেন কবিতা বিখ্যাত॥
কাশীজোড়া ছাড়ি তবে তোমলোকে আলাম সভে
হিজলবেড়্যা গ্রামের উত্তর।
মামদপুরে ডেরা পটনাকোর ইজারা
গ্রামের দক্ষিণ দিগে ঘর॥
প্রথমে মোহরীগিরি তারপরে কারি কবি
তায় মোরা কৈনু আদিস্তানা।
মনের মানস ছিল এতদিনে পুন্য হইল
তেঞি গীত করিনু রচনা॥
অজ্ঞানের কত পাপ কোন মুনি দিল সাপ
কিবা মোর অপরাধ ফলে।
পূর্বের লিখন না যায় মেটন
জনম হৈল চাষা কুলে॥

ফাসর্যার পালার বিষয়বস্তু হোল সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার করা। সদাকর পুত্র বিদ্যাধর পীরের আস্তানা মলয়া পাটন থেকে আনতে গিয়ে ফাঁস্যুড়ে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে কেমন করে ফাঁস্যুড়ে নন্দিনী আহুতীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে তাকে বিয়ে করে দেশে আনল সেই কাহিনী অতি সুন্দরভাবে এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের জনপ্রিয়তা এককালে সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কাহিনী অবলম্বন করে নাটকও কোন কোন

নাট্যকার লিখেছেন। পটিদারগণ পট তৈরী করে গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে চেয়ে আজো ফেরে। মনোহর ফাঁসুড়ের পট আমি নিজে একটি সংগ্রহ করে রেখেছি। পুঁথির হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। কাব্যটি খুব সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। পুঁথিটি খণ্ডিত! শেষের পাতাগুলি নেই। তাই লিপিকালও জানার কোন উপায় নেই। আমি মৎ প্রণীত "বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী" পুস্তকে এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ গল্পাকারে দিয়েছি। নিম্নে তমলুক অঞ্চলে সেকালে কেমন অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন হোত তার একটি বিবরণ কবির কথাতেই বলি। ফাঁসুড়ে নন্দিনী ইচ্ছাবতি বা আহুতি বিদ্যাধরকে এমনি ভাবে ব্যঞ্জন রেঁধে খাইয়েছিল—

"প্রথমেতে সুরু চাউলের রান্ধিলেক ভাত।
কটু তৈলে ভাজি কৈল পুঁই সাগের পাত॥
বড় বড় তুলিয়া খাটিয়া সাগের পাতা।
ঘৃত দিয়া কৈল ভাজি বার্তাকু পলতা॥
মনেতে হরষ হৈয়া সদাগর খাউ।
করপুর এলাচ দিয়া দুধে রান্ধে জাউ॥
মুগ ডাল রাঁধে রামা দিয়া ডালচিনি।
অপূর্ব রন্ধন করে ফাঁসুড়ে নন্দিনী॥
খাউগে সাধুর পুত্র মনে কর্‌য়া নিসা।
দুগ্ধে চাউলে গুড় দিয়া রান্ধিল খিরিসা॥
নট্যা সাগের নাফিরি পাড়িয়া সাঁতাল।
মদগুর মচ্ছের রসা মরিচের ঝাল॥
মানে ওলে কাঁচকলা করে রামা ভাজি।
বড়ির সহিত রান্ধে পুঠি মাছের কাজি॥

সেকালের বেশ-বাস আচার-ব্যবহার ও বিবাহ কেমনভাবে হোত কবি এ সকলি বিস্তৃতভাবে তাঁর কাব্য মধ্যে দিয়েছেন। কাব্যের ভাষা অতি সরল ও কবিত্বপূর্ণ।

**দ্বিজ জগন্নাথ॥** কবি জগন্নাথ 'আক্ষটির পালা' কাব্যের রচয়িতা। মামুদপুরে কবি কুঞ্জবিহারী দাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পট্টনায়কের ভাংগা সিন্ধুক থেকে পুঁথিটি পাই। মাত্র ১৬ পাতা পাওয়া গেছে। তাই সমগ্র আখ্যায়িকাটি জানা জায়নি। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত নারান্দা গ্রাম থেকে আর একটি দ্বিজ জগন্নাথের "আক্ষটির পালা" পাই। দুইটির কাহিনী এক রূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতেও সম্পূর্ণ গল্পটি পাইনি। অর্থাৎ কাব্যের আসল জায়গায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কাব্যে এমনি ভাবে কবি নিজ পরিচয় দিয়ে বলছেন—

তমলোক মহাস্তান মহারাজা নরনারায়ণ
মহারাজ কমললোচন।
গায়ে কবি জগন্নাথে রাজার মঙ্গল অর্থে
গোপীচরণ রচিল কাল্যাম॥

১ম পুঁথি, পৃঃ ৭ (ক)

তমলুকের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৩৮—১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নরনারায়ণের দু'রাণীর গর্ভে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ছোট রাণীর গর্ভজাত পুত্র কৃপানারায়ণ জ্যেষ্ঠ, বড় রাণীর গর্ভজাত পুত্র কমলনারায়ণ কনিষ্ঠ। এঁরা দু'জনে উভয়ে ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃপানারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে কমলনারায়ণ সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। কাব্যটি কিন্তু রাজা নরনারায়ণ যখন রাজ্যের অধিপতি, মনে হয় সেই সময় রচিত হয়েছিল। কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আসল নায়ক পাখীটিকেই কবি মেরে ফেলেছেন। প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ বড় একটা দেখা যায় না। কাব্যে কোন কবিত্ব নেই। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর। প্রাচীন তুলোট কাগজে লেখা।

কাব্যের বিষয়বস্তু হোল হরিভক্তি। অবন্তী রাজ সন্দানন্দের পোষা পাখীকে রাজপুত্র কামদেব ছেড়ে দেয় পিঁজরা থেকে।

পাখীর বিশেষ গুণহলো সে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল। এর জন্য কামদেবকে সদানন্দ প্রানদণ্ডাজ্ঞা দেন। শেষে পাখী তাকে উদ্ধার করে। কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব আছে।

**কবি দয়ারাম দাস ॥** দয়ারাম "সারদামঙ্গলে"র একক কবি। এই বিষয়ক একখানি মাত্র কাব্য এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। সারদা বা সরস্বতী বৈদিক দেবতা, তিনি বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই কাব্যে দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। সুবেশ্বর রাজ্যে সুবাহু নামে এক রাজা অপুত্রক ছিলেন। বহু সাধ্য সাধনার পর যদিও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলো কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি তার কিছুই হোল না। রাজা নির্বাসন দিলেন পুত্রকে। তারপর দেবী সরস্বতীর কৃপায় কেমন করে রাজপুত্র লক্ষধর বিদ্বান হলো এই কাব্যে সেই কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারদামঙ্গলের কবি দয়ারাম দাসের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া পরগণার কিশোরচক গ্রামে। কবি 'সারদামঙ্গল' ছাড়া আরো একটি বই রচনা করেছিলেন, তার নাম 'লক্ষ্মীচরিত্র'। "সারদামঙ্গলে"র রচনা পাঁচালির লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রায় কাব্যগুণ বিবর্জিত। তাই সারদা পাঁচালি নামই এর যথার্থ পরিচয়।

কবির যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা' এই। রমেন্দ্রজিৎ ছিলেন তাঁর পিতামহ। আর পিতা ছিলেন জগন্নাথ দাস। কবি কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। সে হোল ১৭৫৬—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অর্থাৎ আজ থেকে ২০৮ বছর আগে। দয়ারাম দাসের 'সারদামঙ্গল' সেকাল ধনী-জমিদারদের বাড়ীতে পুত্রের বা কন্যার বিদ্যারম্ভের সময় গাওয়া হোত। কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজা উপলক্ষেও চামর মন্দিরা সহযোগে শীতলামঙ্গলের মত এরও গীত হোত। ইহা মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৫টি পালায় বিভক্ত।

**নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ॥** শীতলামঙ্গল ও কালুরায় মঙ্গলের রচয়িতা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে কবি বর্তমান ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর যে শাখা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণের সাথে মিশেছে তারি দক্ষিণ তীরে খয়রা কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ রায়ের সভাকবি ছিলেন কবি নিত্যানন্দ। তিনি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলামঙ্গল রচে পান সুধামত ॥

কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায় ১৭৫৬—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময় কবিকে রাজা কিছু জমিও দান করেছিলেন। সে সনন্দ আজিও কবির বংশধরগণের নিকট রক্ষিত আছে। কবির আরাধ্য দেবী শীতলা আজিও কানাইচক গ্রামে নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। গোকুল পালায় নিত্যানন্দ নিজের আত্মপরিচয় এমনিভাবে দিয়েছেন—

সৌতিসম সর্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব কি গুণে তুলনা দিব
যার সখা প্রভু দামোদর ॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ শ্রীরাধাচরণাম্বুজ
চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত নিত্যানন্দ নামযুত
গাহে ভেবে শীতলা চরণ ॥

নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল অতি বৃহৎ কাব্য। মোট আটটি পালায় বিভক্ত। ১ম স্থাপনা বা স্বর্গপালা, ২য় পাতালপালা, ৩য়

লঙ্কাপালা, ৪র্থ কিষ্কিন্ধ্যাপালা, ৫ম অযোধ্যাপালা, ৬ষ্ঠ মথুরা ও মগধপালা, ৭ম গোকুলপালা ও ৮ম বিরাটপালা। এই সকল পালার সবগুলিতে দেবী শীতলার পূজা প্রচার-এর জন্য মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাব্যের ৬৪ রকম বসন্তের নাম বেশ বিবেচনার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকার বসন্তের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য আছে।

নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গলের কেবল ৭ম ও ৮ম পালা বটতলায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংস্করণে নিত্যানন্দকে উড়িষ্যার লোক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। তবে কাশীজোড়া পরগণা যে এককালে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই বলে নিত্যানন্দ যখন শীতলামঙ্গল রচনা করেন, তখন কোশীজোড়া রাজ্য স্বয়ংশাসিত ছিল। তাই নিত্যানন্দকে উড়িয়া বানানো যায় না।

শীতলামঙ্গলের ভাষা সহজ সবল। এতে একটু আধুনিকতার ছাপ দেখা যায়। নিত্যানন্দ তাঁর কাব্যে সুমার্জিত ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন।

নিত্যানন্দের অপর কাব্য কালুরায় মঙ্গল। প্রসিদ্ধ গবেষক, পণ্ডিত অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় এই কাব্যটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ( ৬৩ বর্ষ-এর ১ম ও ২য় সংখ্যায় ) আলোচনা করেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন কিছুদিন তমলুক রাজবাড়ীতে বাস করেছিলেন—একথা মধুসূদনের জীবন চরিত থেকে জানা যায়।

তাম্রলিপ্ত প্রদেশের আর কোন প্রাচীন কবির নাম বা তাঁদের কবি কীর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। নিম্নে আমরা আধুনিক কবিগণের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করছি, 'তমোলুক ইতিহাস' পাঠে জানা যায় তৎকালে—"এখান হইতে বাঙ্গলা

১২৭৮ সালে বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজবালা নাটক, ১২৮০ সালে তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১২৯৪ সালে কালিকামঙ্গল ও নব্যবিলাস, এবং অনাথ বালক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮০ সালে 'তমোলুক পত্রিকা' নাম্নী একখানি মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ হইত; গ্রাহকগণের অসদ্ব্যবহারে তাহা ১৯ চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' পৃঃ ১২৪—১২৫।

তমলুক সহরে থেকে যাঁরা আজো সাহিত্য চর্চা করছেন, তাদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রবি-তর্পণ, সাগরিকা, ১৫ই আগস্ট, বহ্নিপাষাণ ও কবি দীপিকা তার উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রবীন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী এই সহরের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর বহু স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং তা' সুনামের সংগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হয়ে আসছে। তিনি চয়নিকা নামে একটি শিশু মাসিক কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন। কয়েক বছর চলার পর বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেবাব্রতী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশ হোত কিছুদিন আগে তমলুক থেকে। অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন। এছাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুচরিতা দাস, অধ্যাপক বিষ্ণুহরি দত্ত, কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, অধ্যাপক বিবেকানন্দ দাশ, মালীবুড়ো ও অধ্যাপক প্রণব কুমার বাহুবলীন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। বিমল কুমার বসু "ছোটদের নেতাজী" নামক একটি কবিতা পুস্তক লিখেছেন। এছাড়া আরো বহু স্কুল শিক্ষক মহাশয়গণ বিভিন্ন পাঠ্য ও ধর্মপুস্তক লিখেছেন। সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নিম্নে তমলুক মহকুমার বিভিন্ন থানার লেখকগণের গ্রন্থসমূহ একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করলাম। অনঙ্গমোহন দাস—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ (থানা ময়না) আলোক চক্রবর্তী—আমাদের

বিদ্যাসাগর, ঘেটুর কথা প্রভৃতি বহু পুস্তক ( থানা—তমলুক, বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা ) আশুতোষ জানা—আচার্য ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র জাতির ইতিহাস, ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র—শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ প্রদ্যোৎ, ভীমরুল প্রভৃতি ( থানা—নন্দীগ্রাম, বর্তমান মেদিনীপুরের বাসিন্দা ) কুমার চন্দ্র জানা—গীতাবোধ ( ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সহযোগে ) থানা—সূতাহাটা অধ্যক্ষ জগদীশ চন্দ্র দাশ —মঞ্জরী ( থানা—ময়না ) ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত—তমোলুক ইতিহাস। প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক—কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা, চণ্ডীমঙ্গলের গল্প প্রভৃতি বহু পুস্তক। কলিকাতার ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ( থানা—তমলুক ) যুধিষ্ঠির জানা ( মালীবুড়ো )— বঙ্গসাহিত্যে অজানা কাহিনী, গল্প-মালঞ্চ, কাটা কাটা চাঁদ প্রভৃতি ১৪।১৫ খানি পুস্তক ( থানা-মহিষাদল ) রঘুনাথ মাইতি—গান্ধী কথা, শ্রীপতি বোয়াল—নবাব মীরকাশিম ( থানা—মহিষাদল ), সতীশচন্দ্র সামন্ত—মুক্তির গান ( সংকলন ) ( মহিষাদল ), সেবানন্দ ভারতী—তমোলুকের ইতিহাস, হরিসাধন গোস্বামী—শিক্ষা ও সমাজ প্রভৃতি কতকগুলি বই। ঋষি দাস—শেকস্‌পীয়ার, বার্ণাডশ, পৃথিবীর ইতিহাস, সোভিয়েৎ দেশের ইতিহাস প্রভৃতি বহু পুস্তক, অনুবাদক হিসাবে এঁর নাম বিশেষ বিখ্যাত ( থানা—মহিষাদল ) অধ্যাপক নিরঞ্জন মিশ্র—কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। কল্যাণী প্রামাণিক—শিশুতরু, দুনিয়া দেখছি প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক ( থানা—তমলুক ) দীপ্তি ত্রিপাঠি—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ( থানা—সূতাহাটা, বর্তমানে কলিকাতার বাসিন্দা। ডাঃ প্রবোধ ভৌমিক—মেদিনীপুর কাহিনী, উপজাতির কথা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি ৭।৮ খানি পুস্তক। ( থানা—নন্দীগ্রাম ) বাসুদেব মাইতি— স্বয়ংবরা, রবীন্দ্র রচনা কোষ, মহানগরীর নারী প্রভৃতি পুস্তক ( থানা পাঁশকুড়া ) হরিপদ ঘোষাল—বিশ্ব সভ্যতার ধারা ( থানা—ঐ ) বিজন বিহারী ভট্টাচার্য—প্রভাতরবি, বাগার্থ, সমীক্ষা, কঙ্কাবতী,

চূড়ামণি প্রভৃতি বহু পুস্তক, ডাঃ মনোরঞ্জন জানা—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দর্শন, বাঙলার কবি-মনীষা, রবীন্দ্রনাথ—কবি ও কাব্য। ( থানা—তমলুক ), গোষ্ঠ বিহারী কুইলা—দেবধূপ ( থানা—পাঁশকুড়া ), অজয় মাইতি—মেঘের শিবিরে ( থানা—ভগবানপুর ) অমূল্য মাইতি—একটি কাব্য সংকলন ) গোরাচাঁদ গিরি—মেদিনী-মঙ্গল, গানে মেদিনীমঙ্গল ও সমবায় প্রভৃতি পুস্তক।

হিন্দী সাহিত্যিক সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ( নিরালা )—অনামিকা, পরিমল, অর্জুন, গীতিকা প্রভৃতি পুস্তক। মহিষাদলে বাস করেছিলেন। কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( সূতাহাটা লোক ভারতীতে কর্ম )—নদীয়া মহাজীবন, জলধর সেন ( মহিষাদল রাজস্কুলে শিক্ষকতা ১৮৯২ )—হিমালয়, আত্মজীবনী, অভাগী, সম্পাদক-প্রবাসী, দীনেন্দ্র কুমার রায় ( মহিষাদল রাজস্কুলের ছাত্র ১৮৮৮ পরে ঐ স্কুলে শিক্ষকতা )—টাকার কুমীর, রূপসীর শেষ শত্রু, অরবিন্দ প্রসঙ্গ, পল্লীচিত্র প্রভৃতি। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত ( অধ্যাপনা তাম্রলিপ্ত কলেজ ১৯৫০-৫৬ ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ( সূতাহাটায় গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন )—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, West to day, সমর সোম ( লোকভারতীর পরিচালনা )—যাদুকরী, সাধনা সোম—( লোকভারতীর পরিচালনা )—দেশান্তরের নারী, আজকে পশ্চিম ( অনুবাদ )। সুধীর কুমার মল্লিক ও বেনু গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা সকলে অন্যদেশের অধিবাসী কিন্তু বিভিন্ন কর্মসূত্রে এই মহকুমায় বাস করেছিলেন ও করছেন।

তমলুক মহকুমা থেকে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হোত ও বর্তমানে হচ্ছে, সেগুলো হোল—গ্রামসেবা ( সাপ্তাহিক, ১৯৪৭ ) —সচ্চিদানন্দ বেরা ( অধুনা লুপ্ত ) ডাক ( মাসিক, ১৯৫৪ )—ত্রিবঙ্কর রায় ( লুপ্ত ) তমালিকা ( সাপ্তাহিক ; ১৯০৩—১৯০৮ )—শ্রীধর অধিকারী, তমলুক বুলেটিন—( ১৯৩২ ), তাম্রলিপ্ত উপাসনা পত্রিকা ( ত্রৈমাসিক ; ১৩৬৫ )—স্বপনবান্ধব, নবোদয় ( বার্ষিক

১৩৬২ )—যুধিষ্ঠির জানা ( মালীবুড়ো ), পল্লীজীবন ( সাপ্তাহিক, ১৯৪৮ )—নলিনীরঞ্জন হোতা, পাঞ্চজন্য ( মাসিক, ১৩৫৯ )—পরেশনাথ চক্রবর্তী, প্রদীপ ( সাপ্তাহিক, ১৯৪৪ )—শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, প্রলাপ ( সাপ্তাহিক, ১৩৬০ )—হরেকৃষ্ণ পট্টনায়েক, মহিষাদল সমাচার ( বুলেটিন, ১৯৩২ ), শীষ ( ত্রৈমাসিক, ১৩৬১ )—পুলক বেরা ( পরে পীযুষ মহাপাত্র ও সত্যেন ষড়ঙ্গী ), শোভনা ( মাসিক, ১৩২৯ )—পরেশনাথ চক্রবর্তী ও প্রজাপতি জানা ( পরে শরৎচন্দ্র দাস ও পরেশনাথ চক্রবর্তী। অহল্যা ( ত্রৈমাসিক, ১৯৬৩ )—শ্রীহরি মাইতি, প্রবাল—( পাক্ষিক )—বলাই কুইলা, কিংবা —( মাসিক ১৩৭১ )—চিররঞ্জন মাইতি। আশীষ বেরা, মৌসুমী ( হাতলেখা মাসিক )—মেদিনীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার তমলুক।

এই অধ্যায় বিভিন্ন দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ থাকবে আমি গোড়াতেই বলেছি। যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে প্রকাশ করলাম। এই সংগ্রহের মধ্যে অনেকের নাম বাদ পড়েছে নিশ্চয়ই, তাই বলে স্বেচ্ছাকৃত বলে কেউ যেন না মনে করেন।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# তাম্রলিপ্তের অধিবাসী ও সামাজিক চিত্র

সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যে কারা বাস করত, তা' সঠিকভাবে নির্ণয় করা বড় কষ্টসাধ্য। রামায়ণ মহাভারতের যুগে এই রাজ্যে যারা বাস করতেন, তারা জাতিতে কি ছিলেন সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে তখন ক্ষত্রিয় ও নৌযুদ্ধবেত্তা জাতি যে অধিক পরিমাণে বসবাস করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁর The tamils eighteen hundred years ago নামক পুস্তকে লিখেছেন, মাদ্রাজের তামিল জাতি প্রাচীন "তাম্রলিপ্ত" জাতি হইতেই উদ্ভূত"—তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ থেকে এই তামিল শব্দ তথা জাতির উৎপত্তি হয়েছে। পিলে মহাশয়ের উক্তি থেকে মনে হয় তৎকালে "তাম্রলিপ্ত" বলে একটি পৃথক জাতি বাস করত এই রাজ্যে।

গৌড়রাজবালা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—"ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গানদী "গঙ্গারিডই" দেশের পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। 'গঙ্গারিডইগণে'র অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে।' এই গঙ্গারিডগণকে অনেকে অনুমান করেন তাম্রলিপ্ত প্রদেশের অধিবাসী বলে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি লিখে গিয়েছেন—"গঙ্গার মোহানা সমূহের সমীপ প্রদেশে "গঙ্গারিডিগণ" বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা "গঙ্গা" নগরে বাস করেন।' এই থেকে মনে হয় তৎকালে নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তিতে গঙ্গারিডিগণ বাস করতেন। কারণ, তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের সমীপবর্তী। অবশ্য গঙ্গানগর যে কোথায় ছিল তা' আজও নিশ্চিন্ত ভাবে স্থিরকৃত হয়নি। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

মহাশয় অনুমান করেন ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা গ্রামেই প্রাচীন গঙ্গানগরের রাজধানী "গঙ্গে" অবস্থিত ছিল। যাইহোক, এই গঙ্গাড়াহিগণের শৌর্য বীর্য যে তৎকালে সারা ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল, তা আলেকজাণ্ডারের দ্বিগ্বিজয় কাহিনী থেকে অবগত হওয়া যায়। মহাকবি ভার্জিল এই জাতির গুণকীর্তন করেছেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে গ্রীকরাজদূত মেঘাস্থিনিসের ( খ্রীষ্ট ৩০২ বৎসর পূর্বে ) অবস্থিতি কালীন তিনি 'গঙ্গার মোহানার নিকট তলুক্তি (Taluctae) নামে এক জাতির উল্লেখ করছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডেল সাহেবের মতে তা' পুরাতন বন্দর তাম্রলিপ্তবাসীর নির্দেশক।[১]

এই গেল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত অধিবাসীদের কথা। এছাড়া তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রোপকূলবর্তী হওয়ায় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় বহু বণিকও তথায় বাস করত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রমণ ব্যতীত অন্য বহু জাতিও তখন বাস করত তাম্রলিপ্ত বন্দরে।

বর্তমান তমলুকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করেন। কিন্তু প্রাচীনকালে অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালের পূর্বে এদেশে মুসলমান ছিলনা বললেই চলে। খোজা দিদার আলীবেগ যখন তমলুকে রাজত্ব করেন, তখন তিনি নিম্ন জাতীয় হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাঁশকুড়া, প্রতাপপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা বোধহয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কাশী-জোড়ার রাজা নিজে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

১ Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian by I. W. Mc crindle, PP. 132—138.

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর অনেক হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাই তমলুকে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও নিতান্ত নগণ্য নয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ক্ষত্রিয় মাহিষ্য। এছাড়া গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-এর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ধীবর নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লোকও যথেষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেইসব জাতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো না। প্রধান প্রধান ২।৪টি জাতির কথাই উল্লেখ করে এই অধ্যায় অতি সংক্ষিপ্তাকারে শেষ করব। আজকাল ভিতরে ভিতরে জাত্যাভিমান থাকলেও বাহ্যিক জগতে এর কদর অনেক কমে গিয়েছে। যারা জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে চান, তাঁরা এইসব সম্পর্কিত বই পৃথক ভাবে পড়লে উপকৃত হবেন।

**গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।** ইঁহারাই তাম্রলিপ্তের আদি বেদবিদ ব্রাহ্মণ। এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ মহর্ষি বোঢ়ু। ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ বেদমন্ত্র প্রণেতা। মহর্ষি বোঢ়ু ঋগ্বেদের একটি ঋক ( ১০।৯৬ ) প্রণয়ন করেছিলেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ( ৫।২৫ ) সেই ঋক্‌টি সন্নিবিষ্ট আছে। এইজন্য তাঁদের নামে তর্পণের ব্যবস্থা হয়েছিল—

> "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
> কপিলশ্চাসুরি শ্চৈব বোঢ়ু-পঞ্চশিখ স্তথা।
> সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ."
>
> —আহ্নিকাচারস্তম্

অর্থাৎ "সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, অসুরি, পঞ্চশিখ ও বোঢ়ু তাঁরা সকলেই আমার দ্বারা জলে তৃপ্তিলাভ করুন, এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তুই অঞ্জলি জল তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়। মহর্ষি বোঢ়ু অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন। এগুলি "বেদতত্ত্ব-ব্যাখ্যা" নামে পরিচিত। মহর্ষি বোঢ়ুর অষ্টাদশ পুরাণের কয়েক-খানি দ্বাপর যুগের আদিকালে রচিত হয়েছিল।" "অষ্টাদশ পুরান

রচনা সমাপ্ত হইলে দ্বাপরযুগে মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সহিত মহর্ষি বোঢ়ুর পুরাণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ষটশতোত্তর পঞ্চ সহস্র শ্লোকান্বিত বৃহদ্ব্যাস সংহিতায় তৃতীয় খণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে পুরাণ ও উপপুরাণের উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করলে মহর্ষি বোঢ়ু ও তদ্বংশজ ব্যাসোপাধিক বোঢ়ু ব্রাহ্মণগণের আদি ইতিহাস পাওয়া যাইবে।" বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস পৃঃ ১-৩।

এই বোঢ়ু ঋষির বংশধরগণ প্রথম যাজকতা গ্রহণ করেন মহাভারতীয় যুগে যুযুৎসু, বিদুর ও যদুবংশের। এই ঋষির বংশধরগণ "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই বোঢ়ু বংশধর ব্যাস-ব্রাহ্মণগণ কোশল দেশ (অযোধ্যা) ত্যাগ করতঃ যাজ্য সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় মাহিষ্য জাতি সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গদেশ এবং তাঁহাদের অপর এক শাখা মেদিনীপুর জেলা ও উড়িষ্যা প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, (বৃহদ্ব্যাস সংহিতা, ৩য় খণ্ড, ২০শ অধ্যায়, মাদ্রাজে প্রাপ্ত গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞা ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট)।

পঞ্চ গৌড়দেশে এঁদের আদি বাস ছিল। এক সময় এই জাতীয় ব্রাহ্মণগণকে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ না জেনে শুনে বড্ড নিন্দে করতেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের জন্ম ইতিহাস যেমন গৌরবপূণ তেমনি এঁরাই আদিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের বহু পূর্বের একমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজ। সেবানন্দ ভারতী বলেন, "সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় যাজন করেন, ইঁহাদের বংশধরগণ তেমনই এক্ষণে কেবলমাত্র মাহিষ্য যাজন করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরই এক এক শাখা পূর্ববঙ্গে 'পরাশর' দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ 'দ্রাবিড়' ও 'ব্যাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" পৃঃ ১১৫

এই ব্রাহ্মণ জাতির বিস্তৃত বিবরণ জানতে হলে "ভ্রান্তিবিজয়", বঙ্গীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ পরিচয় প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

**মধ্যশ্রেণী ॥** এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, এঁরা বরাবরই স্বাধীনচেতা ও বিদ্যানুরাগী। "এতদ্দেশে যে মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ দৃষ্ট হন, তাহারা সামবেদ-সম্মত কার্য প্রণালীতেই সমুদয় ধর্মকার্য নির্বাহ করেন! কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বল্লাল সেন যৎকালে তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্যাদা বন্ধন করিয়া দেন, সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণের কতিপয় মহাত্মা গৌড়ীয় আদি-বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের এবং প্রাচীন আর্য্য-প্রণালী বিসর্জ্জন দেওয়া অধর্মের কার্য ও অযৌক্তিক মনে করিয়া ছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করতঃ হেয় প্রতিপাদন করিলে, তাঁহারা বল্লালী ব্রাহ্মণ-বিহীন জনপদে গিয়া বাস করেন এবং দেশের নামানুসারে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। —কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন, রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি কোন কারণ বশতঃ মেদিনীপুর জেলায় গিয়া বাস করেন। কালসহকারে তাঁহারা উৎকল ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যশ্রেণী নামে অভিহিত হইয়াছেন—( মেদিনীপুর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা )। যাহা হউক, বঙ্গ ও উৎকল দেশের মধ্যস্থলে মেদিনীপুর জেলায় বাস করা হেতু মধ্যশ্রেণী আখ্যা পাইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

**মাহিষ্য ॥** বাঙ্গালী জাতি পরিচয়-এর লেখক মাহিষ্য জাতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন—"মাহিষ্য জাতি বাঙ্গালার অতি পুরাতন জাতি। প্রাচীনকালে এই জাতির বাহুবলে বাঙ্গালার সামরিক গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে কৃষি-বাণিজ্য এই জাতির প্রধান অবলম্বন, ক্ষত্রিয় বীর্যে ও বৈশ্য মাতার গর্ভে এই জাতির উদ্ভব। রাজ্যপালন, দেশরক্ষা, যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য ও পশু-পালন এই জাতির বৃত্তি। বাঙ্গালার নানাস্থানে নানাবিধ নামে এই জাতি পরিচিত। পশ্চিম বাঙ্গালায় কৃষাণ, চাষী, চাষীদল,

মাহিষ্য, চাষী কৈবর্ত, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী কৈবর্ত, পূর্ব-বাঙ্গালায় পরাশর দাস, হানিফ দাস, দাস, মাহিষ্য দাস নামে পরিচিত। মুলতঃ বাঙ্গালায় ইহারা সকলেই মাহিষ্য জাতি। প্রত্নতত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, নর্মদা নদীর তীরভূমিতে এই জাতির প্রাথমিক আবাসভূমি ছিল। এই স্থান সম্ভবতঃ কিম্বর্ত দেশ, সরযূতট হইতে মাহিষ্য কৈবর্তগণ মধ্যভারতে আগমন করেন। মাহিষ্য জাতির একতম কেন্দ্রভূমি ছিল মাহিষ্মতী, নর্মদা ও সরযূতট হইতে মধ্য ভারতের অধিত্যকার মধ্য দিয়া ইঁহারা কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। পরবর্তীকালে ইঁহারা বাঙ্গালা দেশের সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়েন।

মাহিষ্যের অপর নাম-দাস। যাদবগণের বা যদুবংশের আদি-পুরুষ ছিলেন যদু বা তুর্বসু। এই যদু ও তুর্বসু জাতিতে "দাস" ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা দেবমীঢ়ের সুর ও পর্জন্য নামে দুই পুত্র হয়। সুরের পুত্র বসুদেব; ইনি কংসের ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করেন। সুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্জন্য। পর্জন্যের পুত্র নন্দ। নন্দ বসুদেবাদি যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় শাখায় এবং নন্দ যদুবংশীয় 'দাস' শাখায় উৎপন্ন। পর্জন্যের মাতা 'বৈশ্যা'। দেবমীঢ়ের বৈশ্যা ভার্যার সন্তান বলিয়া পর্জন্য মাহিষ্য। সুতরাং পর্জন্যের পুত্র নন্দও মাহিষ্য। এই বংশ 'দাস' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মাহিষ্যগণের মধ্যে 'দাস', 'হানিফ দাস', 'পরাশর দাস' প্রভৃতি নামও প্রচলিত দেখা যায়।" দৈনিক বসুমতি, মফঃস্বল, ২রা আষাঢ়, ১৩৬০।

প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুর জেলায় মাহিষ্যের সংখ্যাই অধিক। প্রায় দশ লক্ষ মাহিষ্য এই জেলায় বাস করে। বর্তমানে এই জাতি, শিক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও রাজনীতিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

এছাড়া তমলুকে কায়স্থ, বৈদ্য, নমঃশূদ্র, তেলি, রাজবংশী প্রভৃতি আরো বহু জাতি বাস করেন।

---